ঘাস ফড়িংয়ের শব্দ শোনা যায়

ফিল্ড নোটস অন ডেমোক্রেসি

অরুন্ধতী রায়

LISTENING TO GRASSHOPPERS

FIELD NOTES ON DEMOCRACY

ARUNDHATI ROY

ঘাস ফড়িংয়ের শব্দ শোনা যায়

ফিল্ড নোটস অন ডেমোক্রেসি
গণতন্ত্রের সরেজমিন প্রতিবেদন

অরুন্ধতী রায়

ঘাস ফড়িংয়ের শব্দ শোনা যায়

ফিল্ড নোটস অন ডেমোক্রেসি
গণতন্ত্রের সরেজমিন প্রতিবেদন

অরুন্ধতী রায়

অঙ্কুর প্রকাশনী

Ghas Feringer Shabdo Shona Jai

Field Notes on Democracy

by

Arundhati Roy

অনুবাদ
অদ্বয় দত্ত
মোস্তফা কামাল

বাংলায় প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১
বাংলা ভাষায় গ্রন্থস্বত্ব : অঙ্কুর প্রকাশনী, বাংলাদেশ
ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশ : হেমার্কার বুকস, ইউএসএ ২০০৯

গ্রন্থস্বত্ব
অরুন্ধতী রায়

প্রচ্ছদ
সাব্যসাচী হাজরা

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯

মুদ্রণ
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪৪০৯৩৬

ISBN : 984 464 302 3

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

সকল প্রকার স্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ, গ্রন্থের কোনো অংশ, প্রচ্ছদ, ছবি, অনুবাদ মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ, ইলেকট্রোনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি অথবা অন্য যেকোনো মাধ্যমে প্রকাশকের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাবে না।

উ ৎ স র্গ

এ বই তাঁদের জন্য যাঁরা বিশেষ কারণ ছাড়াই
আশাবাদী হওয়ার বিরল ক্ষমতা রাখে

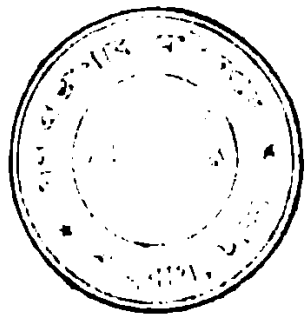

শেষ সীমানায় পা পড়ার পরে আমরা আর যাবো কোথায়?
শেষ আকাশে ডানা মেলার পরে পাখিরা আর উড়বে কোথায়?
বাতাসে শেষবারের মতো শ্বাস টানার পরে এ অরণ্যকুল যাবে কোথায়?
পৃথিবী যখন সীমিত হয়ে যায়

–মাহমুদ দারবিশ

সূ চি প ত্র

ভূমিকা : গণতন্ত্রের ব্যর্থ আলোক বর্তিকা ১১
গণতন্ত্র আমাদের ঘরোয়া জীবনে কী তার অর্থ? ৪৩
ঘটনার কতোটা গভীরে আমরা যাবো? ৬৭
'এবং তার জীবনটি বিলীন হয়ে যাওয়া উচিত' ভারতের সংসদ ভবনের আক্রমণের ওপরে অদ্ভুত এক গল্প ৯১
খবরের ভেতরের খবর ১২৭
পুলিশ হেফাজতে স্বীকারোক্তি, সংবাদমাধ্যম এবং আইনকানুন ১৪৩
বুশ খোকা, বাড়ি যাও ১৫১
এনিমেল ফার্ম– ২ : জর্জ বুশ যেখানে তার মনের কথাটি বলেছেন ১৫৫
প্রাসাদ-কেলেঙ্কারি ১৬৫
ঘাস ফড়িংয়ের শব্দ শোনা যায় : গণহত্যা, অস্বীকৃতি এবং তার উদ্‌যাপন ১৮১
আজাদী ২১৩
নয় আর এগারো এক নয় (এবং নভেম্বরও সেপ্টেম্বর নয়) ২২৩
নোটস ২৩১

পুরাতন বা ব্যর্থ বা ক্ষয়িষ্ণু মডেল অথবা বিভিন্ন রকম যেসব সমগ্রতাবাদ (যে রাজনৈতিক দল একটি ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে মানতে রাজি নয়) কিংবা কর্তৃত্ববাদের মতো সরকার পদ্ধতির দিকে চলে যাবো। এর মানে হচ্ছে, আমরা বোঝাতে চাচ্ছি না প্রতিনিধিত্বমূলক যে গণতন্ত্র আছে সেটাকে। আমরা বলতে চাচ্ছি, খুব বেশি প্রতিনিধিত্ব বা খুব গণতন্ত্র যেটাই হোক না কেন– এর কিছু গঠনগত সমন্বয় সাধনের দরকার আছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা গণতন্ত্রকে নিয়ে কী করেছি, আমরা এটাকে কী ধরনের রূপদান করেছি? যদি গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে শেষ করে ফেলা হয়– তারপর কী হবে? গণতন্ত্রের যে আদর্শগত অর্থ সেটাকেই যদি আমরা ব্যর্থ করে ফেলি তা হলে কী হবে? যদি এমন হয় যে, গণতন্ত্রের যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলিকে আমরা এমনভাবে পরিবর্তিত করলাম– যা সত্যিকার অর্থেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। যদি এমন হয় যে, গণতন্ত্র আর মুক্তবাজার মিলেমিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেল যেন আমরা সেই প্রাচীন শিকারী জীবনে ফিরে গেলাম– যেখানে আমরা ব্যস্ত থাকছি প্রতি মুহূর্তেই শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার কাজেই! গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ যা হওয়া উচিত ছিল আমরা কি পারবো সেখানে ফিরে যেতে?

এ গ্রহটাকে দীর্ঘদিনের বাঁচিয়ে রাখতে আজকের দিনে আমাদের যা দরকার– সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতা। দেশে দেশে সরকারেরা কি নিজেদের টিকিয়ে রাখতে তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ শুষে নিয়ে স্বল্পমেয়াদী মুনাফা অর্জন করতে পারে? আমাদের যে স্বল্পমেয়াদী আকাঙ্খা যে প্রার্থনা আমাদের যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা– তার যে প্রতিরক্ষক, এবং আমাদের যে স্বপ্ন জেগে আছে– তার প্রতিপালনকারী হিসেবে আমাদের এ বিদ্যমান প্রতিযোগিতাকে রূপান্তর করে এ গণতন্ত্র কি অন্য কিছু করতে পারবে? এটা কি এমন গণতন্ত্র যেটা মানব সভ্যতাকে আঘাত করবে আমাদের অদূরদর্শিতাজনিত সবচেয়ে বড় দুর্বলতার কারণে। শুধুমাত্র বর্তমানকে ধারণ করতে আমাদের অক্ষমতা রয়েছে (বেশিরভাগ পশুশ্রেণীর ভেতরে যে সমস্যা নেই), এবং এর সঙ্গে যখন আমাদের সুদূরপ্রসারী জিনিস অনুধাবনের অক্ষমতা যোগ হয় তখন এ দুটো জিনিস মিলিয়ে আমাদের অদ্ভুত একটা সৃষ্টিতে পরিণত করে। এতে করে আমরা না হতে পারি একটি পরিপূর্ণ পশু, না হতে পারি একজন অগ্রদূত বা দেবদূত। আমাদের যে অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা আছে, বেঁচে থাকার ন্যূনতম তাড়নায় সম্ভবত আমরা তার কিছু বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে ফেলেছি। আমরা এ বিশ্বকে নষ্ট করে ফেলছি এ প্রবোধ থেকে যে, সঞ্চয়কৃত সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা আমাদের সুগভীর ও অপরিমেয় সব ক্ষতিরই ক্ষতিপূরণ করতে পারবো। আমরা হয়তো অগাধ আহরণ করতে পারবো, অথবা আমরা আমাদের হারিয়ে ফেলা অপরিমেয় অতি গভীর সম্পদ তৈরি করতে পারবো। এটা

চিন্তা করা ঠিক হবে না যে, আমার এসব প্রবন্ধে এ-জাতীয় যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। কিছুটা বিস্তার এনে প্রবন্ধগুলিতে এসব প্রশ্নের শুধু প্রতিপাদন করা হয়েছে মাত্র। বস্তুত, দেখে মনে হচ্ছে, গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা হয়তোবা নিভে যেতে পারে। গণতন্ত্র হয়তোবা শেষ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্যতা হারাতে পারে– যেটা আমাদের দিতে পারতো ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থা, কিংবা একটা স্থিতিশীল ব্যবস্থা– যার জন্য একসময় আমরা ভেবেছিলাম গণতন্ত্রের হাত ধরেই এসব অর্জন সহজ হবে। এ গ্রন্থের সবগুলি প্রবন্ধই লেখা হয়েছিল ভারতের নির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনায় জনমতের চাপে তাড়াহুড়ো করে। যেমন আমরা উল্লেখ করতে পারি কিছুদিন আগের সংঘটিত গুজরাটে রাজ্য-মদদপুষ্ট মুসলমান গণহত্যার। অথবা চিন্তা করতে পারি ২০০১ সালে ১৩ ডিসেম্বর সংসদভবন আক্রমণের অভিযোগে অভিযুক্ত মোহাম্মদ আফজালের ফাঁসিতে ঝোলানোর কিছুদিন আগের ঘটনা। এ ছাড়াও লেখা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভারত সফরের ওপর একটি ব্যঙ্গধর্মী নাটিকা। ২০০৮ সালের গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরে যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল– সে ঘটনার ওপর তাৎক্ষণিক একটি প্রবন্ধ লেখা হয়। ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর মুম্বাই আক্রমণের পর লেখা আরো একটি প্রবন্ধ এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ লেখাগুলি শুধুমাত্র সংঘটিত ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল না; বরং, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব ছিল প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া।

যদিও এ সংকলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল ভেতরের গভীর রাগ থেকে। এমন সব মুহূর্ত এ লেখা তৈরি হয়েছিল যখন কিছু বলার চেয়ে না-বলে থাকাটা অনেক বেশি কষ্টের ছিল। তবে রচনাগুলোর মধ্যে কিছু বিষয়ে বেশ মিল রয়েছে। এর কোনোটি দুর্ভাগ্যজনক কিছু ব্যতিক্রম, কিংবা গণতন্ত্রগত প্রক্রিয়ায় কিছু বিচ্ছিন্নতা নিয়ে নয়, বরং এগুলি ছিল গণতন্ত্রের অপরিহার্য পরিণতি এবং অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে। তবে এ দাবিও করব না যে, গণতন্ত্রের বিষয়গুলি এখানে পূর্ণাঙ্গরূপে চিত্রায়িত হয়েছে। এটা হচ্ছে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা– যেখানে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের চর্চা কীভাবে হয়ে থাকে। (অথবা, পৃথিবীর সবেচেয়ে বেশি 'শয়তানি-উন্মাদনা' দেশে, যেমনটা শ্রীনগরের রাস্তায় কাশ্মীরের এক প্রতিবাদকারীর প্লাকার্ডে লেখা হয়েছিল 'ন্যায়বিচারহীন গণতন্ত্র = শয়তানি-উন্মাদনা')।

একজন লেখক হিসেবে আমি প্রায়ই এটা ভেবে বিস্মিত হই যে, সম্পূর্ণরূপে সঠিক থাকার প্রচেষ্টা কিংবা যেকোনো কিছুই তথ্যগতভাবে সঠিক রাখার প্রচেষ্টাটা সঠিক কিনা। অথবা একটি ঘটনার মূল যে গভীরতায় তা হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে এ আলোচনায়। এমনো তো হতে পারে এ প্রচেষ্টা অথবা সত্যের যথাযথ কাছে থাকার

প্রচেষ্টা আরো বৃহত্তর কোনো সত্যকে হারিয়ে ফেলছে। আমি প্রায়ই খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই– আমিও কি নিজেকে সেই একই পথে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে পরিচিত তথ্য ও সত্যতা ঠিক যতটুকুই দরকার ঠিক ততটুকুই আমি দিচ্ছি? যেখানে আমার হয়তো প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী 'বক্তা' হওয়ার যেটা একটি সমাজব্যবস্থাকে পরির্তন করার ক্ষমতা রাখে। যেটা মূলত এ কাব্যের সঠিক দিকটা নির্ধারণ করতে পারতো। আমার মনে হয়, ধূর্ততা ব্রাহ্মণ্যবাদের মতোই অত্যন্ত জটিল, কিংবা আমরা বলতে পারি আমলাতন্ত্রের মতো– যেটা সম্পূর্ণই একটি ফাইল-কেন্দ্রিক এবং শুধুমাত্র 'আপনি উপযুক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আসুন' ধরনের সরকারি ব্যবস্থা। অন্যদিকে ভারতীয় জণগণের স্বাভাবিক আত্মসমর্পনের যে মানসিকতা তার মাধ্যমে আমি কি নিজের ভেতরে একজন 'কেরানী' সত্ত্বা তৈরি করেছি? এ বিষয়ে আমার একমাত্র কৈফিয়ত এটাই হতে পারে– পৃথিবীর সকলের প্রিয় উদীয়মান সুপার-পাওয়ারটির অত্যন্ত উগ্র, শিহরণ জাগানো ও ছকে-বাঁধা নৃশংসতাকে যে ভণ্ডামি ও শঠতা দ্বারা দৃষ্টির আড়াল করা হয়, সেই মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য দরকার একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী যোগ্যতার। আমরা যদি 'রাষ্ট্রের ক্ষমতা'কে ব্যবহার করে নির্যাতন চালাই, তবে কখনো কখনো তা আইনআনুগ ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার ধরনকে বিপদগ্রস্ত করে তুলতে পারে। এবং সে ক্ষেত্রে, আমি জানি, যে প্রতিবাদগুলি চলে সেটা 'যথাযথ' বিশেষণটি হারিয়ে ফেলে। আমি যে প্রতিবাদ চালাচ্ছি– সেটাও হয়তো যথাযথ নয়। তবে এখনকার মতো শুধু এটুকুই বলতে পারি– হয়তোবা কোনো একদিন এটাই পরিণত হতে পারে কাব্যচর্চার মূল বিষয়বস্তু, অথবা কুকুরের গর্জনে– যা পরিবর্তন করতে পারে একটা সমাজকে।

'লিসেনিং টু গ্রাসহপারস' বা 'ঘাসফড়িঙের শব্দ শোনা যায়' এই প্রবন্ধগুলো মূল শিরোনামটি নেওয়া হয়েছে ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে ইস্তাম্বুলে আমার দেওয়া একটি ভাষণ থেকে।হ্রান্ট ডিংক নামের একজন আর্মেনিয়ান সংবাদিকের গুপ্তহত্যার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে সেখানে আমি ভাষণ দিতে আমন্ত্রিত হই। তুরস্কে নিষিদ্ধ কিছু বিষয়ের ওপর ডিংক কিছু কথা বলেছিল বলে অফিসের বাইরের রাস্তায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। বিষয়টি ছিল ১৯১৫ তে আর্মেনিয়ায় সংঘটিত গণহত্যা– যেখানে দশ লাখেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। আমার ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল এই গণহত্যার ইতিহাসের ওপর, এবং পরবর্তীতে সে গণহত্যার অস্বীকৃতি এবং প্রগতি ও গণহত্যাকে একপ্রকার মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলার ওপর।

আমি সবসময়ই এই বাস্তবতায় বাধাগ্রস্ত হতাম– তুরস্কের রাজনৈতিক

দলগুলো কীভাবে আর্মেনিয়াতে গণহত্যা চালিয়েছিল– যেটাকে তারা বলতো 'কমিটি ফর ইউনিটি অ্যান্ড প্রগ্রেস' বা 'ঐক্য ও সমৃদ্ধির কমিটি'। এই প্রবন্ধের সংকলনটি মূলত সমসাময়িক ঘটনাসমূহ নিয়ে যেগুলি নাকি সম্বন্ধতা নির্ধারণ করে ঐক্য ও সমৃদ্ধির, অথবা আজকের দিনের বাগবিধিতে যাকে বলা হয় 'জাতীয়তাবাদ' ও 'উন্নয়ন'। আধুনিক জীবনের এই দুটো অনিন্দ্য শক্তির সঙ্গে মুক্তবাজার গণতন্ত্র যুক্ত হয়ে যে ভয়াবহ আকার ধারণ করে– তা মানুষের জন্য অপরিমেয় দুর্দশা ও ধ্বংস বয়ে আনতে পারে (যেমন পারমাণবিক যুদ্ধ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের মতো ঘটনা)।

এ প্রবন্ধগুলো ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের ভেতরে লেখা হলেও এর একটি অলক্ষ্যনীয় সূচনাকাল আছে; সেটি হচ্ছে ১৯৮৯ সালের একটি ঘটনা, যখন আফগানিস্তানের ধ্বংসপ্রাপ্ত পাহাড়ের মধ্যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদ জয়লাভ করে। (যদিও কালের চক্র পুনরায় ঘুরে যাচ্ছে। এমনও কি হতে পারে– সেই একই পাহাড়ে এখন পুঁজিবাদের কবর রচিত হবে? এখনো অবশ্য এ কথা বলার সময় আসেনি।) সোভিয়েত একতা পতনের মাত্র মাসখানেকের ভেতরেই এবং বার্লিন প্রাচীর পতনের পরেই ভারতীয় সরকার (যে একসময় নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা ছিল) খুব দ্রুততার সঙ্গেই এমন একটি অভিযান পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। এবং নতুনভাবে একমেরু বিশ্বের অধিশ্বরের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এক কাতারে দাঁড় করায়।

কিন্তু 'রুল অব গেম' হঠাৎ করেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। পরিপূর্ণভাবেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। লাখ লাখ মানুষ, যারা থাকতো সুদূর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিজন-বনপ্রান্তরে অথবা সেসব লোক– যারা কখনো বার্লিন-পাঁচিলের নাম বা সোভিয়েত ইউনিয়সের নাম শোনেইনি– চিন্তাও করতে পারেনি কীভাবে সেই সুদূরবর্তী অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ তাদের জীবনযাপনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের সম্পদ হারিয়ে ফেলার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১৯৫০-এর শুরুতেই যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো করেই ভারত বেছে নিয়েছিল উন্নয়নের মডেল– বিশাল বিশাল স্টিল-কারখানা (ভিলাই, বোকারো প্রকল্প) কিংবা বিশাল বিশাল বাঁধ বা জলাধারগুলো– যেগুলি অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এমন একটি যুগ ছিল এটা যখন ব্যক্তিমালিকানাধীন ও কাঠামোগত সমন্বয় করার মাধ্যমে এসব ঘটনা ঘটছিল অকল্পনীয় গতিতে।

'উন্নয়ন' এবং 'প্রগতি'র মতো শব্দগুলো আজকের দিনে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এগুলোকে এখন একটার সমার্থক হিসেবে অন্যটাকে ব্যবহার করা

হয়। সেই সঙ্গে চলছে অর্থনৈতিক সংস্কার কিংবা আইনের উদারিকীকরণ এবং প্রাইভেটাইজেশন বা বেসরকারিকরণ। 'মুক্তবুদ্ধি' মানেই এখনকার দিনের 'পছন্দ'। তবে মানুষের যে মূল চেতনা, তার সঙ্গে এটার খুব বেশি সামঞ্জস্য নেই। বরং এটা এখন হয়েছে বিভিন্ন সুগন্ধী ব্র্যান্ডের পার্থক্যের মতো। 'মার্কেট' বলতে এখন আর এটা বোঝায় না– যেখানে মানুষ কেনাকাটা করতে যায়। বরং 'মার্কেট' এখন স্থাননির্বিশেষে যে কোনো জায়গারই একটি ব্যবস্থাপনায় পরিণত হয়েছে– যেখানে মানুষ তার ব্যবসার কাজটি করতে পারবে। সেখানে ক্রয় বিক্রয় হতে পারে এবং সেটা হতে পারে 'ভবিষ্যত' ক্রয় বিক্রয়। 'ন্যায়বিচার'-এর এখন মানে দাঁড়িয়েছে 'মানবাধিকার' (এবং সেটা অল্প কিছু লোকের স্বার্থরক্ষার 'মানবাধিকার')। নব্য 'জার'দের (রাশিয়ার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সম্রাট) সবচেয়ে অসাধারণ কৌশলগত বিজয় হলো ভাষাকে ছিনিয়ে নেওয়া। এটা হচ্ছে একরকম ভাষার ভেতর থেকে 'শব্দ'কে চুরি করা; অথবা শব্দের ভেতর অর্থ-বিচ্যুতি ঘটানো ও অস্ত্রের মতো ব্যবহার করা, অথবা এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে মূল উদ্দেশ্যগুলোকে মুখোশ পরিয়ে ফেলা যায়; এবং এভাবে আসলে প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা অর্থ আরোপ করা যায়। এসব পন্থায় জার'রা সেসব মানুষকে এক পাশে সরিয়ে দিত, যারা তাদের বিচ্যুত করতে পারে। মানুষ যেসব নির্দিষ্ট শব্দের সাহায্যে তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে পারতো, তারা এসব শব্দ চুরি করে মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে। মানুষের প্রতিবাদকে তারা এ কথা বলে খারিজ করে দেয় যে, তোমরা যা বলছো সেটা 'প্রগতির' বিরুদ্ধে, 'উন্নয়নের' বিরুদ্ধে, 'সংস্কারের' বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি সেটা আমাদের 'জাতীয়তা'র বিরুদ্ধে– যেটি সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নেতিবাচক শব্দ। তুমি যদি একটি 'নদী বাঁচাও' বা 'বন রক্ষা' আন্দোলনের কথা বলো তবে ওরা তোমাকে বলবে– তুমি কি উন্নয়নে বিশ্বাস করো না? যাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে যাচ্ছে, যারা ভূমি থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, অথবা ডুবে যাচ্ছে বাঁধের জলাধার নির্মাণের কারণে– তারা বলবে তোমার কাছে কি উন্নয়নের বিকল্প কোনো মডেল জানা আছে? যারা বিশ্বাস করে জনগণকে শিক্ষা স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব রয়েছে, তাদেরকে বলা হবে– তুমি তো বাজারব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাচ্ছ। এবং মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যতীত কে আছে যে বাজারব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাবে?

চুরি হয়ে যাওয়া শব্দগুলোকে পুনরুদ্ধার করার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। যদিও আজকালকার দিনে খুব বেশি বিস্তারিত বিশ্লেষণের সুযোগ সীমিত, কেননা যেকোনো এক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের হাতে

অতি অল্প সময় রয়েছে। কিংবা বর্তমান যুগে এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল যখন 'ফ্রি স্পেস' গরীবদের জন্য এখন আর মোটেই সামর্থ্যযোগ্য নয়। ভাষার ভেতর থেকে এই 'শব্দ' হারিয়ে যাওয়াটাই প্রমাণ করে আমাদের সর্বনাশের মাত্রা। যে ধরনের 'উন্নয়ন' কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেছে দুটো দশক, সেটা তৈরি করছে বৃহৎ একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী– যারা হঠাৎ করেই বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে অধিকারী হয়েছে বিরল সম্মানের– যা এই সম্পদ অর্জনের হাত ধরেই এসেছে। এ উন্নয়ন তৈরি করেছে বিশাল থেকে বিশালতর একটি বেপরায়া নিম্নবিত্তশ্রেণী। কোটি কোটি লোক তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কখনো বন্যা, কখানো খরা, কখনো মরুকরণের মাধ্যমে নিজেদের ভূমি থেকে অপসৃত হয়েছে। যেটা মূলত হয়েছে আমাদের পরিবেশগত প্রকৌশলের ক্ষেত্রে বাছবিচারহীন পরিকল্পনার এবং বিশাল বিশাল অবকাঠামোগত পরিকল্পনার কারণে। যেমন বাঁধনির্মাণ কিংবা খনিপ্রকল্প কিংবা 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল'। এ সব কিছুই করা হয়েছে গরীবদের উন্নয়নের নামে। প্রকৃতপক্ষে এসব করা হয়েছে নব্য উদীয়মান অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য। ভূমির জন্য এই যে যুদ্ধ, এর ভেতরেই লুকিয়ে আছে উন্নয়ন-বিতর্কের কারণসমূহ। অর্থমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে পি. চিদাম্বরম ছিলেন 'এনরন'-এর আইনজীবী এবং 'বেদান্ত' নামে একটি বহুজাতিক খনি কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর। এই সেই খনি কোম্পানি যেটা ওড়িশার নিয়ামগিরি হিল্‌স-এ বিশাল পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। সম্ভবত তার কর্মজীবনের উন্নয়নচিত্রই বিশ্ব সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। অথবা বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীতও হতে পারে। মাত্র কয়েক বছর আগে একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে, ভারতের ৮৫ শতাংশ জনগণকে শহরে টেনে আনা।'

এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে এর জন্য দরকার অত্যন্ত বড় মাপের সামাজিক-কৌশল অবলম্বন করা। এর মানে হতে পারে প্রায় ৫০ কোটি মানুষকে প্রলুব্ধ বা বাধ্য করা, যাতে তারা গ্রামীণ পরিবেশ থেকে শহরের দিকে ধাবিত হয়। এবং এই প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, এবং খুব দ্রুতই ভারতকে একটি পুলিশি-রাষ্ট্রে পরিণত করে দিচ্ছে। যে সব লোক তাদের ভূমি ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে তাদের ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে অস্ত্রের মুখে। সম্ভবত এই ঘটনা পি চিদাম্বরমের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীতে তার ক্ষমতা পরিবর্তিত হওয়ার অনুঘটকের কাজ করেছে। এই যে তার মন্ত্রীপরিষদে দায়িত্বের পরিবর্তন– আপাতভাবে এর তফাৎ যেন খুবই সামান্য মনে হচ্ছে। এ ধরনের একটি বিশাল দুঃস্বপ্নময় 'অভিলক্ষ' কারো থাকে– যেখানে জনগণের অধিকার থেকে বিশাল বিশাল ভূখণ্ড অবমুক্ত করা হবে, যেন ভারতের সকল প্রাকৃতির সম্পদ

উপযুক্ত হয়ে ওঠে কর্পোরেট লুণ্ঠকদের জন্য। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেগুলোর ভোগদখল করার জন্য। ফলত যা হচ্ছে, ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর ভূমি-সংস্কারের যে নীতিমালা ছিল– তা পরিপূর্ণভাবেই উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতায় বহুজাতিক কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের বন, পাহাড়, নদী-নালা-খাল-বিল– সবকিছুই ব্যাপকভাবে ধ্বংসের মুখে পড়েছে। যে রাষ্ট্র তার আদর্শগত অবস্থান এরই মধ্যে নষ্ট করে ফেলেছে এবং সে যা করে চলেছে তাকে আমরা একমাত্র অর্থনৈতিক আত্মহননই বলতে পারি। পূর্বভারতের বক্সাইট ও লৌহ-আকরিক খনি ধ্বংস করে ফেলছে সেখানকার পরিবেশের ভারসাম্য তথা ইকোসিস্টেম। সেখানকার উর্বর ভূমিকে পরিণত করছে উষর ভূমিতে। হিমালয় অঞ্চলের উঁচু স্থানে শতাধিক বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে– যার পরিণতি হতে পারে এক মহাদুর্যোগের। এই সমভূমিতে নদীর পাড় ধরে নির্মাণ করা হচ্ছে অসংখ্য সংরক্ষণ বাঁধ। যার বড় একটি উদ্দেশ্য বন্যানিয়ন্ত্রণ হলেও এটি নদীর তলদেশকে ভরাট করে ফেলছে– যা শেষ পর্যন্ত আরো বেশি বন্যা ডেকে আনবে। এ ছাড়া তৈরি হচ্ছে জলাবদ্ধতা এবং বেড়ে যাচ্ছে কৃষি ভূমির লবণাক্ততা। মোটকথা সাধারণ মানুষের জীবযাপনের সমস্ত উপকরণই ধ্বংসের সম্মুখীন। গঙ্গাসহ ভারতের বেশিরভাগ পবিত্র নদীগুলো সবকিছুই অপবিত্র নর্দমায় পরিণত হচ্ছে– যেখানে এখন জলের থেকেও বেশি বহন করে আবর্জনা ও শিল্পপরিত্যাক্ত বর্জ্য পদার্থ। খুব কম সংখ্যক নদী তার পূর্ণ গতিপথ অনুযায়ী প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিশতে পারে।

একেবারেই অকল্পনীয় ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট প্রস্তাবনা করেছে যে, সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়ে নদী তার জলের অপচয় ছাড়া আর কিছুই করে না। এমন অবান্তর ও স্থূল ধারণায় আবদ্ধ হয়ে স্ব-উদ্যোগে একটি রায় দিয়েছে যে– ভারতের প্রতিটি নদীকেই পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত হতে হবে– কৃত্রিম জল-ব্যবস্থাপনার মতো করে। এই ধরনের একটি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অর্থ হচ্ছে, যত পাহাড় আছে, বন আছে– তাদের ভেতর দিয়ে আমাদের সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে হবে। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা যে সমস্ত সীমানা বা সমুন্নত রেখা রয়েছে, আমাদের এ ব-দ্বীপ অঞ্চলে জলনিষ্কাষণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে– তার সমস্ত ইকোসিস্টেম ও প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থল এর মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্যভাবে বলা যায়, এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের সমগ্র উপমহাদেশের ইকোসিস্টেম আমরা ধ্বংস করে ফেলবো। (বি.এন. কিরপাল হলেন সেই বিচারক যিনি এই আদেশ জারি করেছিলেন, তিনি বিচার কাজ থেকে অবসার নেওয়ার পর যোগদান করেছেন কোকাকোলার ইনভায়রনমেন্টাল

বোর্ডে। কী চমৎকার যোগসূত্র!)

বর্তমান সময়ে মুক্তবাণিজ্য অর্থনীতির নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয় এমন সব লোকের মাধ্যমে যারা সভ্যতার এ সমস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে খুব বেশি অবহিত নয়। তারা এমন একটি ব্যবস্থাপনার দিকে যাচ্ছে যেটা কৃত্রিম চাষাবাদের ওপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এতে আমাদের কৃষির শস্যসমূহের আদলটাও চলে যাচ্ছে ভয়াবহতার দিকে। স্থানীয় মাটির উপযুক্ত অথবা সেসব মাটির অবস্থাগত যে মাইক্রোক্লাইমেট (বা সেখানকার ক্ষুদ্র পরিসরের নিজস্ব জলবায়ু)– তার উপযোগী শস্যসমূহ হারিয়ে গিয়ে সেখানে আসছে প্রচুর জল-অপচয়কারী জিনগতভাবে পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যের উচ্চ ফলনশীল অর্থকারী ফসলের সম্ভার। সেগুলো শুধুমাত্র যে বিপণন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল তাই নয়, বরং এসব শস্য মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল কৃত্রিম সার, কীটনাশক এবং যথেচ্ছভাবে ভূগর্ভস্থ সেচের জলের ওপর। কৃষিভূমির মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহারের কারণে সেগুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে রাসায়নিক পদার্থের বিষাক্ত ভাগাড়ে। এবং ক্রমে এগুলো অনুর্বর হতে হতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে– যা শেষ পর্যন্ত আমাদের ছোট পুঁজির কৃষককে ঋণের জালে আটকে ফেলছে। বিগত কয়েক বছরে কম করে এক লাখ ৮০ হাজার ভারতীয় কৃষক ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।[৮]

একদিকে যখন সরকারী খাদ্যগুদাম মজুদকৃত খাদ্যশস্যে ফুলে ফেপে উঠছে, অন্যদিকে শেষ পর্যন্ত এসব খাদ্যশস্যের কিছু অংশের নিয়তিই যেন পচে যাওয়া। অনাহার আর অপুষ্টি বেড়েই চলেছে– যেমনটি আমরা দেখতে পাই সাব-সাহারা আফ্রিকান অঞ্চলে।[৯]

সত্যিকার অর্থে ৯ শতাংশে প্রবৃদ্ধির হার শুরুতেই একটি ধ্বংসাত্মক চক্রের মতো লাগে। যত বেশি হারে আমরা জিডিপির এমন উন্নতি দেখতে পাবো, আমার মনে হয়, ততই বেশি এ ধরনের ধ্বংসে ত্বরান্বিত হবে। যে কোনো কীটপতঙ্গবিশারদকে জিজ্ঞেস করলেই তুমি এর স্বরূপ বুঝতে পারবে।

এটা যেন এমন একটি পুরাতন সমাজব্যবস্থা যেটা নাকি সামন্ততন্ত্র এবং জাতিভেদ ব্যবস্থার ভারে ভেঙে পড়ছে নিজে নিজেই– যাকে মনে হয় যেন একটি বিরাট চক্রের ভেতরে নিত্যদিন পেষণ করা হচ্ছে। এই পেষণ-প্রক্রিয়া চলছে তার প্রাচীন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে সরানো হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলোকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। এখন পুরাতন সমাজব্যবস্থা এমন বহুধা বিভক্ত হয়ে গেছে যেন অসংখ্য সরু প্রস্থবিশিষ্ট মাখনের স্তর যার মধ্যে মধ্যে রয়েছে বর্জ্য জলীয়স্তর। মাখনগুলো হচ্ছে ভারতের সেই সমস্ত মার্কেট

যেখানে লাখ লাখ ভোক্তাশ্রেণী রয়েছে (গাড়ির ভোক্তা, সেল ফোন, কম্পিউটার, কিংবা ভ্যালেন্টাইন ডে'র সম্ভাষণ কার্ডের ভোক্তা)– যেটা নাকি আন্তর্জাতিক ব্যবসার একটি আকর্ষণীয় জায়গা। অন্যদিকে যে বর্জ্য জল রয়েছে– তা যেন নজর দেওয়ার মতো কোনো বিষয়ই নয়। এ বর্জ্যকে যেকোনো দিকে ছড়িয়ে ফেলা যায়, অথবা একটা পুকুরে জমা করে রাখা যায়। অথবা এগুলোকে নিষ্কাষণ করে দেওয়া যায়। অথবা এমনটাই তারা ভাবে, যাদের হাতে রয়েছে ক্ষমতার রাশ। ইতোপূর্বে ভারতের কিছু জায়গায় যে সমস্ত হিংসাত্মক গৃহযুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারা কখনই এ বিষয়ে চিন্তা করেনি। যেমনটি হয়েছিল ছত্তীশগঢ়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা কিংবা পশ্চিম বাংলায়।

ফিরে আসি ১৯৮৯ সালে। আমরা দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করতে পারি 'একতা' বা এবং 'উন্নয়ন' এই দুটোর মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে? সে সময় কংগ্রেস সরকার প্রথমবারের মতো ভারতের বাজার বিশ্বের জন্য খুলে দিচ্ছে। সে সময় বিরোধী দলে থাকা ডানপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ওই সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদের (যেটা 'হিন্দুত্ব' নামে জনপ্রিয়) অত্যন্ত শক্তিশালী প্রচারাভিযান চালান। ১৯৯০ সালে বিজেপি'র প্রভাবশালী নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী সমগ্র দেশে তখন সফর করতে বেরিয়েছিল এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা ও উত্তেজনার জন্ম দিয়েছিল। বিজেপি দাবি করছিল বাবরি মসজিদ– যেটা ষোড়শ শতকের নির্মিত, অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে যার অবস্থান– ধ্বংস করে ফেলা উচিত এবং সে জায়গায় একটি রাম মন্দির নির্মাণ করা উচিত। ১৯৯২ সালে কতিপয় সশস্ত্রদল আদভানির উস্কানিতে ধ্বংস করে ফেলে বাবরি মসজিদটি। ১৯৯৩ সালের প্রথম দিকে আরো কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি মুম্বাই শহরজুড়ে মুসলমানের সম্পদ লুণ্ঠনসহ হাজার খানেক মুসলমানকে হত্যা করে। প্রতিশোধ হিসেবে শহরজুড়ে কয়েক দফা বোমা হামলা চালানো হয় এবং আড়াই শ' লোক তাতে মারা যায়।[৪] এভাবেই সাম্প্রদায়িক উস্কানি জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে বিজেপি– ১৯৮৪ সালে সংসদে যাদের দুটো মাত্র আসন ছিল, তারা ১৯৯৮ সালে কংগ্রেসকে পরাজিত করে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করে।

এটা সম্ভবত কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, ঐতিহাসিক সে-ই ক্ষণে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ঘটছিল, যখন আমেরিকা তাদের মূল শত্রু হিসেবে কমিউনিজমকে ইসলাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত করছিল। ওই সময় একটি র‍্যাডিক্যাল ইসলামী মুজাহিদীন দলকে– যাদেরকে একসময় প্রেসিডেন্ট রিগ্যান হোয়াইট হাউজে বসে তুলনা করেছিলেন তাদের জাতির স্থপতি পিতাদের সঙ্গে, হঠাৎ করেই তাদের সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা শুরু করলো। ১৯৯০-'৯১ সালে উপসাগরীয়

যুদ্ধের সময় সিএনএন তাদের সরাসরি সম্প্রচার শুরু করে। উপসাগরীয় যুদ্ধের 'অপারেশন ডিজার্ট স্টর্ম' উচ্চবিত্তের ড্রয়িংরুমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়– যার মাধ্যমে তারা প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন দেখার আনন্দের সঙ্গে এই যুদ্ধও উপভোগ করছিল। প্রায় সে সময়টাতেই ভারতীয় সরকার– যারা একসময় ছিল প্যালেস্টাইনদের অকৃত্রিম বন্ধু, হঠাৎ করেই তারা ইজরায়েলের স্বাভাবিক বন্ধুতে পরিণত হয়। এখন তো প্রায়ই ভারত ও ইজরায়েল যৌথভাবে সামরিক মহড়ায় অংশ নেয় এবং গোয়েন্দাতথ্য বিনিময় করে; এবং সম্ভবত কীভাবে সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব– সে বিষয়েও তারা তথ্য বিনিময় করে।

১৯৯৮ সালে বিজেপি যখন ক্ষমতা দখল করে, উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড বলতে তাদের কাছে ছিল প্রাইভেটাইজেশন এবং উদারিকীকরণ– যেটা প্রায় আট বছরের পুরাতন হয়েছিল। যদিও বিজেপি এতদিন পর্যন্ত খুব জোরের সঙ্গেই এইসব অর্থনৈতিক সংস্কারগুলোর বিরোধিতা করেছিল এই বলে যে, এগুলো হচ্ছে উদারিকীকরণের মাধ্যমে লুটপাটের ব্যবস্থা। কিন্তু যেই বিজেপি ক্ষমতায় এসে গেল অমনি সে মুক্তবাজার অর্থনীতিকেই আলিঙ্গন করলো এবং এদের যত সামর্থ্য ছিল তার সবকিছুই 'এনরনের' ন্যায় অন্যান্য বহুজাতিক কোম্পানির পেছনে ঢেলে দিল। (প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একবার যে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে যায়, তখন সে তার পূর্ববর্তী যেকোনো অঙ্গীকার ভাঙতে পারে এবং সে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে।)

ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহের ভেতরে বিজেপি কয়েকটি গবেষণামূলক-পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারত পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকা নাম উঠিয়েছিল ১৯৭৫ সালেই– পারমাণবিক শক্তির সফল নিরীক্ষা চালায় ১৯৯৮ সালে। পুরো বিষয়ই এ সময় অন্য একটি মাত্রা পায়। যে বিশাল জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনায় এই গবেষণাগুলোকে মানুষ গ্রহণ করেছিল, সেটা অত্যন্ত শীতল ও আগ্রাসি একটি ভাষার আমদানি করে। মূলধারার জনগোষ্ঠীর ভেতরে বিশেষ ধরনের ঘৃণার সঞ্চার করে। এখন যা বলা হচ্ছে তার কোনো কিছুই নতুন ছিল না, শুধু একটুকুই পরিবর্তন ঘটেছিল যে, আগে যেগুলিকে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য মনে করা হতো– সেগুলি হঠাৎ করেই অত্যন্ত গ্রহণীয় শুধু নয়, রীতিমতো উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। তখন থেকেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং পারমাণবিক জাতীয়তাবোধ কর্পোরেট বিশ্বায়নের মতো যে কোনো পার্টির মূলনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এ বিষ সরাসরি আমাদের রক্তের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের যত হিংস্রতা ও মামুলিত্ব আছে, তার নেপথ্যে এই বিষ লুকিয়ে আছে। আমাদের নৈমিত্তিক জীবনে আমরা যা কিছু নিয়ে কারবার করি না কেন, সরকার নিজেকে সেকুলার বা

যেখানে লাখ লাখ ভোক্তাশ্রেণী রয়েছে (গাড়ির ভোক্তা, সেল ফোন, কম্পিউটার, কিংবা ভ্যালেন্টাইন ডে'র সম্ভাষণ কার্ডের ভোক্তা)– যেটা নাকি আন্তর্জাতিক ব্যবসার একটি আকর্ষণীয় জায়গা। অন্যদিকে যে বর্জ্য জল রয়েছে– তা যেন নজর দেওয়ার মতো কোনো বিষয়ই নয়। এ বর্জ্যকে যেকোনো দিকে ছড়িয়ে ফেলা যায়, অথবা একটা পুকুরে জমা করে রাখা যায়। অথবা এগুলোকে নিষ্কাষণ করে দেওয়া যায়। অথবা এমনটাই তারা ভাবে, যাদের হাতে রয়েছে ক্ষমতার রাশ। ইতোপূর্বে ভারতের কিছু জায়গায় যে সমস্ত হিংসাত্মক গৃহযুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারা কখনই এ বিষয়ে চিন্তা করেনি। যেমনটি হয়েছিল ছত্তীশগঢ়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা কিংবা পশ্চিম বাংলায়।

ফিরে আসি ১৯৮৯ সালে। আমরা দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করতে পারি 'একতা' বা এবং 'উন্নয়ন' এই দুটোর মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে? সে সময় কংগ্রেস সরকার প্রথমবারের মতো ভারতের বাজার বিশ্বের জন্য খুলে দিচ্ছে। সে সময় বিরোধী দলে থাকা ডানপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ওই সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদের (যেটা 'হিন্দুত্ব' নামে জনপ্রিয়) অত্যন্ত শক্তিশালী প্রচারাভিযান চালান। ১৯৯০ সালে বিজেপি'র প্রভাবশালী নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী সমগ্র দেশে তখন সফর করতে বেরিয়েছিল এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা ও উত্তেজনার জন্ম দিয়েছিল। বিজেপি দাবি করছিল বাবরি মসজিদ– যেটা ষোড়শ শতকের নির্মিত, অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে যার অবস্থান– ধ্বংস করে ফেলা উচিত এবং সে জায়গায় একটি রাম মন্দির নির্মাণ করা উচিত। ১৯৯২ সালে কতিপয় সশস্ত্রদল আদভানির উস্কানিতে ধ্বংস করে ফেলে বাবরি মসজিদটি। ১৯৯৩ সালের প্রথম দিকে আরো কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি মুম্বাই শহরজুড়ে মুসলমানের সম্পদ লুণ্ঠনসহ হাজার খানেক মুসলমানকে হত্যা করে। প্রতিশোধ হিসেবে শহরজুড়ে কয়েক দফা বোমা হামলা চালানো হয় এবং আড়াই শ' লোক তাতে মারা যায়।[৩] এভাবেই সাম্প্রদায়িক উস্কানি জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে বিজেপি– ১৯৮৪ সালে সংসদে যাদের দুটো মাত্র আসন ছিল, তারা ১৯৯৮ সালে কংগ্রেসকে পরাজিত করে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করে।

এটা সম্ভবত কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, ঐতিহাসিক সে-ই ক্ষণে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ঘটছিল, যখন আমেরিকা তাদের মূল শত্রু হিসেবে কমিউনিজমকে ইসলাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত করছিল। ওই সময় একটি র‍্যাডিক্যাল ইসলামী মুজাহিদীন দলকে– যাদেরকে একসময় প্রেসিডেন্ট রিগ্যান হোয়াইট হাউজে বসে তুলনা করেছিলেন তাদের জাতির স্থপতি পিতাদের সঙ্গে, হঠাৎ করেই তাদের সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা শুরু করলো। ১৯৯০-'৯১ সালে উপসাগরীয়

যুদ্ধের সময় সিএনএন তাদের সরাসরি সম্প্রচার শুরু করে। উপসাগরীয় যুদ্ধের 'অপারেশন ডিজার্ট স্টর্ম' উচ্চবিত্তের ড্রয়িংরুমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়– যার মাধ্যমে তারা প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন দেখার আনন্দের সঙ্গে এই যুদ্ধও উপভোগ করছিল। প্রায় সে সময়টাতেই ভারতীয় সরকার– যারা একসময় ছিল প্যালেস্টাইনদের অকৃত্রিম বন্ধু, হঠাৎ করেই তারা ইজরায়েলের স্বাভাবিক বন্ধুতে পরিণত হয়। এখন তো প্রায়ই ভারত ও ইজরায়েল যৌথভাবে সামরিক মহড়ায় অংশ নেয় এবং গোয়েন্দাতথ্য বিনিময় করে; এবং সম্ভবত কীভাবে সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব– সে বিষয়েও তারা তথ্য বিনিময় করে।

১৯৯৮ সালে বিজেপি যখন ক্ষমতা দখল করে, উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড বলতে তাদের কাছে ছিল প্রাইভেটাইজেশন এবং উদারিকীকরণ– যেটা প্রায় আট বছরের পুরাতন হয়েছিল। যদিও বিজেপি এতদিন পর্যন্ত খুব জোরের সঙ্গেই এইসব অর্থনৈতিক সংস্কারগুলোর বিরোধিতা করেছিল এই বলে যে, এগুলো হচ্ছে উদারিকীকরণের মাধ্যমে লুটপাটের ব্যবস্থা। কিন্তু যেই বিজেপি ক্ষমতায় এসে গেল অমনি সে মুক্তবাজার অর্থনীতিকেই আলিঙ্গন করলো এবং এদের যত সামর্থ্য ছিল তার সবকিছুই 'এনরনের' ন্যায় অন্যান্য বহুজাতিক কোম্পানির পেছনে ঢেলে দিল। (প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একবার যে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে যায়, তখন সে তার পূর্ববর্তী যেকোনো অঙ্গীকার ভাঙ্গতে পারে এবং সে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে।)

ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহের ভেতরে বিজেপি কয়েকটি গবেষণামূলক-পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারত পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকা নাম উঠিয়েছিল ১৯৭৫ সালেই– পারমাণবিক শক্তির সফল নিরীক্ষা চালায় ১৯৯৮ সালে। পুরো বিষয়ই এ সময় অন্য একটি মাত্রা পায়। যে বিশাল জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনায় এই গবেষণাগুলোকে মানুষ গ্রহণ করেছিল, সেটা অত্যন্ত শীতল ও আগ্রাসি একটি ভাষার আমদানি করে। মূলধারার জনগোষ্ঠীর ভেতরে বিশেষ ধরনের ঘৃণার সঞ্চার করে। এখন যা বলা হচ্ছে তার কোনো কিছুই নতুন ছিল না, শুধু একটুকুই পরিবর্তন ঘটেছিল যে, আগে যেগুলিকে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য মনে করা হতো– সেগুলি হঠাৎ করেই অত্যন্ত গ্রহণীয় শুধু নয়, রীতিমতো উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। তখন থেকেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং পারমাণবিক জাতীয়তাবোধ কর্পোরেট বিশ্বায়নের মতো যে কোনো পার্টির মূলনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এ বিষ সরাসরি আমাদের রক্তের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের যত হিংস্রতা ও মামুলিত্ব আছে, তার নেপথ্যে এই বিষ লুকিয়ে আছে। আমাদের নৈমিত্তিক জীবনে আমরা যা কিছু নিয়ে কারবার করি না কেন, সরকার নিজেকে সেকুলার বা

ধর্মনিরপেক্ষ বলুক বা নাই বলুক আমরা এখন সেই বিষ দিয়েই চালিত হচ্ছি। মুসলমান সমাজ এর পরপরই দেখতে পায়, অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই এখানে তাদের সৌভাগ্যের সম্ভাবনা কমে গিয়েছে। সামাজিক অবস্থানগতভাবে তাদের স্থান সমাজের একেবারেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাদের অবস্থান এখন দলিত এবং আদিবাসীদের সঙ্গে।[৫]

একটি জাতির জীবনে এমন কিছু ঘটনা আছে, মানুষের জীবনে যা এমনই প্রভাব ফেলে যেন সামনের একটি পর্দা উন্মোচিত করে দেয়। সাধারণ মানুষকে যা উন্নত সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দৃষ্টি দেয়। ১৯৯৮ সালের পারমাণবিক পরীক্ষা ছিল এমনই একটি ঘটনা। ভারত আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য তোমার দেবতাসুলভ দৈবজ্ঞান থাকবার দরকার নেই। এরকমই একটি বক্তব্য গ্রন্থিত ছিল 'দ্য এন্ড অব ইমাজিনেশন' নামের আমার একটি প্রবন্ধে (এই সংকলনে সেটি অন্তর্ভুক্ত নয়)– যা আমি পারমাণবিক পরীক্ষার বেশ কিছু দিন পর লিখেছিলাম:

> 'আত্মমর্যাদাপূর্ণ বিস্ফোরণ', 'পুনরুদ্দীপনার পথ', 'গর্বের মুহূর্ত'-এগুলোই ছিল পারমাণবিক পরীক্ষা-সাফল্যের পরের দিনের ভারতের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম।
>
> 'এটা শুধু পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষাই নয়, জাতীয়তাবোধের পরীক্ষাও, সেটাই আমাদের বারবার শোনানো হয়েছে।
>
> বারবার করেই আমাদের মন ও মস্তিষ্কে এটা গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, ভারতই একটা বোমা অথবা বোমাটিই ভারত। শুধু ভারত নয়, 'হিন্দু ভারত'। এর অর্থ হলো, সাবধান! এর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সমালোচনার অর্থ হবে শুধু জাতীয়তা-বিরুদ্ধ নয়ই, হিন্দুত্ব বিরোধীও... এটি পারমাণবিক বোমার এমন একটি অনুষঙ্গ ছিল যেটা অনভিপ্রেত। শত্রুদের উদ্দেশ্যে হুমকি প্রয়োগের কাজেই সরকার এটাকে ব্যবহার করতে পারতো, তাই শুধু নয়, এটাকে ব্যবহার করে নিজের জনগণের ওপরও যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতো। অর্থাৎ, আমাদের ওপরই?
>
> এগুলো সবই কি পরিচিত মনে হচ্ছে না? এর কারণ, বাস্তবতা একসময় বিলীন হয়ে যায়; এবং ক্রমাগতই তা নিস্তব্ধতার দিকে ধাবিত হয় পুরাতন নির্বাক সাদাকালো চিত্রের মতো– মানুষের সেসব দৃশ্য, যে বাড়িতে তারা বসবাস করতো সেখান থেকে তাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে, জমা করা হচ্ছে, একত্রিত করা হচ্ছে এবং তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্যাম্পের দিকে। কিংবা কোনো গণহত্যা, কিংবা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার দিকে, কিংবা অফুরন্ত মানুষের সারি– যারা হেঁটে চলেছে অজানা গন্তব্যের দিকে। সেখানে শব্দের কোনো ছিটেফোঁটাও নেই, সিনেমা হলগুলো যেন একেবারেই নিস্তব্ধ! কারণটা কি আমি খুব বেশি ছবি দেখছি– এ জন্য? আমি কি পাগল উন্মাদ হয়ে গেছি? নাকি আমিই ঠিক

আছি? 'আমরা'ই কি ওই ছবিগুলোকে অপ্রতিহত শীর্ষবিন্দুর দিকে ধাবিত করছি? আমাদের ভবিষ্যত কি খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে পশ্চাৎপদতার দিকে?[৬]

'আমরা' বলতে এখানে আমি চিহ্নিত করছি সংখ্যাগুরু হিন্দু হিসেবে। 'অতীত' বলতে আমি বুঝিয়েছি ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তিকে, যখন ১০ লাখেরও বেশি হিন্দু ও মুসলমান একে-অপরকে হত্যা করেছিল এবং ৮০ লাখ উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল।

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন চলন্ত ট্রেনে আগুন লাগানো হয়েছিল, যে আগুনে পুড়ে আযোধ্যা থেকে তীর্থ করে ফেরা ৫৮ জন তীর্থযাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল। গুজরাটের বিজেপি সরকার, নরেন্দ্র মোদী ছিলেন যার মুখ্যমন্ত্রী, খুব সর্তকতার সঙ্গে তার রাজ্যের মুসলমানদের ওপর একটি গণহত্যার নীল নকশা করে। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার আক্রমণের ফলে সারা বিশ্বেই যে ইসলামভীতি তৈরি হয়েছিল সেটা তার এই পরিকল্পনার পালে ভালোই হাওয়া জুগিয়েছিল। গুজরাট সরকারের সব ধরনের প্রতিষ্ঠান তার এ পরিকল্পনার পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং দুই হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যার দৃশ্য গুজরাটের মানুষ নীরব দর্শকের মতো দেখে গিয়েছিল।[৭]

নারীদের গণধর্ষণসহ জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। দেড় লাখের মতো মুসলমানকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়। সমগ্র সম্প্রদায়কেই সামাজিকভাবে একঘরে করে ফেলা হচ্ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবেও তাদেরকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছিল। গুজরাট বরাবরই একটি সাম্প্রদায়িক-হিংসা উপদ্রুত রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে এবারেরটা দাঙ্গা ছিল না। এটা ছিল একটি ব্যাপক গণহত্যা। যদিও ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা রুয়ান্ডা, কঙ্গো কিংবা সুদানের ভয়াবহ অবস্থার তুলনায় একটু কমই ছিল, কিন্তু গুজরাটের ধ্বংসযজ্ঞ ছিল জনগণের জন্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত একটি নীল নকশা– যার লক্ষ্য বা পরিকল্পনা বুঝতে কোনো ভুল করার সম্ভাবনা ছিল না। এটা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে মুসলমান নাগরিকদের জন্য একটি প্রকাশ্য সর্তকবাণী।

ধ্বংসযজ্ঞের পরে নরেন্দ্র মোদী নিজেই একটি আগাম নির্বাচনের চেষ্টা শুরু করেন। এবং গুজরাটের জনগণের ভোটেই পুনরায় নির্বাচিত হন। পরবর্তী পাঁচ বছর শেষেও তার এ সাফল্য পুনরায় দৃশ্যপটে বিরাজ করে। মোদী এখন তৃতীয়বারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন– যার শাসনকাল ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয় ব্যবসায়ী মহলের কাছে, তার মুক্তবাণিজ্য নীতির প্রতি আস্থার কারণে। গুজরাটের জনগণের প্রতি যদি আমাকে সৎ থাকতে হয়, তবে আমি বলবো, নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্বের যে নির্দিষ্ট মূলমন্ত্র ছিল (পরমাণবিক) তার

তুলনায় তাদের সামনে একটাই বিকল্প ছিল কংগ্রেস পার্টির একজন প্রার্থী যার নাম শংকরসিং ভাগেলা। শংকরসিং বিজেপির ছায়াতলেরই সাবেক মুখ্যমন্ত্রী হলেও তার হিন্দুত্ব ছিল নিজস্ব-ব্রান্ডের (লঘু ও জটপাকানো) । এটা আশ্চর্য নয় যে, মোদীর বিকল্প শংকরসিং হতে পারতেন না।

আমার এ সংকলনের প্রথম রচনাটি গুজারাটের গণহত্যা নিয়ে, যার নাম– 'গণতন্ত্র : আমাদের ঘরোয়া জীবনে কী তার অর্থ?' ২০০২ সালের মে মাসে এটা লেখা হয়েছিল যখন খুনে-সন্ত্রাসীবাহিনী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো এবং মুসলমানদের হত্যা কিংবা আতঙ্কিত করে রাখতো। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তখনকার লেখা আর হালনাগাদ করিনি। কারণ, আমার মনে হয়েছে এটা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে, কত কঠিন ছিল সে সময়ে যে, বাস্তবে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে চলেছিল। এবং যা ঘটছে তা নিজেও ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তার সম্পর্কে আগাম ধারণা দিতে পারে। এ জন্য সে লেখাগুলোকে হালনাগাদ করার পরিবর্তে আমি বরং কিছু নতুন মন্তব্য সংযুক্ত করেছি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমার এ প্রবন্ধে গুজরাটের গণহত্যা সম্পর্কে নিচের এ মন্তব্য যুক্ত হয়েছে :

> "আমরা কি আগামী বছর এ ঘটনা বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন আশা করতে পারি? কিংবা এসব ঘটনাকে ঘৃণা করার মতো কেউ কি তখন অবশিষ্ট থাকবে– তারা যেমন: বর্ণানুক্রমে– আদিবাসী, খ্রিস্টান, দলিত, পার্শি, বৌদ্ধ, শিখ? সেসব মানুষ, যারা জিন্স পরে কিংবা ইংরেজিতে কথা বলে, কিংবা পুরু ঠোঁট ও কোঁকড়ানো চুল যাদের? মনে হয় না আমাদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে।"

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী নিজের শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে কংগ্রেস পার্টির নেতাদের দ্বারা পরিচালিত কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনগোষ্ঠী সহস্রাধিক শিখ-কে দিল্লির রাজপথে জবাই করে হত্যা করেছিল। এ সব হত্যাকারী লুটেরা ছিল বজরং দলের অর্ন্তগত। একটি হিন্দু রক্ষীবাহিনী ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান মিশনারী গ্রাহাম স্টেইনসের দুই সন্তানসহ তাঁকে জীবিত দগ্ধ করেছিল।[৮]

২০০৭-এর ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের ওপর হিন্দু রক্ষীবাহিনীদের আক্রমণ আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। বেশ কয়েকটি রাজ্যেই, গুজরাট কর্ণাটক ওড়িশাতে খ্রিস্টানরা আক্রমণের শিকার হচ্ছিল। চার্চ ধ্বংস হচ্ছিল। ওড়িশার খাণ্ডামালে 'হিন্দু' দলিত ও আদিবাসীরা কমপক্ষে ১৬ জন আদিবাসী খ্রিস্টানকে হত্যা করেছিল।[৯]

দশ হাজারের বেশি খ্রিস্টান তখন উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করতো অথবা আশেপাশে পালিয়ে বেঁচেছিল। তাঁরা নিজেদের চাষাবাদের জমিতে ফিরে যাওয়ার সাহস পায়নি। হিন্দুয়ায়ন প্রক্রিয়া দলিত ও আদিবাসীদের মধ্যে এমনভাবে চলছে, একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে এমনভাবে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং মুসলমান ও মাওবাদীদের বিরুদ্ধেও লেলিয়ে দেওয়াটা হিন্দুত্ব প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। (এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, এসব সম্প্রদায় সেই সমস্ত বনাঞ্চল ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করে যে অঞ্চলগুলোর ওপর বহুদিন ধরেই বহুজাতিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে রয়েছে এবং সরকারও সেগুলিকে জনশূন্য করতে চায়। সে কারণে, হিন্দুত্ববাদী শিবিরিগুলো হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার নামে আসলে এসব জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।)

২০০৮-এর ডিসেম্বরে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে থেকে হিন্দু সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি ব্যাঙ্গালর এবং ম্যাঙ্গালর– যেগুলি ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র– সেখানে জিন্স অথবা পশ্চিমাধাঁচের পোশাক পরিধান করা নারীদের ওপর আক্রমণ ও হুমকি দিতে থাকে।[১০]

সেই হুমকি এখনো চলছে। হিন্দু রক্ষীবাহিনীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে কর্ণাটককে আরেকটি গুজরাট বানিয়ে ছাড়বে। যেহেতু বিজেপি কর্ণাটক এবং গুজরাটে তার মূল আসন গেড়ে বসেছে এবং এই দুটি অঞ্চলই হচ্ছে বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান এলাকা, সে কারণে এসব সম্পর্ক আরেক বারের মতো এই সত্যটিই আমাদের সামনে আরেকবার তুলে ধরে যে, 'একতা' বা এবং 'উন্নয়ন' এই দুটোর মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে; অথবা, তুমি ধরে নিতে পারো, এদের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য আর ফ্যাসিজমের মতোই সম্পর্ক রয়েছে।

২০০৯-এর জানুয়ারিতে এই ধরনের একটি সম্পর্ক জনগণের সামনে চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়। ভারতে বৃহত্তম দুই কোম্পানি টাটা গ্রুপের প্রধান রতন টাটা ও রিলায়েন্স গ্রুপের প্রধান মুকেশ আম্বানী 'গুজরাট গরিমা' নামে গুজরাটের একটি পদকগ্রহণ অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদীকে (যিনি ছিলেন গুজরাট গণহত্যার প্রধান পরিকল্পনাকারী) সর্মথন জানান। ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন।

এই বইটি যখন প্রেসে যাচ্ছে তখন জানতে পারলাম, ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচন মাত্রই শেষ হলো, যেখানে প্রায় দুই শো কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে।[১১]

এই পরিমাণ অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি। যদিও কিছু মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের এ নির্বাচনের মূল বাজেট ছিল 'এক হাজার

কোটি' ডলারেরও বেশি।[১২]

যে কেউ এ প্রশ্ন করতেই পারে– কোথা থেকে এলো এত টাকা?

কংগ্রেস এবং তার জোটগুলো– সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা খুব ভালোভাবেই বিজয়ী হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৯০ শতাংশেরও বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থী পরাজিত হয়েছে। পরিষ্কারভাবেই, কোনো ধরনের স্পন্সরশিপ ছাড়া একটি নির্বাচনে জয় পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী চালের ভর্তুকির প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না, বিনামূল্যে টেলিভিশনের আশ্বাস শোনাতে পারেন না, ভোটারদের নগদ কিছুও দিতে পারেন না; অথবা করতে পারেন না সেসব নিচু মানসিকতার কুৎসিত দানশীলতার কর্মকাণ্ড যার মধ্যে নির্বাচনের অর্থকে টেনে নামানো হয়েছে।[১৩]

যদি তুমি একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে নির্বাচনের ফলাফলের হিসাবনিকাশটা দেখো, তবে তোমার কাছে মনে হবে 'স্বস্তিদায়ক' কিংবা 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' জাতীয় শব্দগুলোকে মনে হবে প্রতারণামূলক, কেননা এগুলোকে নির্জলা ভুল হিসেবেও প্রতিপন্ন করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ইউপিএ বা সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা এ নির্বাচনে যে পরিমাণ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছে, হিসাবনিকাশ করে দেখা যায় তারা সমগ্র দেশের জনগণের মাত্র ১০.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এটা যথেষ্ট কৌতূহল-উদ্দীপক যে, নির্বাচন-সংক্রান্ত গণতন্ত্রে অঙ্কের মারপ্যাঁচেও কীভাবে বড় ধরনের একটি বিজয় অর্জন করা সম্ভব।[১৪]

যাই হোক, যা হয়েছে তা তেমনই থাকুক, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে লালকৃষ্ণ আদভানি নয় (যে কিনা মূর্তিমান বিদ্বেষ-উৎসারি), বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ধর্মনিরপেক্ষ ড. মনমোহন সিং– যিনি বাজারব্যবস্থাপনায় নব্য সংস্কারবাদীদের প্রবক্তা, যিনি কখনই তাঁর জীবনে কোনো নির্বাচনে জয় লাভ করেননি।

এই ভোটগুলোতে অর্থনৈতিক সংস্কার-প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে পার্টিগুলোর ভেতরে ব্যাপক সমঝোতা ছিল। বিজেপির প্রধান নীতিনির্ধারক গোবিন্দাচার্য (যিনি ছিলেন রাম জন্মভূমি আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা) খুব ব্যঙ্গাত্মকভাবেই একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কংগ্রেস এবং বিজেপি যেন জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করে।[১৫]

অবশ্য কোনো কোনো রাজ্যে ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারটা দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ছত্তীশগঢ়ই বিজেপি সরকার পরিচালনা করে এবং কংগ্রেসের রাজনীতিকরা 'সালওয়া জুদুম' নামে একটি ক্যাম্প পরিচালনা করে। এটা হচ্ছে, সরকারের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা দুষ্ট-জনগণের একটা রক্ষিবাহিনী। জুদুম এবং সরকার যৌথভাবে এমন একটি মৈত্রী জোট গঠন করেছে যারা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে বনের

ভেতরেই এমন একটি ভীতিকর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা পৌঁছে গেছে অমানবিক পর্যায়ে। মাওবাদীরা বনাঞ্চলে একটি সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলেছে তাদের ভূমি জবরদখল হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে। এসব ভূমিদখল পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে। এসব কর্পোরেশন বসে আছে ভূমি দখল করে সেখানে স্টিল ফ্যাক্টরি বসানোর জন্য, খনি প্রকল্প চালুর জন্য– যাতে তারা আহরণ করতে পারে লৌহ টিন এবং অন্যান্য সম্পদ– যা ওইসব বনাঞ্চলের মাটির নিচে রয়েছে। এ কারণে ছত্তীশগঢ় আমরা দেখতে পাই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুটি রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য জোটগঠন। এই আদিবাসীরা ভারতের সবচেয়ে গরীব, সবচেয়ে নাজুক জনগণ। ইতোমধ্যেই ৬৪৪ টি গ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং ৫০ হাজার আদিবাসীকে সালওয়া জুদুম ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিন লাখেরও বেশি লোক নিকটস্থ জঙ্গলগুলোতে আত্মগোপন করে আছে এবং তাদেরকেই মাওবাদী বলে অভিহিত করা হচ্ছে কিংবা বলা হচ্ছে তারা মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যুদ্ধ আগত প্রায়, এবং কর্পোরেশনগুলো এর জন্যই অপেক্ষা করে বসে আছে।

তামিল টাইগারদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক কালে শ্রীলংকা সরকারের যে প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটেছে, সেখানে যুদ্ধাপরাধের কোনো ঘটনা ঘটেছিল কিনা সে বিষয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক দল গঠনের জন্য ইউরোপীয়ান দেশগুলোর একটি উদ্যোগ বন্ধ করে দিতে যে সব রাষ্ট্র তৎপর ছিল ভারত ছিল তাদের মধ্যে একটি। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বটে।[১৬]

গাজাতে ইসরায়েলি সরকার তথাকথিত 'সন্ত্রাসী' কর্মকাণ্ডকে দমন করার জন্য যে ধরনের কর্মতৎপরতা শুরু করেছে, আমাদের বিশ্বের এ প্রান্তের সরকারগুলো মনে হচ্ছে যেন সেই একই ধরনের কর্মতৎপরতা গ্রহণ করতে চায়। অর্থাৎ, এদের মূলমন্ত্র হচ্ছে মিডিয়াকে দূরে সরিয়ে রাখো এবং হত্যাকাণ্ড চালাও সর্ব্বপণে। এবং এই জাতীয় পন্থায় তোমাকে আর এটা নিয়ে চিন্তিত হতে হবে না– কে আসল সন্ত্রাসী আর কে নয়। হয়তোবা এর কারণে কিছুটা আন্তর্জাতিক ক্ষোভ বা সর্তকতা তৈরি হতে পারে, তবে খুব সহজেই সেটা আবার স্তিমিত হয়ে যাবে।

ছত্তীশগঢ়র অরণ্যচারী জনগণের জন্য ঘটনা খুব একটা ভালো দিকে যাচ্ছিল না।

দুটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে যে তথাকথিত গঠনমূলক সমঝোতা তৈরি হয়েছিল, সেটা বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করেছিল, যার ফলে তারা আগত সাধারণ

নির্বাচনের ব্যাপারে এতো বেশি উৎসাহী হয়েছিল যেটা অন্য খুব কম ক্ষেত্রে এমন উৎসাহ দেখা যেত। দেখে মনে হয়, আগে থেকেই তারা অনুধাবন করে ফেলেছিল যে, গণতান্ত্রিকভাবে যদি তারা একটি ম্যান্ডেট অর্জন করতে পারে তবে যেনতেন সম্পদ-অপহরণ প্রক্রিয়াটি আইনসিদ্ধ করার ব্যাপারটি এর চেয়ে ভালোভাবে অন্য কোনো উপায়ে করতে পারবে না। বেশ কিছু কর্পোরেশন টেলিভিশনগুলোতে অতি ব্যয়বহুল প্রচারণা ছড়িয়েছে, যার কোনো কোনোটাতে দেখা যাচ্ছিল– ধনী-গরীব যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব মানুষকেই বলিউডের বেশ কিছু চলচ্চিত্র তারকা আহ্বান জানাচ্ছেন– আপনারা বের হয়ে আসুন এবং ভোট প্রদান করুন। দিল্লির সবচেয়ে প্রভাবশালী 'খান' মার্কেটের দোকান এবং রেস্তোরাঁগুলো তাদের সেই সব ক্রেতাদের জন্য পণ্যক্রয়ে 'বিশেষ ছাড়' দিচ্ছিল যাদের আঙ্গুলে ভোটপ্রদানের অমোচনীয় কালী লেগে রয়েছিল। গণতন্ত্র হঠাৎ করেই যেন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দিল। বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, চীনারা যেমন খেলাধূলা পছন্দ করে বলে অলিম্পিকের আয়োজন করেছিল, ভারতও তেমনি গণতন্ত্র পছন্দ করে বলে নির্বাচনের আয়োজন করেছিল। দুটো ঘটনাই অনেক স্পন্সরদের আকর্ষণ করে; কারণ দুটোই তো টেলিভিশনের প্রদর্শনের উপযোগী দর্শকগ্রাহী খেলা মাত্র।

ট্রেনের একটি বগিতে 'ভারত-নির্বাচন স্পেশাল' নাম দিয়ে বিবিসি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ আয়োজন করে যাতে তারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভ্রমণ করে ভারতীয় নির্বাচনের মোহময়ী রূপ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সে বগির গায়ে এমন একটি স্লোগানও লেখা ছিল– ভারতের ভোটার'রা কি পৃথিবীর সমৃদ্ধ ভবিষ্যত পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে?[১৭]

বিবিসি (হিন্দি) আমার বাড়ির পাশের একটি ক্যাফেতে একটি পোস্টার ঝুলিয়ে রেখেছিল। পোস্টারটিতে ছবি ছিল এরকম– ১০০ ডলারের একটি নোট, যেটায় আছে বেন ফ্রাঙ্কলিনের ছবি, সেটা হঠাৎ করে রূপান্তর হয়ে ৫০০ টাকার ভারতীয় নোটে পরিণত হচ্ছে (গান্ধীর ছবিসহ)। এবং পোস্টারটির ক্যাপশনে লেখা ছিল : কেয়া ইন্ডিয়া কা ভোট বাঁচায়েগা দুনিয়া কা নোট? (ভারতের ভোটের মাধ্যমে কি বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থা রক্ষা পেতে পারবে?) এই ধরনের নির্লজ্জ প্রচারণার মাধ্যমে সমগ্র নির্বাচন ব্যবস্থাকেই যেন একটা বাজার ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছিল– যেখানে ভোটররা হচ্ছে শুধুমাত্রই ক্রেতা এবং গণতন্ত্র একটি বাজার মাত্র। অতএব, যারা ক্রেতা নয়, অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা নেই যাদের– তারা যেন কেউ নয়।

এ বারের নির্বাচনে ইউপিএ (সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা) জয়লাভের অন্তর্নিহিত

তাৎপর্যটা কী? পরিষ্কারভাবেই বলা যায়, এটা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কেননা, তর্ক করার ক্ষেত্র অনেক বেশি প্রশস্ত হতেই পারে। ভারতের নির্বাচনের অন্তর্নিহিত অর্থকে অনুধাবন করাটা আসলে ঠিক ততোটাই বিজ্ঞান বলা যাবে, যতোটা বিজ্ঞান বলা যায় 'জাদু-মায়াবিদ্যা'কে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে নির্বাচনগুলোতে কীভাবে ভোট পড়বে– সেটা অনুধাবন করা খুব সহজ নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা স্থানীয় অনেক ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, স্থানীয় জাতিভেদপ্রথার ব্যাপকতা ও সাম্প্রদায়িক হিসাব নিকাশের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এবং এই প্রতিটি ব্যাপারই এতো বেশি পরিবর্তনশীল যে আক্ষরিক অর্থেই বলা যায় যে, এক পোলিং বুথ থেকে অন্য পোলিং বুথেও সেটা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সে কারণে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি না। তবে কিছু ব্যাপার আমি আগে থেকে উপলব্ধি করতেই পারি।

কংগ্রেস সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তাদের যে অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক নীতি ছিল, সেসব নীতির ভেতর যে ভয়াবহ ধ্বংসকারী প্রভাব বিদ্যমান ছিল– তা কিছুটা হলেও প্রশমিত করার জন্য তারা তিনটি সংসদীয় আইন পাশ করে (যদিও সমালোচকরা সে আইনগুলোকে অভিহিত করেছে স্ববিরোধী এবং সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে)। আইনগুলো হচ্ছে– বনজসম্পদ অধিকার আইন (যে আইনটিতে বলা হয়েছে, অরণ্যচারী জনগণের আইনি অধিকার থাকবে বনজভূমির ওপর এবং প্রাকৃতিক উপায়ে বনভূমি থেকে আহরিত তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ ব্যবহারের ওপর), তথ্যঅধিকার আইন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনটি হলো– 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা' । এই আইন এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে ভারতের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার বৎসরে অন্তত ১০০ দিন একটি ন্যূনতম বেতনে কায়িক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার অধিকার পাবে। প্রতি পরিবার পিছু অর্থমূল্যে এ আইনের সুবিধার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৮০০০ রুপি (প্রায় ১৭০ ডলার)। এটা বেশ ভালো অঙ্কের টাকা, একটা রেস্তোরায় রসনাবিলাসের পর যে টাকা দিয়ে ভালো কোনো মিষ্টি জাতীয় মেন্যু বা গলা ভেজানোর জন্য ভালো ওয়াইন পাওয়া যাবে। এই ক্ষুদ্র একটা অর্থ যেটা হয়তোবা কোটি কোটি মানুষের দুর্দশা মোচনে কিছুটা হলেও উপকারে আসতে পারতো, এবং যারা তাদের ভূমি ও জীবিকা হারিয়ে ফেলবার পর বড় বিপদে পড়েছে, তাদের সঙ্কটমোচনে এটি কিছুটা হলেও কাজে লাগতে পারতো। চিন্তা করে দেখুন, সময় কতোটা খারাপ হতে পারে যে, সেটার প্রতিও মানুষের লোভ কী পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল (উচ্চমঞ্চে বসে আমরা দুর্দশা নিয়ে কথা বলতেই পারি। কিন্তু তার পরেও আমাদের মধ্যে কার এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার আছে যে, একেবারেই রুটিরও না থাকার চেয়ে

ছোট রুটিখণ্ড ভালো নয়? কিংবা বাস্তবিকই একটি অর্থহীন নির্বাচনের চেয়ে কোনো নির্বাচন না হওয়াটা ভালো হতে পারে?) এই নতুন আইন (জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটা হওয়াই উচিত ছিল যে, যাদের জন্য এ আইন করা হয়েছে তা তাদের দুদর্শা মোচন করছে। সেটা নিশ্চিত করতে গিয়ে ভারতের অত্যন্ত দক্ষ এবং আত্মনিবেদিত সামাজিক কর্মীদের সময় ও শ্রম সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত হয়েছিল এটা নিশ্চিত করতে যে, এই আইনটির লক্ষ্য যেসব মানুষ তাদের কাছে এর উপকারটা গিয়ে যেন পৌছায়। অথচ বিগত কয়েক বছর ধরে এই জিনিসটা নিশ্চিত করতেই এ সমস্ত সামাজিক কর্মীদের সময় ও শ্রম ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এদেরকে লড়তে হচ্ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সঙ্গে, অথবা ক্ষমতা অপব্যবহারকারীদের সঙ্গে, অথবা মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়াদের সঙ্গে। এটা করতে গিয়ে তাদের হুমকি ধামকিসহ যথেষ্ট পরিমাণ সহিংস আচরণের শিকার হতে হয়েছে। এমন কি সার্বিকভাবে এ কাজে অন্যায়ের পরিমাণটা এতোটাই বেশি ছিল যে, রাগে দুঃখে ক্ষোভে ঝাড়খণ্ডের একজন সমাজকর্মী আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।

উপহাসের কথা হলো, এই আইন সংসদে পাশ হয়েছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, বামপন্থী দলগুলো ইউপিএ সরকারকে এ বিষয়ে চাপ দিয়েছিল। একই সঙ্গে এটা অবশ্যই বলতে হবে এটি পাশ করার বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস পার্টির ভেতরে যারা মুক্ত বাণিজ্যের প্রবক্তা তাদের মধ্য থেকেই এটা পাশ করার সময় প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। কর্পোরেট দুনিয়া তো কমবেশি একযোগেই এর বিরোধিতা করেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না, যখন নির্বাচন সময় এলো তখন কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী প্রচারণায় কিন্তু তারা এই আইনটির কথাই উচ্চগলায় প্রচার করতে লাগলো। সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই যে, এর মাধ্যমে তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুব ভালো একটা অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়। এবং সেটাই ভোটের হিসেবে তাদেরকে জয়ী করে। কিন্তু নির্বাচন শেষ হয়ে যেতেই এ জয়ের নেপথ্য কারণ হিসেবে তুলে ধরা হলো সে সমস্ত নীতিকে যেগুলোর খারাপ প্রভাব কিছুটা হলেও প্রশমিত করার জন্যই এই কর্মসংস্থান আইনটিকে পাশ করা হয়েছিল। শিল্পোদ্যোক্তারা কোনো রকম কালক্ষেপণ না করে বলতে শুরু করলেন– জনগণের এই ম্যান্ডেট হচ্ছে তাদের এই নীতিগুলোর জন্য। এর মানে হচ্ছে, আমরা অধিকতর দ্রুততার সঙ্গেই বাজার-অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হবো। ভোটের পরের দিন দৈনিক পত্রিকাগুলো এ ধরনের শিরোনামে ভরে গেল– 'ভারতের কর্পোরেশনগুলো জানিয়েছে, সংস্কারের পক্ষে ভোট'।[১৮]

এর থেকে বড় পরিহাসের বিষয় রয়ে গেছে। বামপন্থী দল– যারা নাকি

দ্বৈতনীতি অবলম্বন করে চলছিল, এটা অবশ্য ভারতের সব রাজনৈতিক দলেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে বলা যায়, হঠাৎ করেই তারা ডানপন্থী হয়ে গেল। এমন কী যখন তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতিসমূহের সমালোচনা করতো, সেই একই জিনিসই তারা তাদের ঘরের মাঠ পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতো। এরা ঘোষণা করেছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম জেলায় বিশাল রাসায়নিক শিল্পকারখানার কেন্দ্র গড়ে তুলবে; সিঙ্গুরে থাকবে টাটা কোম্পানীর একটি ন্যানো-গাড়ি তৈরির কারখানা, পুরুলিয়ার লালগড় বনাঞ্চলে একটি জিন্দাল ইস্পাত কারখানা। সরকার ভূমি অধিগ্রহণ শুরু করেছিল, যার বেশির ভাগই ছিল অত্যন্ত উর্বর কৃষি ভূমি। সেটা তারা করতে শুরু করেছিল, প্রকৃত অর্থেই, অস্ত্রের মুখে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সশস্ত্র বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়– যা প্রতিরোধ করা হয়েছিল বুলেট এবং লাঠিচার্জের মাধ্যমে। দলীয় সমর্থক ও সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো প্রতিবাদকারী লোকদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল ব্যাপকভাবে নারী ধর্ষণ ও হত্যযজ্ঞের মাধ্যমে। কিন্তু ঘটনাক্রমে একটি প্রকৃত গণঅভ্যুত্থান এবং একটি সশস্ত্র গ্রুপের সফল সমন্বয়ের ফলে আন্দোলন জয়লাভ করে। তারা তিনটি ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন করে এবং সরকারকে বাধ্য করে পিছু হটতে। টাটা বাধ্য হয় তাদের ন্যানো তৈরির কারখানা গুজরাটে নিয়ে যেতে– যে রাজ্যকে বলা যায় ধর্মান্ধতার উর্বর সূতিকাগার– যেটা, টাটার মতে, বিনিয়োগের পরিবেশ সবচেয়ে ভালোভাবে নিশ্চিত করেছে। ঘটনাক্রমে এই বামপন্থী দল নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে একেবারেই নখদন্তহীন দলে পরিণত হয়– যে অবস্থা গত ৩০ বছরেও কখানো ঘটেনি।

উপহাসের পালা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। অত্যন্ত ধূর্তামির মাধ্যমে বামপন্থীদলের এ পরাজয়ের কারণ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, যেন মনে করা হয়– উন্নয়নবিরোধী নীতিসমূহ ও উন্নয়ন-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রবণতাই নির্বাচনে এদের ভরাডুবির কারণ। 'কর্পোরেট নেতারা বামপন্থীদের সঙ্গে চলতে স্বস্তিবোধ করে না'– পত্রিকায় ছিল এরকমই শিরোনাম।[১৮]

বামপন্থীদের পরাজয়ের পরেই স্টক-মার্কেটে ব্যাপক মূল্য-উত্থান দেখা যায়। দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা 'গ্রীষ্মের উৎসব পালনে' ব্যস্ত। বিভিন্ন কোম্পানির মুখ্য নির্বাহীরা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে উদ্‌যাপন করছিলেন নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের ভেতরে বামপন্থী দল না থাকার আনন্দ। কর্মব্যস্ত সংবাদ উপস্থাপকরা ঘোষণা করছিলেন, বিভিন্ন সংস্কার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউপিএ সরকারের আর কোনো অজুহাত নেই– যদি সমাজতন্ত্রের গোপন কোনো এজেন্ডা তাদের মনে না থাকে।

গণতন্ত্র একটি অদ্ভুত ব্যাপার। গণতন্ত্রের অর্থ যা কিছু তাই হতে পারে, যার যেমনটি মনে চায়।

একটি মূলধারার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সত্যিকারের একটি বামপন্থী দলের অনুপস্থিতি মোটেই কোনো উদ্‌যাপন করার মতো বিষয় নয়। কিন্তু সংসদীয় বামপন্থী দলই নিজের অবমাননার জন্য নিজেই দায়ী। এটা কোনো ট্রাজেডি নয় যে, বাম দল হঠাৎ করেই এমন অনুল্লেখযোগ্য নখদন্তহীন দলে পরিণত হয়েছে। হয়তো-বা এর ভেতর দিয়েই সত্যিকার অর্থেই কোনো প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

তর্কের জন্য যদি আমরা এটা ধরেও নিই যে, একটি নিরর্থক বিষয় শূন্যস্থান পূরণ করেছে; এবং এটা গ্রহণ করে নিই যে, ভারতের বিভিন্ন কোম্পানি এবং তাদের রথী মহারথীরাই সঠিক ছিলেন এবং ভারতের কোটি কোটি মানুষ যে ভোট দিয়েছে সেটা প্রকৃতপক্ষেই বাজারব্যবস্থা সংস্কারেরই পক্ষেই– সেটা ভালো কথা, নাকি খারাপ? সেটা কি আমরা উদ্‌যাপন করবো? আমরা কি উদ্‌যাপন করবো সেই সত্যকে, বিশ্বকে শেখানোর জন্য এই কোটি কোটি লোক, যাদের রয়েছে ভিন্ন ধরনের কল্পশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি; এবং যাদের আছে জীবনযাপনের অধিকতর স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা– তারা হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই পতিত আদর্শ গ্রহণ করার– যা একসময় আমাদের এই গ্রহটাকেই এমন সঙ্কটে অবনত করেছিল, যা থেকে হয়তো-বা কখনোই উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হতো না।

বনঅধিকার আইন আমাদের কতোটুকু ভালো করতে পারবে, যদি আমাদের অরণ্যই না থাকে? তথ্য জানবার অধিকার আমাদের কতোটা উপকার করতে পারবে, যদি আমাদের ক্ষোভ বঞ্চনাগুলো জানানোর যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকে? জলশূন্য নদী আমাদের কি-ই বা কাজে লাগবে? সেই সব সমভূমি আমাদের কি উপকারে আসবে যেখানে কোনো পাহাড় নেই, যে পাহাড় সেই সব জলপ্রবাহের সূতিকাগার যা ভূমিগুলোকে উর্বর রাখে। দেখে মনে হচ্ছে, আমরা যেন এমন একটি বাসের যাত্রী যার 'গতিরোধক' নষ্ট হয়ে গেছে এবং যেটি তাড়াহুড়ো করে এগোচ্ছে পাহাড়ের প্রান্তের দিকে। আর বাসের যাত্রীরা আমরা তর্ক করছি, যেতে যেতে কোন গানটা গাইবো, সেটা নিয়ে।

'জয় হো!' হয়তোবা এই গানটাই আমরা পছন্দ করবো।[২০]

খারাপ হোক কিংবা ভালো, ২০০৯ সালের নির্বাচন দেখে মনে হচ্ছে, উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলো বহাল তবিয়তেই গতিশীল থাকবে। যাই হোক, এটা মনে করা খুব বড় ভুল হবে যে, 'একতা'-সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো হয়তো পাশে সরে পড়েছে। ২০০৯

এর নির্বাচন প্রচারণা শুরুর সময় দুটো জিনিস স্পষ্টভাবে সংবাদমাধ্যমে প্রাধান্য পেল। একটি ছিল এক লাখ টাকায় (দুই হাজার ডলার) জনগণের জন্য গাড়ি– টাটা ন্যানো। এই প্রচারণা ছিল নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট থেকে। (রতন টাটাকে এ ব্যাপারে মোদী ভর্তুকি দিয়েছিল, যে কারণে মোদীর প্রতিও টাটা উষ্ণ সমর্থন জানায়।[২১]

আরেকটি বিষয় হচ্ছে বরুণ গান্ধী (নেহেরু পরিবারের আরেক উত্তরাধিকারী) যিনি বিজেপির জন্য নতুন এক ভীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন। তার ঘৃণাবিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ নরেন্দ্র মোদীর ভাষণকেও ম্রিয়মাণ করে দেয়। দেখে মনে হয় মোদীর যেন অবসর ঘটেছে, দায়িত্ব বর্তেছে বরুণের ওপর। একটি জনসভায় বরুণ গান্ধী বলেছিলেন, সকল মুসলমানকেই বলপ্রয়োগপূর্বক জীবাণুমুক্ত বা পবিত্র করতে হবে। 'এটা সবার কাছে পরিচিত লাভ করবে 'হিন্দুয়ানি-রক্ষা প্রকল্প' হিসেবে, কোনো মুসলমান যেন মাথা উঁচু করার সাহস না পায়।' এসব অবমাননাকর শব্দ বরুণ বলেছিলেন সে সব মুসলমানের জন্য যাদের খৎনা করা হয়েছে। আমি একটি মুসলমানেরও ভোট চাই না।[২২]

বরুণ গান্ধী একজন আধুনিক রাজনীতিবিদ যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, এবং সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে একটি সুসংহত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটব্যাংক গড়ে তুলতে পারেন। একজন রাজনীতিবিদের ভোটব্যাংকের দরকার আছে, যেমন একটি কর্পোরেশনের দরকার একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য বাজার। এবং এ কাজে দু পক্ষেরই গণমাধ্যমের সহযোগিতার দরকার হয়। কর্পোরেশনগুলো সেই সাহায্য ক্রয় করেই নিতে পারে, কিন্তু রাজনীতিবিদদের সেটা অর্জন করে নিতে হয়। কেউ সেটা অর্জন করে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা, আর কেউ-বা সেটা করে অত্যন্ত বিপজ্জনক চমকবাজির দ্বারা। বরুণ গান্ধীর বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণগুলো খুব সহজেই তাকে জাতীয় দৈনিকের শিরোনামে নিয়ে এলো। তার স্বল্পসময়ের কারাবাস (নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে), একটি আদালতের আদেশক্রমে যা কিছুটা সংক্ষেপিত হয়েছিল, হঠাৎ করেই তার মর্যাদাকে একটি শহীদের পর্যায়ে নিয়ে গেল। দলের প্রবীণ নেতারা তার অসহিষ্ণুতার জন্য তাকে মৃদু ভর্ৎসনার মাধ্যমে পবিত্র করে নিচ্ছিলেন (এটা তারা করছিলেন টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে যাতে জনগণ তা দেখতে পায়)। কিন্তু তার স্থূল আচরণ যেন অন্য সব রাজ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে জন্য নরেন্দ্র মোদীর মতোই তিনি এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে, এক নির্বাচনী আসন থেকে অন্য আসনে হেলিকপ্টারে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন– যেন তিনি হচ্ছেন এ নির্বাচনের সবচেয়ে সফল প্রচার-অভিযানকারী।

বরুণ নিজের নির্বাচনী আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এটা হয়তো-বা আপনাকে বিস্মিত করতে পারে– 'জনমত' কি তা হলে সবসময়ই সঠিক? এ সমস্ত নিশ্চিত বিজয় অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চিত পরাজয়ের মাধ্যমে বিজেপি কী শিক্ষাগ্রহণ করছে? অনেকগুলো আসনেই বিজেপি জয় পেয়েছে সেখানে ঘৃণাপূর্ণ ভাষণ ও সে মতো কার্যসাধনের জন্য। এটা কি দুশ্চিন্তাপূর্ণ নয়? এবং এটা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সত্য যে, ভারতের জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেস দলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপি-ই ক্ষমতায় গেছে। নির্দিষ্ট করেই বলা যায়, এক দিন না একদিন এ দলটি আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, তখনও কি জ্বালাও-পোড়াও-পন্থীদের উত্থান নাকি পতন হবে?

যতদূর বলা হলো, সব ধরনের বিভক্তিমূলক রাজনীতির জন্য সব দোষ শুধু বিজেপির ঘাড়ে ফেললে এটা হয়তো-বা একটু অন্যায়ই হয়ে যাবে। এটা পারমাণবিক গবেষণাই হোক, অথবা বাবরি মসজিদের তালা ভাঙ্গাই হোক, কিংবা সম্প্রদায়গত গুজব তৈরি করা, জাতিগত বিদ্বেষ তৈরি করা অথবা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তৈরি করা, কিংবা অবমাননাপূর্ণ আইন তৈরি করা– যা কিছু হোক না কেন, কংগ্রেস সেখানে আগে উপস্থিত হয়। এবং খেলার সময় নিজের কোর্টে এ-জাতীয় বল দখলে রাখতে কংগ্রেস কখনই লজ্জা পেত না। অতীতকালে দুই দলই ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে– যেন তারা বিশেষভাবে রাজনৈতিক সুবিধা পেতে পারে। কখনো কখনো তারা একজন আরেকজনকে অসচেতনভাবে আঘাত করে বসে। গণহত্যার জন্য কখনো তারা একে অন্যকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। এই নির্বাচনেও উভয় দলই খুব তীব্রভাবে তাদের এমন সব দলীয় প্রার্থীদের মাঠ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে– যারা, বিশ্বাস করা হয়, ইতিপূর্বে গণহত্যা ও গণ-অরাজকতাতে যুক্ত ছিল। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এদের কাউকে দোষী বা বিচারের আওতায় আনা হয়নি। জনগণের সামনে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরলেও এ পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে তারা পরস্পরকে রক্ষার ব্যাপারে গোপন সমঝোতা করেই চলেছে এবং প্রকৃতপক্ষে কারো ওপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা হয়নি।

পরিণামে, এই সব গণহত্যা ভারতের বিচার ব্যবস্থায় খুব সহজেই আত্মস্থ করা হয়ে যায় এবং পরবর্তী নির্বাচনী প্রচারণার বিষয় হিসেবে ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত এগুলো খুব বেশি হলে বুদ্বুদ আকারে রয়ে যায়। তুমি বলতে পারো এটা আসলে ভারতের গণতন্ত্রের একটি অংশ মাত্র। বিষয়টি নিবিড়ভাবে দেখা সহজ নয়, যেমন সহজ নয় একটি চলন্ত ট্রেনের জানালা থেকে কোনো কিছু ভালো করে দেখা।

কংগ্রেসের মধ্যে যেভাবে যুক্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের নিত্যনতুন নির্যাস, সেটা পুরাতন প্রজন্মের কংগ্রেসের কর্মপন্থার পরিবর্তন আনতে পারবে কিনা তা দেখার সুযোগ এখনো বাকি রয়েছে।

এ বইয়ের প্রবন্ধগুলো থেকে একটা বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়– ভারতের গণতন্ত্রের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলো– সেটা বিচারব্যবস্থা হোক, পুলিশ হোক কিংবা তথাকথিত 'মুক্ত' সংবাদমাধ্যম হোক এবং অবশ্যই নির্বাচন হোক– এরা পরস্পরের ভেতরে সবসময় ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ থেকে বহু দূরেই রয়েছে। বরং প্রায়শই তারা বিপরীত কাজটিই করে থাকে। এরা একে অন্যকে বরং সমর্থন দিয়ে থাকে যেন তারা বৃহত্তর স্বার্থসংশ্লিষ্ট 'একতা' ও 'উন্নয়নের' পক্ষে কাজ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এমনই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এমনই শোরগোল তৈরি করে যে, এর ভেতরে কোনো সতর্কবাণী উচ্চারিত হলে সেই বাণীও হয়ে পড়ে শোরগোলেই একটি অংশ। এবং এটি বর্হিবিশ্বে ভারতকে খুব বেশি হলে এভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করে যে, এটা একটি সহিষ্ণু, সমৃদ্ধ, বর্ণময় একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে– কিছুটা বিশৃঙ্খল বটে। বিশৃঙ্খলতা সত্য। কিন্তু মতৈক্যটাও তেমনই সত্য।

মতৈক্যের কথা যখন এলো, এখানে একটি ছোট কিন্তু সবসময়ই বিদ্যমান বিষয় হিসেবে কাশ্মীর প্রসঙ্গ রয়েই গেল। যখন কাশ্মীর প্রসঙ্গ আসে তখন মতৈক্য একটাই– সেটা হলো ভারত কঠোরপন্থী একটি দেশ। এবং এটি সব ধরণের প্রতিষ্ঠানের ভেতরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের সংবাদমাধ্যম কিংবা আমলাতন্ত্র কিংবা এর গোয়েন্দাব্যবস্থা এমন কি বলিউডের সিনেমার ভেতরেও এটি বিরাজ করে।

কাশ্মীর উপত্যকায় যুদ্ধ প্রায় বিশ বছর হতে চললো। এ সময়ের ভেতরে এ যুদ্ধ প্রায় ৭০ হাজারেরও বেশি জীবন কেড়ে নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে, কয়েক হাজার মানুষ 'উধাও' হয়ে গেছে। নারীরা ধর্ষিত হয়েছে এবং হাজার হাজার হয়েছে বিধবা। পাঁচ লাখেরও অধিক ভারতীয় সেনা সদস্য কাশ্মীর উপত্যকায় নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়ায়– যার মাধ্যমে এ অঞ্চল হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সেনা-অধ্যুষিত এলাকা। (ইরাক দখলের পর যুক্তরাষ্ট্র যখন সবচেয়ে বেশি সক্রিয় সেন্য নামিয়েছিল, তখনও তা সংখ্যায় ছিল এক লাখ ৬৫ হাজার।) ভারতের সেনাবাহিনী দাবি করে যে, কাশ্মীর থেকে বহুলাংশেই তারা সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে নির্মূল করেছে। সম্ভবত সেটা সত্য। কিন্তু সামরিক আধিপত্যই কি বিজয়ের সমার্থক?

সামরিক দখলদারিত্বের মাধ্যমে একটা সরকার কীভাবে নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে? সুনিশ্চিতভাবে নিয়মিত নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে। কাশ্মীরে

নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘ কাল ধরেই অদ্ভুত ইতিহাস রয়েছে। ১৯৮৭ সালে নগ্নভাবে সম্পন্ন একটি বানোয়াট নির্বাচন আয়োজনের পর ১৯৯০ সালে সেখানে সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার হয়। তখন থেকেই যেকোনোভাবে আয়োজিত এসব নির্বাচন সামরিক জবরদখলের ধারালো অস্ত্র হয়ে উঠেছে। ভারতের জন্য এ রাজ্য হয়েছে সবচেয়ে কূট-কৌশলের ক্ষেত্র। যত গোয়েন্দাসংস্থা আছে, তারা এখানে বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক দল এবং পুতুল রাজনীতিবিদ তৈরি করেছে– যাদেরকে ওদের মর্জিমাফিক ওরাই তৈরি করে, আবার ওরাই ধ্বংস করে। প্রতিটি নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল দাঁড়াবে– এটা এরাই নির্ধারণ করে, অন্য কেউ নয়। প্রতিটি নির্বাচনের শেষেই ভারতের সব প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে যে, কাশ্মীরের জনগণের কাছ থেকে ভারত জনপ্রিয়তার ম্যান্ডেট অর্জন করেছে।

২০০৮-এর গ্রীষ্মে অমরনাথের একটি পবিত্রস্থান পরিচালনাকারী বোর্ডের জন্য একটি বিরোধপূর্ণ ভূমি বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং সেই বিষয় নিয়ে একটি ব্যাপক অহিংস আন্দোলন দানা বাঁধে। দিনের পর দিন হাজার হাজার মানুষ আন্দোলন চালিয়ে যায় সামরিক বাহিনী বা পুলিশকে উপেক্ষা করে। এসব বাহিনী আন্দোলনকারীদের ওপর সরাসরি গুলি চালায়। শত শত মানুষ হত্যা করে রাস্তার ওপর ফেলে রাখে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শহরের প্রতিটি আনাচে কানাচে স্লোগান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'আজাদি! আজাদি!' (মুক্তি! মুক্তি!)। ফলমূল বিক্রেতা তার ফল বিক্রির ওজন পরিমাপের সময়ও বলতে থাকে, 'আজাদি! আজাদি!'। দোকানকার, ডাক্তার, মাঝি, টুরিস্ট গাইড, দর্জি কিংবা কার্পেট বিক্রেতা– যে কেউ, সবসময় প্লাকার্ড বহন করে এবং চিৎকার করে বলে, 'আজাদি! আজাদি!'। এ ধরনের প্রতিবাদ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে।

এ প্রতিবাদ ছিল ব্যাপক। এটা ছিল গণতান্ত্রিক এবং অহিংস প্রতিবাদ। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো এ ধরনের ফাটল ভারতের মূলধারার জনমতের ভেতরে দেখা দেয়।[২৫]

ভারত রাষ্ট্র আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের ব্যাপক গণবিরোধীতার মুখে কীভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করবে– সে বিষয়ে অনিশ্চিত হয়ে ভারত ক্র্যাকডাউন বা শৃঙ্খলামূলক শাস্তির আদেশ দিয়ে বসে। দেখা মাত্র গুলির নির্দেশসহ স্মরণকালের সবচেয়ে কঠোর কারফিউ জারি করা হয়। ফল এতদূর অব্দি গড়ায় যে, সেসব দিনের শেষে তারা লাখ লাখ মানুষকে বন্দী করে। মুক্তিকামী বেশির ভাগ নেতাকে গৃহবন্দী করা হয়, কাউকে কাউকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। গৃহ থেকে গৃহে তল্লাসির মাত্রা এমন চরমে পৌঁছায় যে, আরো শত শত মানুষ গ্রেফতার হয়। শুক্রবারের প্রার্থনার জন্য জামে মসজিদ গুলো সাত সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়– যা

এর আগে কখনো ঘটেনি।

অবশেষে আন্দোলনকে এভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার পর পরই সরকার একটি অস্বাভাবিক কাজ করে বসে। সরকার কাশ্মীরে হঠাৎ করেই নির্বাচন ঘোষণা করে। স্বাধীনতা-পন্থী নেতৃত্ব এ নির্বাচনকে বয়কট করে এবং তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। সকলেই মনে করতো, ভারত সরকার এ নির্বাচনে খুব বাজে ভাবে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হবে। শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হঠাৎ করেই আতঙ্কে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। গোয়েন্দাদের ব্যাপক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং কিছু নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিকদের মাধ্যমে তারা নতুন উদ্দীপনায় এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনো সুযোগই ছেড়ে দেওয়া হয় না (এমন কী, আমাকেও– যার চলমান ঘটনার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র ছিল না– শ্রীনগরে দুই দিনের জন্য গৃহবন্দী করে রাখা হয়।)

নির্বাচন ঘোষণাই ছিল খুব বড় একটা ঝুঁকি। তবে যে জুয়াখেলা তারা শুরু করেছিল, তা থেকে তারা বেশ ভালো ফল লাভ করে। জনগণ দলে দলে ভোট দিতে বের হয়। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর এ নির্বাচনে এ যাবৎকালের সবচেয়ে ভোটারের উপস্থিতি দেখা যায়। কাশ্মীর উপত্যকায় প্রথম ভোটের জন্য সেই সব জেলা বেছে নেওয়া হয়েছিল যে এলাকাগুলি সবচেয়ে বেশি সেনা-অধ্যুষিত। যার ফলে এত বেশি ভোটারের উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় কোনো বিশ্লেষক, সাংবাদিক কিংবা নির্বাচন-বিশেষজ্ঞ এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেননি যে, সেই সব জনগণ মাত্র কিছুদিন আগে জীবনের সব ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করে তাদের স্বাধীনতার কথা বলার জন্য– হঠাৎ করে তারা কেন তাদের মত পরিবর্তন করলো? গণতান্ত্রিক উৎসবের দেশে সবচেয়ে উঁচুদরের বিশেষজ্ঞরা, যাদের অনেকেই ভারতের মূল অংশের নির্বাচন চলার সময় মোটামুটি টেলিভিশন স্টুডিওতেই দিনযাপন করতেন, তারা নির্বাচনের ভষ্যিতদ্বাণী করতেন, ভোটের প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলতেন, এমন কি ভোটের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন নিয়েও আলোচনা করতেন, তারা কেন এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন না যে, এ ধরনের নির্বচনের মানে কী– যেখানে নাকি সারা বছরই বৃহৎ পরিসরে সামরিক বাহিনী মোতায়েন আছে। (সেখানে প্রতি ২০ জন সাধারণ মানুষের জন্য একজন সৈন্য মোতায়েন আছে।) কেউ অনুমানই করলেন না যে, শত শত অপরিচিত নির্বাচন প্রার্থী– যাদেরকে ইতোপূর্বে কখনোই কাশ্মীর উপত্যকায় দেখা যায়নি, তারা এবং যারা হঠাৎ করেই রাজনৈতিক দল গঠন করেছে– এরা কোথা থেকে এলো? কে এদের অর্থের জোগান দিচ্ছে? কেউই এ প্রশ্ন তোলেননি।

কেউই কারফিউ বা ব্যাপক গণগ্রেফতার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেননি। কেউই এ প্রসঙ্গে কথা বলেননি যে, যে সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা প্রার্থী তাদের ভোটের জন্য প্রচার চালাচ্ছেন– তারা কেউই 'আজাদী' বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন না এবং কাশ্মীরের বিদ্রোহ নিয়ে কথা বলছেন না। তারা শুধুমাত্র নির্বাচন নিয়ে কথা বলছিলেন, রাস্তাঘাট-পানি এ জাতীয় নাগরিক ইস্যু নিয়ে কথা বলছিলেন। কেউই এটা আলোচনা করেননি, যুগ যুগ ধরে যেখানে মানুষ দখলদার বাহিনীর অধীনে বসবাস করে আসছে, যেখানে সৈন্যরা যেকোনো সময় যার-তার ঘরে অনুপ্রবেশ করতে পারে, তাদেরকে দিনে অথবা রাতে যেকোনো সময় তাড়িয়ে দিতে পারে– এক্ষেত্রে এমন একজন সত্যিকারের মানুষ দরকার যে তাদের প্রতিটি ঘটনাই জানে এবং সত্যিকার অর্থে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।[২৪]

যে সময় নির্বাচনটি শেষ হয়ে গেলে, ঠিক তখনই ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রধান ধারার সংবাদপত্রগুলো ভারতের পক্ষে জয় ঘোষণা করে দিল। সবচেয়ে দুঃখজনক অবনমন ছিল এটাই যে, কাশ্মীরের সাধারণ জনগণও তোতাপাখির বুলির মতো ভারতের কথাটাই নিজেদেরই কথা হিসেবে বলতে লাগলো। যার ফলে কেউ কেউ নিজেদেরকে তুলনা করছিল, আমরা সেটাই পাই যেটার আমরা উপযুক্ত। বেশ ক'জন কাশ্মীরি আমাকে বলেছিল, 'কখনোই একজন কাশ্মীরিকে বিশ্বাস কোরো না। আমরা খুব বেশি হুজুগে মাতাল।' মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কৌশল কাশ্মীরের জনগণের বিরুদ্ধে ভারতের অফিসিয়াল পলিসি হিসেবে বরাবরই বেশ কার্যকর ফল দিয়েছে। দশকের পর দশক এর প্রয়োগের ফলে মানুষের আত্মসম্মানবোধ ধ্বংস করে ফেলা সম্ভবত এ দখলদারিত্বের সবচেয়ে খারাপ দিক।

তবে নির্বাচন শেষ হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহের ভেতরেই ঘটনা আবার পূর্বের আকার ধারণ করলো। বিরোধীরা পুনরায় আজাদীর দাবি তুললো এবং নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হত্যাযজ্ঞ পুনরায় শুরু হয়ে গেল। সংবাদপত্রগুলোতে প্রতিবেদন আসতো যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বিষয়গুলো কাউকে অবাক করে দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে যে, নির্বাচন আর গণতন্ত্রের ভেতরে আসলেই কোনো যোগসূত্র এখানে আছে কিনা।

সমস্যা হচ্ছে, কাশ্মীর এমন একটি অবস্থানে অবস্থিত যেটা হচ্ছে অস্ত্রসম্ভারের একটি ফল্ট লাইন, যে অঞ্চলটি ক্রমে বিশৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যেটা পুরোপুরিই পরিষ্কার, অথচ যার বাহ্যিক দিক যথেষ্ট অস্পষ্ট। সেই স্পৃহা একটি ঘূর্ণিচক্রের মধ্যে পড়ে গেছে। ঘূর্ণিচক্রটি বেশ কিছু পরস্পরবিরোধী আদর্শ ও বিপদের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। এর একটি হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (যার ভেতরে আছে কর্পোরেট জাতীয়তাবাদ

সুশিক্ষা [illegible] জাতীয় গণগ্রন্থাগার
[illegible]

এবং হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদ– যেটা অবেশেষে একটি সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণ করে)। এছাড়াও আছে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ (নিজস্ব স্ববিরোধীতার কারণেই এটি ভেঙে পড়ছে), মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (এর যে বিশাল অর্থনীতি আছে– তার দ্বারা যেটা প্রায়ই অস্থির হয়ে পড়ে) এবং মধ্যযুগীয় ইসলামপন্থী তালিবানদের পুনরুত্থান (এদের উন্মাদের মতো নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও খুব দ্রুততার সঙ্গেই এরা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে। তার কারণ হলো, এদের দেখে মনে হয় এরাই একমাত্র অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার)। এর প্রতিটি আদর্শই সেই ধরনের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে খাপ খায়, যেটি হতে পারে গণহত্যা থেকে শুরু করে পারমাণবিক যুদ্ধ। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে চীনের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ। আরো আছে, কাস্পিয়ান অঞ্চলের বিপুল প্রকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার-এর জন্য আগ্রাসী ভূমিকায় পুনরাবির্ভূত হওয়া রাশিয়া; অথবা অহরহ আওড়াতে থাকা গুজব যে, কাশ্মীর এবং লাদাখ অঞ্চলে রয়েছে গ্যাস, তেল এবং ইউরেনিয়ামের খনি। একটি স্নায়ুযুদ্ধ পাকানোর জন্য এটিই কি যথেষ্ট ভালো রেসিপি নয়? (স্নায়ুযুদ্ধ কারো জন্য আতঙ্কের হলেও কারো কারো জন্য তা আকাঙ্খিত বটে)।

এই সব ডামাডোলের মধ্যে কাশ্মীর হয়ে উঠেছে খুব সুন্দর একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে চলমান অরাজকতা ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে। কেননা, তরুণ ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছে ১৫ কোটি মুসলমান– যাদেরকে প্রায়ই নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়, অপদস্ত হতে হয়, এবং যারা প্রতিনিয়তই একঘরে হয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে যে রাগ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, সেই রাগের মধ্যেই নিজের গ্রহণযোগ্য অবস্থান খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে চলমান অরাজকতার বীজ। ২০০৮ সালের মুম্বাই আক্রমণ ও বিভিন্ন ধরনের বোমা হামলার মাধ্যমে এ ধরনের একটি আভাস ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

এখানে কোনো সন্দেহ যে, কাশ্মীর সমস্যা পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কিছু সমস্যার একটি। প্যালেস্তাইনের মতোই এটি বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে দুর্দমনীয় একটি বিরোধপূর্ণ অঞ্চল। এর মানে এই নয় যে, এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা এই যে, সমাধানটা কোনো একটি পক্ষকে, একটি দল বা একটি দেশ বা কোনো একটি মতাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। যারা দর কাষাকাষিতে নিয়োজিত থাকবে তাদের এই মানসিক প্রস্তুতি রাখা দরকার যে, তারা যেন সবাই নিজেদের অবস্থান থেকে কিছুটা হলেও ছাড় দেয়। আমরা অবশ্য এখন পর্যন্ত সেই পর্যায়ে যাইনি যে, ভারত সরকার স্বীকার করবে এখানে আদৌ কোনো সমস্যা আছে, সমাধান করা তো অনেক দূরের কথা। এই মুহূর্তে

এরকমটি করার কোনো কারণও নেই। আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের স্টক মার্কেটের মূল্যসূচক বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের প্রতিবেশী কিছু রাষ্ট্র যখন গৃহযুদ্ধ-বিগ্রহ ধ্বংস রক্তপাত, উদ্বাস্তু শিবির অথবা সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে ব্যস্ত, ভারত সেখানে একটি সুন্দর নির্বাচন শেষ করলো।

যাই হোক, অপদেবতাদের ছলচাতুরি সবসময় সব মানুষকে বোকা বানাতে পারে না। বন্দুকের নলের মাধ্যমে কাশ্মীর আন্দোলনের যে সাময়িক সমাধান (ব্যাঙ্গের জন্য দুঃখিত) ভারত করেছে সেটাই বরং এ সমস্যার গভীরতাকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছে: যা এতো গভীরে চলে যাচ্ছে যে, ভূগর্ভস্থ পানিকেও দূষিত করে ফেলছে।

সম্ভবত সিয়াচেন হিমবাহের যে গল্প, যেটা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র, সেটা হতে পারে আমাদের উন্মাদনার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। ভারত এবং পাকিস্তানের হাজার হাজার সৈন্য নিয়োজিত রয়েছে এ অঞ্চলে– যাদেরকে সহ্য করতে হয় অত্যন্ত শীতল বাতাস এবং তীব্র ঠাণ্ডা, যা কখনো কখনো হিমাঙ্কের নিচে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চলে যায়। শত শত মানুষ যারা এখানে মারা গেছে, তাদের অনেকের মৃত্যু হয়েছে শুধুমাত্র ঠাণ্ডার কারণে। হিমশৈলটি হয়ে উঠেছে পরিত্যক্ত পদার্থের ভাগাড়ে– যা প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে উঠছে যুদ্ধের বর্জ্যপদার্থে। কামানের হাজার হাজার পরিত্যক্ত খোসা, খালি তেলের ড্রাম, বরফ-কাটার কুঠার, পুরাতন বুট, বাতিল তাবু অথবা এ ধরনের অনেক কিছুই– যা লাখ লাখ যুদ্ধরত সৈন্যের পরিত্যাক্ত জিনিসের বর্জ্যগুলো রয়ে যাচ্ছে যেমন ছিল তেমন আকারে। এগুলো খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে এ ধরনের তুষারাবৃত পরিবেশে– যেটা হয়ে উঠছে মানুষের নির্বুদ্ধিতার খুব অসাধারণ একটি ভাস্কর্য। একদিকে যখন ভারত এবং পাকিস্তান সরকার হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করে যাচ্ছে এরকম উঁচু স্থানে যুদ্ধ করার রসদ, প্রযুক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে, সেই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রটি নিজেই গলে যেতে শুরু করেছে। বর্তমানে এটি গলতে গলতে এর মূল আকৃতির প্রায় অর্ধেক আয়তনে চলে এসেছে। এই গলন সেখানে অবস্থানরত সৈনিকদের জন্য যতটা মাথাব্যথার কারণ তার চেয়েও অনেক বেশি মাথাব্যথার কারণ হতে পারে বিশ্বের অন্যপ্রান্তে থাকা মানুষদের জন্য– যারা উন্নতমানের জীবনযাপন করছে। তারা, যারা ভালো লোক, যারা শান্তি প্রত্যাশী, যারা মুক্তকণ্ঠের এবং যারা মানুষের অধিকারের কথা বলে– বসবাস করে সেই সমস্ত সতেজ সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে যাদের সরকার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আসনগুলোতে বসে থাকে। অথবা যাদের অর্থনীতি খুব গভীরভাবে নির্ভর করে এই সব যুদ্ধ ও যুদ্ধের অস্ত্র রপ্তানি করার ওপরে। এসব যুদ্ধাস্ত্র তারা ভারত ও পাকিস্তানের (এবং রুয়ান্ডা,

সুদান, সোমালিয়া, কঙ্গো, ইরাক, আফগানিস্তান... তালিকাটি সুদীর্ঘ) মতো দেশগুলোতে রপ্তানি করে। এই হিমশৈলের গলন আমাদের এই উপমহাদেশেই তীব্র বন্যার জন্ম দিতে পারে। এবং এর পর পরই ব্যাপক খরা দেখা দিতে পারে– যেটা হয়তো এখানকার কোটি কোটি মানুষের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।"

এটা হয়তো আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করার আরো বেশি বেশি কারণ জোগাবে। এবং তাতে করে আমাদের প্রয়োজন হবে আরো বেশি অস্ত্রের। কে জানে, এ ধরনের ভোক্তা-আস্থা আমাদের এ বিশ্বের জন্য বর্তমান খুব দরকার যাতে বর্তমান যে বিশ্বমন্দা চলছে সেটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। এবং তারপর সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের দেশগুলোর মানুষেরা আরো উন্নত জীবনযাপন করতে পারবে আর আমাদের হিমবাহগুলো গলতে থাকবে দ্রুতগতিতে।

তুরস্কের ইস্তাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে উপচে পড়া দর্শক-শ্রোতার সামনে আমি যখন উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার এই 'লিসেনিং টু গ্রাসহুপারস' বইটা পড়ছিলাম (উৎকণ্ঠিত ছিলাম, কারণ কিছু শব্দ, যেমন– একতা, উন্নয়ন, গণহত্যা, আর্মেনিয়ান ইত্যাদি তুরস্কের কর্তৃপক্ষকে– যারা মিলনায়তনের আশেপাশেই ছিল– উত্তেজিত করতে পারতো), একেবারে সামনে সারিতে আমি দেখতে পেয়েছিলাম রাকেল ডিংক নামের একজনকে– যিনি ছিলেন হ্র্যান্ট ডিংকের বিধবা স্ত্রী– পুরো বইটি পড়ার সময় যিনি টানা কেঁদে যাচ্ছিলেন। বইটা পড়া শেষ করা মাত্র তিনি আমাকে এসে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, 'আমরা আশা ছাড়বো না। কিন্তু আমরা কেন আশা জিইয়ে রাখবো?'

তিনি বলেছিলেন, 'আমরা'। শুধু 'তুমি' বা 'তোমরা' নয়।

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কথায় একটি গান, যা একসময় আবিদা পারভীন খুব আবেগের সঙ্গে গেয়েছিলেন, ইংরেজিতে আমি অনুবাদের চেষ্টা করছি। (এখানে তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো) :

স্বপ্ন যদি যায়ও টুটে, আকাঙ্খা যাবে না ছেড়ে
মিলনও যদি রয় দূরে, প্রত্যাশী রব চিরতরে।

তুমি কি বুঝতে পারলে ইতিপূর্বে কাব্য বলতে আমি কী বুঝিয়েছিলাম?

গণতন্ত্র
আমাদের ঘরোয়া জীবনে
কী তার অর্থ?

এ প্রবন্ধ ২০০২ সালের ৬ মে ভারতের আউটলুক ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশ হয়।

গতরাতে ভাদোদারা থেকে আমার এক বন্ধু ফোন করেছিল। কথার শুরুতেই সে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। ঘটনার সারাংশ বলতে তার পনেরো মিনিটের বেশি সময় লেগে যায়। ব্যাপারটা খুব ঘোরালো কিছু নয়। সাঈদা নামে তার এক বন্ধু কিছু উগ্র ধর্মান্ধের হাতে ধরা পড়েছিল, মৃত্যুর আগে তার পেট চিরে গর্ভস্থ সন্তানকে বের করে সেই স্থানে জ্বলন্ত কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছিল, এবং এদের মধ্যে কোনো এক অতি উৎসাহী ধর্মান্ধ মেয়েটির মৃত্যুর পর কপাল কেটে 'ওম্' লিখে দিয়েছিল।[১]

হিন্দুধর্মশাস্ত্রের কোথায় সংযত কিংবা যথাযথভাবে এমন ভয়ানক কাণ্ডের বৈধ সমর্থন মেলে?

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এ বর্বর ঘটনার সর্মথনে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেসে মুসলিম 'সন্ত্রাসী'রা ৫৮ জন জীবন্ত হিন্দুযাত্রীকে পুড়িয়ে মারায় প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে গুজরাটে এসব ঘটনা ঘটেছে।[২]

অমন বিভীষিকা হত্যাযজ্ঞে মৃত সকলেই কারো না কারো ভাই, মা কিংবা শিশু। এমন নারকীয়তার সমর্থনে কুর'আনে কোন বিশেষ আয়াত রয়েছে যেখানে এভাবে ঝলসিয়ে মেরে ফেলার কথা বলা আছে?

নিজ নিজ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে যতই এরা নিজেদের পৃথক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছে ততই এরা বুঝিয়ে দিচ্ছে, মানুষ হত্যার ব্যাপারে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ভেতরে ব্যবধান খুব সামান্যই। এক্ষেত্রে তারা একই বেদী থেকে একই নৃশংসতার পূজারি। তারা উভয়েই একই খুনি ঈশ্বরের ধর্ম-দূত, সে ঈশ্বর যে-ই হোন। সকলের জন্য এ পরিবেশ এতোটাই দূষিত হয়ে গেছে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর জন্য। যেখান থেকে এ দুষ্টচক্র শুরু হয়েছে, কোনো দিকে না তাকিয়ে তাঁর উচিত সেখান থেকেই সঠিক বিধান জারি করা।

এ এমন এক গণতন্ত্র, ধর্মীয় উগ্রবাদের সঙ্গে যার গাঁটছড়া বাঁধায় ফাটল ধরেছে এর সারা অবয়বে; এবং সেই ফাটল থেকে চুইয়ে পড়ছে নিখাদ বিষ। আমরা এখন নিত্যদিন সে বিষ পান করছি। মরছি, কিংবা ধুকে ধুকে বেঁচে আছি।

এ ছাড়া আমাদের আর কি করার আছে? কি-ই বা করতে পারি আমরা?

আমাদের একটি শাসিত-দল আছে– যার ভেতরে এখন এক ধরনের রক্তক্ষরণ ঘটছে। সন্ত্রাস প্রতিহত আইন (পোটা) পাশ করার মধ্য দিয়ে এবং পাক-ভারত সীমান্তে বন্দুকের নল উচিয়ে লাখ লাখ সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর ভেতরে আমাদের সকলের জন্য গভীর বিপদ লুকিয়ে আছে। সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাস বিকৃত করে যে নির্লজ্জ নোংরা কাজ আমরা করে চলেছি– নির্বাচনের পর নির্বাচন আসবে, আমাদের এ লজ্জা দূর করতে পারবে না কোনো কিছুই।[৩]

এমন-কী অযোধ্যায় রাম মন্দিরের পরিবর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পুনর্নির্মাণও আমাদের এসব কলঙ্ক মুছে দিতে পারবে না পুরোপুরি। ভয়ানকভাবে ধিকৃত এসব কাজ নিবারণ করার দায় এখন গুজারটের ওপর বর্তেছে।

গুজরাট ভারতের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার গঠন করার পর বেশ কিছু বছর ধরে উগ্র হিন্দুত্বের নিশান উড়াচ্ছে। প্রকট ডান-পন্থী ধর্মান্ধ জাতীয়তাবাদের বীজতলা হিসেবে গুজরাট এখন এসব পরীক্ষানিরীক্ষার বিশেষ সূতিকাগার। ২০০২ সালের মার্চে এ দেশের জণগণ দেখতে পেয়েছে সেই বিষবৃক্ষের ভয়াল ফলের রূপ।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতরে গোধরাতে খুব নিপূণ পরিকল্পনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালানো হয়। সামনে দাঁড়িয়ে এ দাঙ্গার নেতৃত্ব দেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' (ভিএইচপি) ও বজরং দল। সরকারী হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা আট শো, নিরপেক্ষ প্রতিবেদনে এর সংখ্যা দুই হাজারের ওপরে।[৪]

কমপক্ষে দেড় লাখ মানুষ গৃহহারা হয়েছে, উদ্বাস্তু শিবিরে তারা এখন আশ্রয় নিয়েছে। মেয়েরা অপহৃত হয়েছে, গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। সন্তানের সামনে মা-বাবাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। দুই শো ৪০টি মাজার, এক শো ৮০টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। যেমন আহমেদাবাদেই (গুজরাটের রাজধানী) আধুনিক উর্দু কবিতার জনক ওয়ালি গুজরাটির সমাধিতে সারা রাত ধরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ ফায়াজ আলী খানের সমাধিতে জ্বলন্ত টায়ারের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। দাঙ্গাবাজরা মুসলমানদের অসংখ্য দোকান, বাড়ি, হোটেল, টেক্সটাইল মিল ও যানবাহনে লুটতরাজ শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়। হাজার দশেক মুসলিম তাদের চাকরি হারায়।[৫]

দাঙ্গাবাজদের একটি জটলা কংগ্রেস দলের সাবেক সংসদ সদস্য এহসান জাফরির বাড়ি ঘিরে ফেলে। তিনি আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে পুলিশের মহাপরিচালক, পুলিশ কমিশনার, প্রধান সচিব, উপ-প্রধান সচিব (স্বরাষ্ট্র)-কে

টেলিফোন করেন। কিন্তু তারা সবাই তাঁর এ ফোন উপেক্ষা করেন। ভ্রাম্যমাণ পুলিশ ভ্যান তার বাড়ির চারদিকে অবস্থান নিলেও দাঙ্গাবাজদের জটলা ছত্রভঙ্গ করার কোনো উদ্যোগ নেয় নি। এরপর দাঙ্গাবাজরা এহসান জাফরিকে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে আনে; তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে।[৬]

এ ঘটনার মাস খানেক আগে (ফেব্রুয়ারির রাজকোট অ্যাসেমব্লীর) উপনির্বাচনে নির্বাচনী-প্রচারণায় জাফরি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন কাজের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। জাফরির মৃত্যুর সঙ্গে এ ঘটনা 'নিশ্চয়ই' একটি কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। আসলেই কি তাই?

সারা গুজরাটে হাজার হাজার দাঙ্গাবাজ পেট্রোল বোমা, বন্দুক, চাকু, তলোয়ার ও ত্রিশূল নিয়ে নিজেদের ছোট ছোট জটলায় ভাগ করে তাণ্ডবলীলা চালাতো।[৭]

এসব দাঙ্গা-লুটপাটে ভিএইচপি ও বজরং দল ছাড়াও নিম্নশ্রেণীর দলিত এবং আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছিল।[৮] এমন কী মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এসব লুটতরাজে অংশ নিয়েছিল।[৯] মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। দাঙ্গাবাজ নেতাদের হাতে থাকতো মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, দোকান, বাড়িঘর, এমন কি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা। এসব তালিকা কম্পিউটারে নিখুঁতভাবে সাজানো হতো। হাজার হাজার গ্যাস-সিলিন্ডার তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে জমিয়ে রাখছিল। তারপর এসব সিলিন্ডার দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল বিভিন্ন মুসলিম মালিকানাধীন বাণিজ্যিক-স্থাপনা। এসব ঘটনায় পুলিশ শুধু চোখ বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিরাপদে যাতে দাঙ্গাবাজরা এসব ধ্বংসযজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারে, পুলিশ প্রশাসন তার ব্যবস্থা নিতে যথেষ্ট তৎপর থাকতো।[১০]

গুজরাট যখন জ্বলছে তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এমটিভিতে তার নতুন কবিতার গুণকীর্তণ প্রচার করছিলেন।[১১]

(একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, তাঁর এ কবিতার ক্যাসেট কয়েক লাখ কপি বিক্রি হয়েছিল।) এত বিশাল হত্যাযজ্ঞের পরও একজন প্রধানমন্ত্রীর গুজরাট সফরে যেতে এক মাসের বেশি ও দু দুটো অবকাশ যাপনের সূচী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। যাও-বা তিনি গেলেন, মোদীর ছায়ায় তার সব প্রভাবই ঢাকা পড়ে গেল। শাহ্ আলম রিফিউজি ক্যাম্পে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।[১২]

তাঁর ঠোঁট নাড়াচাড়া করছিল, কণ্ঠ থেকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি তিনি। কিন্তু তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বের হয়নি কোনো আন্তরিক সুর। যেটুকু বেরোয় তা যেন পোড়া, রক্তাক্ত, খণ্ড-বিখণ্ড জগতের ভেতর দিয়ে শিস কেটে ব্যঙ্গ করতে থাকে।[১৩]

ক'দিন পরেই সিঙ্গাপুরে মনোহর ব্যবসায়িক চুক্তিতে এসে গল্‌ফের মাঠে ছোট্ট গাড়িতে করে তাঁর হেলে দুলে বেড়ানোর কথা জানতে পারি আমরা।[১৪]

খুনিরা এরপরও গুজরাটের রাস্তা দিয়ে নীরবে টহল দিয়ে বেড়াতো। কয়েক সপ্তাহের জন্য মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের হত্যা-কর্তা-বিধাতা হয়ে উঠেছিল এসব দাঙ্গাবাজ। কে কোথায় বসবাস করবে, কে কী কথা বলতে পারবে কিংবা পারবে না, কে কার সঙ্গে কোথায় কখন দেখা করতে পারবে– এসব কিছুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক ছিল এসব খুনি-বাহিনী। ধর্মীয় ইস্যু থেকে প্রসারিত হয়ে এ-জাতীয় পরওয়ানা ব্যাপ্তি লাভ করে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতেও; যেমন– সম্পদসহ জলের উৎস মীমাংসার দিকেও (যে কারণে নর্মদা বাঁচাও অন্দোলনের মেধা পটকারকে আক্রমণের শিকার হতে হয়)।[১৫]

মুসলিমদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকে, রেস্তোঁরাতে মুসলিমদের দিয়ে খাবার পরিবেশনের কাজ বন্ধ করা হয়, মুসলিম শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয় না। পরীক্ষায় বসতে মুসলিম ছাত্ররা আতঙ্কিত বোধ করে।[১৬]

মুসলিম বাবা-মা তাদের শিশু সন্তানদের ভাল মতো শিখিয়ে রাখে, জনসাধারণের ভেতরে বাচ্চারা যেন তাদের মা-বাবাকে 'আম্মি' কিংবা 'আব্বা' না ডেকে ওঠে। তারপরও মুসলিম বাবা-মা সবসময় আতঙ্কে থাকেন, অবুঝ বাচ্চারা জনসম্মুখে কখন হঠাৎ আব্বা কিংবা আম্মি ডেকে তাঁদের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করে দেয়, যা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে।

নোটিশে জানানো হয়: এসব কেবল সূচনার দৃশ্য মাত্র।

এই কি সেই হিন্দু রাষ্ট্র, জাতি– যে নীতির দিকে সবাইকে আমরা আহ্বান করছি? মুসলিমদের যখন তাদের জন্য নির্ধারিত 'গন্তব্যস্থল' দেখিয়ে দেওয়া হবে, তখন কি গুজরাটে দুধ ও কোকাকোলার বন্যা বয়ে যাবে? যেদিন রামমন্দির নির্মাণ করা হবে সেদিন থেকে কি প্রতিটি মানুষের শরীরে একটি জামা কিংবা পেটে প্রতিদিন একটি রুটির সংস্থান হবে?[১৭]

প্রতিটি মানুষের চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু কি মুছে যাবে? আমরা কি আগামী বছর এ ঘটনা বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন আশা করতে পারি? কিংবা এসব ঘটনাকে ঘৃণা করার মতো কেউ কি তখন থাকবে অবশিষ্ট– তারা যেমন: বর্ণানুক্রমে– আদিবাসী, খ্রিস্টান, দলিত, পার্শি, বৌদ্ধ, শিখ? সেসব মানুষ, যারা জিন্স পরে কিংবা ইংরেজিতে কথা বলে, কিংবা পুরু ঠোঁট ও কোঁকড়ানো চুল যাদের? মনে হয় না আমাদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে। এসব অবস্থা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত এ ধর্মীয় উগ্রপন্থা এভাবে কী এগিয়েই যেতে থাকবে?

মানুষের শিরোচ্ছেদের ঘটনা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে এদের হাতে? ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে সাধারণ মানুষের দেহ? তারপর শুধুমাত্র ধর্মীয় জিঘাংসায় ঘৃণাভরে মূত্র ত্যাগ করা হবে সেসব নির্দোষ দেহের ওপর? মায়ের গর্ভাশয়ে বেড়ে ওঠা ভ্রূণকে পেট চিরে হত্যা করার যজ্ঞ কি চলতেই থাকবে এমনিভাবে?[১৮]

সব ধরনের সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তির মধ্যে সীমাহীন সৌন্দর্যের যে ফল্গুধারা রয়েছে, তাকে বাদ দিয়ে কী ধরনের কুৎসিত অভিকল্প এ ভারতের জন্য কল্পনা করা হচ্ছে? ভারত কি ক্রমশ গোরস্তান এবং শ্মশানপুরীতে পরিণত হবে?

গত কয়েক সপ্তাহে গুজরাটে যারা মারা গেছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য রাষ্ট্রের তরফ থেকে শোক প্রকাশ করা উচিত। কে মরছে এবং কীভাবে মরছে, সেটা এক্ষেত্রে কোনো বিবেচনার দাবি রাখে না। অথচ সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে শত শত নৃশংস অক্ষর ছাপা হয় গুজরাটের এসব হত্যা-লুণ্ঠনযজ্ঞের পক্ষে। এসব সংবাদপত্র প্রশ্ন তোলে– গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের 'তথাকথিত-ধর্মনিরপেক্ষ'বাদীরা নিন্দা না করে একপাক্ষিকভাবে গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে কেন নিন্দা করা হয়?

সংবাদপত্রের এসব মানুষেরা কি বুঝতে পারে না, এ দুটো ঘটনার ভেতরে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে? গুজরাটের হত্যা-লুণ্ঠন-নৈরাজ্যের ভেতরে রয়েছে এক পরিকল্পিত সঙ্ঘবদ্ধ কালোছায়া। অন্যদিকে গোধরা-হত্যাকাণ্ডের জন্য কারা দায়ী তার প্রকৃত কারণ এখনো অজানা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আদভানি এক বিবৃতিতে এ আগুন দিয়ে ট্রেন পুড়িয়ে হত্যাকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানি ইন্টার সার্ভিস ইন্টলিজেন্স (আইএসআই)-এর চক্রান্তকে দায়ী করেছেন।[১৯]

কয়েক মাস পার হয়ে গেলেও পুলিশ এ অভিযোগের সপক্ষে এক টুকরো প্রমাণও হাজির করতে পারেনি। গুজরাট সরকারের ফরেনসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগুন ধরাতে সবরমতী ট্রেনের কামরার ভেতরে অবস্থানকারী কেউ একজন ষাট লিটার পেট্রোল ঢেলে দেয়। কামরার সব দরজা, সম্ভবত ভেতর থেকেই, আটকানো ছিল। যাত্রীদের পোড়া-মৃতদেহগুলি কামরার মাঝখানে স্তূপাকারে ছিল। আগুনের সূত্রপাত ঘটানোর খলনায়কের কথা প্রকৃতপক্ষে কারোরই জানা নেই।

ঘটনাটির ওপর প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই রয়েছে নিজস্ব স্বার্থানুকূল বিশ্লেষণ। কারো মতে, এটি একটি পাকিস্তানি চক্রান্ত; অথবা এটা মুসলিম চরমপন্থীদের কাণ্ড–যারা বিশেষ ব্যবস্থায় ট্রেনের ভেতর অবস্থান নিয়েছিল। কিংবা অন্যদের মতে, এটা ভিএইচপি/বজরং দলের চক্রান্ত–যারা বিভীষিকা সৃষ্টি করে বিশেষ ফায়দা লুঠতে চায়। প্রকৃত কারণ আসলে কেউই জানে না।[২০]

এ কাজ যারাই করে থাকুক, তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ যাই হোক না কেন–তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক ভয়ানক অপরাধ। কিন্তু প্রতিটি নিরপেক্ষ প্রতিবেদন বলছে, গুজরাটের মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিত সঙ্ঘবদ্ধ হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল গোধরা কাণ্ডের স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায়, রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন ছত্রছায়ায়।[২১]

যেহেতু রাষ্ট্র তার জনগণের নামে যে কোনো কাজ করে থাকে, সেহেতু রাষ্ট্রের এ দুষ্কর্মের ভাগীদার আমরা প্রত্যেকেই।

গুজরাটের দাঙ্গার পর ব্যাঙ্গালুরুতে বিজেপির নীতিনির্ধারণমূলক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' (আরএসএস)-এর একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিজেপি থেকে নির্বাচিত আমাদের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীসহ সকল সদস্য মুসলিম সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কাছে 'সুনাম ও আস্থা' অর্জন করার আহ্বান জানান।[২২]

গোয়াতে বিজেপির জাতীয় নেতাদের সভায় নরেন্দ্র মোদী 'নায়ক' অভিধায় সম্ভাষিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তার ইস্তফা দেওয়ার চতুর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল হয়ে যায়।[২৩]

সাম্প্রতিক কালের একটি জনসভার বক্তব্যে গুজরাটের গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাকে তুলনা করা হয় মহাত্মা গান্ধীর ড্যান্ডি পদযাত্রার সঙ্গে, যার উভয়টিই–তার মতে–মুক্তির জন্য সংগ্রামের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

সমসাময়িক ভারত ও জার্মানির বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার সঙ্গে এই সাদৃশ্য যথেষ্ট আতঙ্কজনক হলেও বিস্ময়কর নয়। (আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতারা তাদের লেখনিতে হিটলার ও তার দমন-পদ্ধতির ভূয়শী প্রশংসা করে থাকে।[২৪] একটাই শুধু পার্থক্য রয়েছে, আমাদের ভারতে একক কোনো হিটলার নেই। তার পরিবর্তে আছে সতত ভ্রাম্যমাণ এক বহুমুখি চিড়িয়া। এক গতিশীল সমবেত ঐকতান প্রক্রিয়া। বহু বাহু ও মাথা বিশিষ্ট 'সঙ্ঘ পরিবার'–যাকে হিন্দু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর একটি যৌথ পরিবার বলা যেতে পারে। যে পরিবারে রয়েছে বিজেপি, আরএসএস, ভিএইচপি এব বজরং দল। তাদের প্রত্যেকে যার যার নিজস্ব খেলাটা খেলছেন। এটা প্রকৃতই তাদের একটি অসাধারণ যোগ্যতা যে, আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় তারা যেন যেকোনো কিছুই যেকোনো সময় যেকোনো মানুষ দিয়ে খেলিয়ে নিতে সক্ষম।

প্রতিটি বিশেষ ঘটনার জন্য এ পরিবারের রয়েছে একজন যথার্থ মাথা। প্রতিক্ষণের জন্য রয়েছেন মুখে মধু নিয়ে বুড়ো কবি অটল বিহারী বাজপেয়ী, যিনি যে কোনো ঋতুতেই আদি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিতে পারেন। উচ্ছৃঙ্খল

সমর্থকগোষ্ঠীকে উসকে দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল. কে. আদভানি। রয়েছেন মধুময় কূটকৌশলী যশবন্ত সিং, যিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে। টেলিভিশন-বিতর্ক সামলাতে রয়েছেন সাবলীল ইংরেজি-বাকপটু আইনজীবী অরুণ জেটলি; এবং রয়েছেন শীতলরক্ত-প্রজাতির গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরো আছে বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং এদের তৃণমূল স্তরের কর্মী–যারা গণহত্যায় স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করে। সবশেষে, এই যে বহু মাথাবিশিষ্ট একটি চিড়িয়া, টিকটিকির মতো এরও একটি লেজ রয়েছে যেটি বিপদে পড়লে খসে যায়, আর সুবিধা মতো সময়ে আবার গজিয়ে ওঠে। এটি হচ্ছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ, যিনি তথাকথিত সমাজতন্ত্রীর সুন্দর লেবাস ধরে থাকেন; সঠিক ভাষ্য তৈরি করার ব্যাপারে সঙ্ঘ পরিবার যার ওপর বিশ্বাস রাখে গভীরভাবে।

সঙ্ঘ পরিবারের এসব জ্ঞানী রাজনীতিকরা এত বেশি কথা বলে যেন একটি ত্রিশূলের পূর্ণাঙ্গ বহুমুখিতাই প্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিভিন্ন জনের বক্তব্য অন্যজন থেকে যুগপৎ স্ববিরোধীপূর্ণ হয়ে যায়। যখন এ পরিবারের একটি অংশের প্রধান (ভিএইচপি) তাদের কর্মীদের 'চূড়ান্ত' সমাধানের জন্য লাখ লাখ কর্মীকে প্রস্তুতি নেওয়ার উপদেশ দেয়, তখন জাতিকে নিশ্চিত করতে এর নামমাত্র প্রধান (প্রধানমন্ত্রী) ধর্মমত নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখার কথা বলে। অথচ এরাই বিবিধ বই ও চলচ্চিত্র বাজেয়াপ্ত করাসহ নানান চিত্রকর্ম পুড়িয়ে ফেলে 'ভারতীয় সংস্কৃতি অবমাননা'র দোহাই দিয়ে। অন্যদিকে এরাই বিদেশি কোম্পানি 'এনরোন'-এর কাছে লাভ হিসেবে বন্ধক রাখে বিপুল সম্পদ–যা সমগ্র দেশের গ্রামীণ জনপদ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৬০ শতাংশের সমান।*

এর নিজের মধ্যে সে ধারণ করে রাজনৈতিক মতবাদের এক বিশাল ব্যাপ্তি যাতে জনগণের কাছে মনে হয়, যুদ্ধ করছে যেন দুটি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দল। যদিও বাস্তবে সেটা পারিবারিক মতানৈক্য মাত্র। যতই তিক্ততাপূর্ণ কথাকাটাকাটি হোক না কেন, সে সব বাকবিতণ্ডা হয় জনসম্মুখে। শেষ পর্যন্ত সবসময়ই সেটার সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধান হয়। আর, এর দর্শকরা সবসময়ই সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি যায় যে, যাক, টাকা দিয়ে বেশ উপযুক্ত একটা অনুষ্ঠানই দেখলাম। এতে রয়েছে ক্রোধ, অ্যাকশন, প্রতিশোধ, জটিলতা অথবা তিক্ততা। এর মধ্যে রয়েছে কাব্য আর প্রচুর পরিমাণে জমাটবাঁধা রক্ত। এটা হচ্ছে, পুরো মাত্রায় আধিপত্যবাদের একটি স্বদেশীয় সংস্করণ।

কিন্তু ওপরের খোলসটি যদি খুলে ফেলা হয়, সত্যিকারের সব খোলসই যদি খুলে ফেলা হয়; যদি অশান্ত মস্তিষ্ক একটু হলেও স্থিত হয় তবে এটা প্রতিভাত হয়

যে, এই সব খোলসের নিচে এবং এই সব গোলযোগ আর বাগাড়ম্বরের নেপথ্যে স্পন্দিত হচ্ছে একই হৃদয় অর্থাৎ একই মতাদর্শের লোক। এবং সেখানে রয়েছে এক অবিচল আত্মা যারা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে রক্তরঞ্জিত একই সুড়ঙ্গের ভেতরে দিয়ে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে এর আগেও সবধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সেগুলো কখনো সংঘটিত হতো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের বা গোত্রের বা আদিবাসীদের ওপর। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর পরই কংগ্রেস দল দিল্লির রাজপথে তিন হাজারেরও বেশি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যায় নেতৃত্ব দেয়। এর প্রতিটি মুহূর্তও ছিলো গুজরাটের মতোই একই রকম দুদর্শা ও ভয়াবহতাপূর্ণ।[১৬]

ওই সময় রাজীব গান্ধী, যিনি কখনোই বিশেষ উক্তির জন্য খ্যাত ছিলেন না, বললেন, 'যখন একটি মহা মহীরূহের পতন ঘটে তখন ভূমিতে একটি কম্পন লেগেই থাকে।' ১৯৮৫ সালে কংগ্রেস দল সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করে। মূলত এ ব্যাপক বিজয় নেপথ্যে ছিল মানুষের সহানুভূতির জোয়ার। এর পর ১৮ বছর পার হয়ে গেছে, সেই সময়ের শিখ গণহত্যার জন্য এখনো পর্যন্ত কাউকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়নি।

যেকোনো ধরনের ক্ষণস্থায়ী কিন্তু চমকপ্রদ রাজনৈতিক ইস্যু, যেমন পারমাণবিক পরীক্ষা, বাবরি মসজিদ কিংবা তেহেলকা কাণ্ড অথবা নির্বাচনে সুবিধা নেওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিক্ষুব্ধ করে দেওয়া– তোমরা দেখতে পাবে এসব কাজে কংগ্রেস আগে থেকেই হাত পাকিয়ে নিয়েছে, এবং প্রতিক্ষেত্রেই কংগ্রেস এসবের দুষ্টবীজ বপন করেছে, আর এর গোপন ফসল বিজেপি হামলে পড়ে তুলে নিয়ে গেছে। সুতরাং এমন একটি অবস্থায় যখন আমাদেরকে ভোট প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন প্রকৃত বিবেচনায় আমাদের কাছে এ দুটো দলের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য থাকে কি? এর উত্তরটা আপাতভাবে ত্রুটিপূর্ণ শোনালেও সুনির্দিষ্টভাবে এতে 'হ্যাঁ' বলা যায়। কারণ হলো, এটা সত্যি যে কংগ্রেস দলই দশকের পর দশক ধরে নিদারুণভাবে এসব কাজ করেছে। তবে কংগ্রেস এসব কাজ করেছে রাতের অন্ধকারে, গোপনে। অন্যদিকে বিজেপি এসব কাজ করেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। কংগ্রেস কাজটা করেছে চাতুর্যের সঙ্গে, লুকিয়ে চুরিয়ে, ভণ্ডামির সঙ্গে, লাজুক মুখে। আর বিজেপি এ কাজ করে থাকে সবার সামনে, অহংকারের সঙ্গে। এবং এটাই হলো এই দুই দলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

সঙ্ঘ পরিবারের যে কীর্তিকলাপ, তার একটি অংশই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাকে উসকে দেওয়া। বহু বছর ধরে এটার পরিকল্পনা করা হয়েছে। খুব ধীরে

ধীরে এই বিষ আমাদের সমাজের রক্তস্রোতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরএসএস-এর বিভিন্ন শাখা, দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সরস্বতী শিশু মন্দির ইস্কুলের শিশুদের এবং তরুণ সমাজকে তাদের চিন্তাভাবনার মনোজগতকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে, এবং তাদের মনকে ধর্মীয় বিদ্বেষ-ঘৃণায় বিষিয়ে তুলছে। তাদেরকে শেখানো হচ্ছে বিকৃত ইতিহাস। সে ইতিহাসে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলের পূর্বে মুসলমান শাসন আমলে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের লুটতরাজ ও হিন্দু নারীদের গণধর্ষণের ঘটনার বর্ণনা অতিরঞ্জিত করে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এগুলোর কোনো অংশই পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো থেকে কম বিপজ্জনক নয়—যেগুলো তালিবান উৎপাদনের সূতিকাগার। গুজরাটের মতো একটি রাজ্যে পুলিশ, সরকার প্রশাসন এবং রাজনৈতিক লাঠিয়াল বাহিনী সুনিপুণভাবে সব কিছুর ভেতরেই সাম্প্রদায়িক ঘৃণাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

এই সমগ্র সংগঠনটির রয়েছে ব্যাপক জনসমর্থন। এটাকে অনুধাবন করতে না পারাটা বোকার মতো কাজ হবে। এদের আছে তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয়, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক শক্তি। এ ধরনের ব্যাপক ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই সম্ভব।

কিছু কিছু মাদ্রাসা মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘৃণা চর্চা করার উর্বর কেন্দ্র। সেখানেও একই ধরনের উন্মাদনা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকে সহযোগিতার অভাব থাকলেও বৈদেশিক আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে সেগুলো তারা ভালোমতোই করতে পারে। তারা হিন্দু মৌলবাদীদের দিকে এগিয়ে দেয় কিছু নিখুঁত উপকরণ যাতে তারা তাদের গণউন্মাদনা এবং ঘৃণার নৃত্য ঠিক তালে চালিয়ে যেতে পারে (বাস্তবে, মাদ্রাসাগুলো এত নিখুঁতভাবেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে যেন তারা হিন্দু মৌলবাদীদেরই একটি দল হিসেবে একসঙ্গে কাজ করছে।)

এ ধরনের নিরন্তর চাপের মুখে যেটা সবচেয়ে বেশি হওয়ার কথা সেটা হলো, মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ লোকই আত্মসমর্পণ করে কোনো একটি বস্তি বা ঘেটো (খিঞ্জি আশ্রয় কেন্দ্র) এলাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করবে। প্রতিনিয়তই এক ভীতির মধ্যে, কোনো প্রকার নাগরিক সুযোগসুবিধা ছাড়াই এবং কোনো ধরনের ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা না করে তারা সেখানে বসবাস করবে। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তখন কী রকম হবে? যে কোনো ক্ষুদ্র ঘটনায়, সিনেমার টিকিটের লাইনে ছোটখাট বাকবিতণ্ডা কিংবা কোনো ট্রাফিক সিগনালের মোড়ে কোনো বচসা যেকোনো সময় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। সুতরাং তারা শিখে নেবে কীভাবে একেবারে নীরব থাকতে হয়, তাগ্যকে মেনে নিতে হয়।

এবং যে সমাজে তারা বসবাস করে, তার শেষ প্রান্তে কীভাবে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে হবে সেগুলো আস্তে আস্তে শিখে নিতে হয়। এই ভীতি অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভেতরেও স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সঞ্চারিত হবে। অনেকেই, বিশেষ করে তরুণ সমাজ, জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে যাবে, তারা সব নির্মম ঘটনা ঘটানো শুরু করবে এবং নাগরিক সমাজকে তখন ডেকে নিয়ে বলা হবে–তোমরা এদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাও। আর প্রেসিডেন্ট বুশের সেই মুখের শব্দ-কামানটি পুনরায় ফেরতে আসবে যে, 'হয় তুমি আমাদের সঙ্গে আছো, নয় তো তুমি সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আছো।'

ওই কথাগুলো যেন কালের গভীরে সূচাগ্র বরফখণ্ড বা তুষারিকার মতো জমাট বেঁধে রয়েছে। অনাগত দিনগুলোতে এ ধরনের গণহত্যাকারী জল্লাদরা বাকপটু ধূর্ত মুখে এ সব বাক্যের মাধ্যমেই পুন:পুন নিজেদের নৃশংসতাকে প্রতিপন্ন করতে থাকবে (চলচ্চিত্রকাররা এই প্রক্রিয়াকে 'ঠোঁট মেলানো' বলেন)।

শিব সেনার নেতা বাল থাকরে, যিনি শেষের দিকে হয়তোবা, অনুভব করেছিলেন যে মোদী সম্ভবত তার থেকে একটু এগিয়ে গিয়েছে। তিনি একটি গৃহযুদ্ধের প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। এটাই কি আসলে যথাযথ নয়? এটা করতে পারলে আমাদের ওপর বোমা ফেলার জন্য এর পর আর পাকিস্তানের প্রয়োজন হবে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর বোমা বর্ষণ করতেই পারি। আসুন, পুরো ভারতবর্ষকেই আমরা আরেকটি কাশ্মীরে পরিণত করি। অথবা বসনিয়ায় কিংবা ফিলিস্তিন নতুবা রুয়ান্ডায় পরিণত করি। চলুন, আমরা সবাই মিলে দুঃখ দুর্দশায় আকণ্ঠ ডুবে যাই চিরতরে। আসুন, আমরা দামি দামি বন্দুক পিস্তল গোলাবারুদ কিনতে শুরু করি, যাতে আমরা একে অন্যকে হত্যা করতে পারি। চলুন, ব্রিটিশ অস্ত্রব্যবসায়ী এবং আমেরিকান অস্ত্র নির্মাতাদের আমরা আরো বেশি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলি আমাদের ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্তস্রোতের বিনিময়ে।[২৮]

'কারলাইল' গ্রুপের কাছে–বুশ এবং বিন লাদেন উভয়েরই যেটায় মালিকানা রয়েছে–বেশি বেশি পণ্যক্রয়ের কারণে আমাদের জন্য একটু মূল্যছাড়ের দাবি করতে পারি।[২৯]

সম্ভবত এসব ঘটনা ঠিকঠাক মতো এগিয়ে চললে আমরা খুব দ্রুতই আফগানিস্তানে পরিণত হবো (এ সংক্রান্ত প্রচারণার দিকে একবার নজর দিয়ে দেখুন; দেখুন তারা নিজেদেরকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে)। যখন আমাদের সমগ্র শস্যক্ষেত্র খনিজ সম্পদের জন্য খুঁড়ে ফেলা হবে, আমাদের দালানবাড়ি ধ্বংস করে ফেলা হবে, আমাদের অবকাঠামোগুলো ধূলিকণায় পরিণত করা হবে, আমাদের

সন্তানদেরকে শারীরিকভাবে অকর্মণ্য এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হবে, এবং আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে উৎসারিত ঘৃণা-বিদ্বেষ দ্বারা আমরা যখন নিজেদেরকেই যথাযথভাবে নির্মূল করে ফেলতে পারবো– সম্ভবত তখন আমরা আমেরিকার কাছে আবেদন জানাতে পারি, আমাদেরকে উদ্ধার করো, রক্ষা করো। সে সময় বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত ত্রাণের খাবার কুড়িয়ে খাওয়ার মতো থাকবে কেউ?[৩০]

আত্মধ্বংসের পথে আমরা কতোই না কাছাকাছি চলে এসেছি? আর মাত্র একটি পদক্ষেপ, তারপরই আমরা আলিঙ্গন করবো অবারিত পতনের। এরপরও সরকার এটার জন্য আমাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে। গোয়াতে অনুষ্ঠিত বিজেপির জাতীয় নেতাদের বৈঠকে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী রীতিমতো একটি ইতিহাস গড়ে ফেললেন। তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি গোঁড়ামির সেই দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করে গেলেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে জনসম্মুখে প্রকাশ করলেন এক চূড়ান্ত বিবেকবর্জিত বিদ্বেষ–যেটা বলতে হয়তো জর্জ বুশ এবং ডোনাল্ড রামসফেল্ডও ব্রিবত বোধ করতেন। তিনি বললেন, 'মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা কখনোই শান্তির সঙ্গে বসবাস করতে চায় না।'[৩১]

গুজরাট গণহত্যার তাৎক্ষণিক অবস্থায় বিজেপি নিজেদের এই 'পরীক্ষা'য় সাফল্য পেয়ে মনে করলো, এবার একটি নির্বাচন ঘোষণা করলে কেমন হয়! ভাদোদারা থেকে আমার বন্ধু আমাকে জানালেন, 'গুজরাটের এমন-কি নিরীহ-সাধারণ মানুষও খুব নম্র গলায় বলছে, 'মোদী আমাদের হিরো।''

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ছেলেমানুষী একটি আশা মনের কোণে লালন করে যাচ্ছিল যে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো যতই স্বার্থপর হোক না কেন গত কয়েক সপ্তাহের ভীতিকর তাণ্ডবের পর তারা হয়তো ক্ষোভে একতাবদ্ধ হবে। এবং বিজেপি আর কোনো ভাবেই ভারতের জনগণের ম্যান্ডেট পাবে না। হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণ নিশ্চয়ই বিজেপি-কে ক্ষমতায় বসায়নি। আমরা আশা করেছিলাম, যে ২২টির মতো দল বিজেপির নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গঠনে অংশ নিয়েছিল তারা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। আমরা ভেবেছিলাম, একেবারেই নির্বোধের মতো, যে, এসব জোটবদ্ধ দল হয়তোবা বুঝতে পারবে, তাদের নৈতিক চরিত্রে এর চেয়ে বড় পরীক্ষা আর দ্বিতীয়টি নেই এবং তাদের সেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষতার যে অবস্থান তার প্রতি তাদের নিষ্ঠাচারিতার এর চেয়ে বড় পরীক্ষা আর আসতে পারে না।

অথচ সেই সময়ের বাস্তব চিত্র হলো এই যে, জোটবদ্ধ একটি দলও তখন

বিজেপির ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেনি। তোমার ধূর্ত চোখে তুমি হয়তো দেখতে পারবে, প্রতিটি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে সবাই মনে মনে হিসাব করছিল কোন কোন আসন বা মন্ত্রণালয় তারা ধরে রাখতে পারবে। আর যদি তারা সমর্থন প্রত্যাহার করে তবে কোনগুলো হারিয়ে ফেলবে। ভারতের কর্পোরেট গোষ্ঠীর মধ্যে দীপক পারেখ ছিলেন একমাত্র মুখ্যনির্বাহী যিনি সামগ্রিক পরিস্থিরি জন্য তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন।[৩২]

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, যিনি ভারতের অবশিষ্ট এলাকায় একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাজনীতিবিদ, তিনি মোদীকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে বিজেপি সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ পেতে পারেন। কেননা, তার মনের কোণে ছোট্ট একটা আশা জিইয়ে ছিল যে, শিগগিরই তিনি হয়তো ভারতে উপ-রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন।[৩৩]

এবং এসবের ভেতরে সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা– মায়াবতী, যিনি বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) দলের নেতা, যিনি নিম্নবর্ণের লোকদের এক বিশাল আশা-ভরসার স্থল– তিনি উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সঙ্গে তার সংহতিকে আরো জোরদার করেন।[৩৪]

কংগ্রেস এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো মোদীর পদত্যাগ চেয়ে একটি গণবিক্ষোভের আয়োজন করে।[৩৫]

পদত্যাগ? আমরা কি আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের মাত্রা হারিয়ে ফেলছি? অপরাধীদেরকে তো পদত্যাগ করতে বলার কথা নয়। তাদেরকে অভিযুক্ত করে বিচারের সম্মুখীন করার কথা। একইভাবে তাদেরকেও বিচারের সম্মুখীন করা উচিত– যারা গোধরায় ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী এবং তাদের পুলিশ বাহিনী ও প্রশাসনের সেই সব সদস্য– যারা গুজরাটের এই গণহত্যার কূটকৌশলে অংশ নিয়েছিল–তাদের প্রত্যেককে বিচারের মুখোমুখী করা উচিত। যারা এই সামগ্রিক উন্মাদনাকে চূড়ান্ত দিকে নিয়ে যাওয়ার বক্তৃতা দিয়েছেন, ইন্ধন জুগিয়েছেন– তাদের সবাইকে বিচারের সম্মুখীন করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের হাতে সুযোগ রয়েছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মোদী, বজরং দল এবং ভিএইচপি'র বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের।[৩৬]

নানাদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এ সংক্রান্ত শত শত, বিপুল সাক্ষ্যসাবুদ। কিন্তু ভারতে আপনি যদি একজন কসাই বা গণহত্যাকারী হন, এবং ঘটনাক্রমে রাজনীতিবিদ হন তা হলে এসব দুষ্কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পেতে তোমার 'আশাবাদী' হওয়ার অসংখ্য কারণ রয়েছে। একজন রাজনীতিবিদকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাবে– এমনটি এ দেশে কোনো মানুষই আশাই করে না। মোদী

বিজেপির ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেনি। তোমার ধূর্ত চোখে তুমি হয়তো দেখতে পারবে, প্রতিটি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে সবাই মনে মনে হিসাব করছিল কোন কোন আসন বা মন্ত্রণালয় তারা ধরে রাখতে পারবে। আর যদি তারা সমর্থন প্রত্যাহার করে তবে কোনগুলো হারিয়ে ফেলবে। ভারতের কর্পোরেট গোষ্ঠীর মধ্যে দীপক পারেখ ছিলেন একমাত্র মুখ্যনির্বাহী যিনি সামগ্রিক পরিস্থিরি জন্য তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন।[৩২]

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, যিনি ভারতের অবশিষ্ট এলাকায় একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাজনীতিবিদ, তিনি মোদীকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে বিজেপি সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ পেতে পারেন। কেননা, তার মনের কোণে ছোট্ট একটা আশা জিইয়ে ছিল যে, শিগগিরই তিনি হয়তো ভারতে উপ-রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন।[৩৩]

এবং এসবের ভেতরে সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা– মায়াবতী, যিনি বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) দলের নেতা, যিনি নিম্নবর্ণের লোকদের এক বিশাল আশা-ভরসার স্থল– তিনি উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সঙ্গে তার সংহতিকে আরো জোরদার করেন।[৩৪]

কংগ্রেস এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো মোদীর পদত্যাগ চেয়ে একটি গণবিক্ষোভের আয়োজন করে।[৩৫]

পদত্যাগ? আমরা কি আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের মাত্রা হারিয়ে ফেলছি? অপরাধীদেরকে তো পদত্যাগ করতে বলার কথা নয়। তাদেরকে অভিযুক্ত করে বিচারের সম্মুখীন করার কথা। একইভাবে তাদেরকেও বিচারের সম্মুখীন করা উচিত– যারা গোধরায় ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী এবং তাদের পুলিশ বাহিনী ও প্রশাসনের সেই সব সদস্য– যারা গুজরাটের এই গণহত্যার কূটকৌশলে অংশ নিয়েছিল–তাদের প্রত্যেককে বিচারের মুখোমুখী করা উচিত। যারা এই সামগ্রিক উন্মাদনাকে চূড়ান্ত দিকে নিয়ে যাওয়ার বক্তৃতা দিয়েছেন, ইন্ধন জুগিয়েছেন– তাদের সবাইকে বিচারের সম্মুখীন করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের হাতে সুযোগ রয়েছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মোদী, বজরং দল এবং ভিএইচপি'র বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের।[৩৬]

নানাদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এ সংক্রান্ত শত শত, বিপুল সাক্ষ্যসাবুদ।

কিন্তু ভারতে আপনি যদি একজন কসাই বা গণহত্যাকারী হন, এবং ঘটনাক্রমে রাজনীতিবিদ হন তা হলে এসব দুষ্কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পেতে তোমার 'আশাবাদী' হওয়ার অসংখ্য কারণ রয়েছে। একজন রাজনীতিবিদকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাবে– এমনটি এ দেশে কোনো মানুষই আশাই করে না। মোদী

এবং তার দোসরদের বিচারের সম্মুখীন করা হোক এবং রাজপথ থেকে সরিয়ে ফেলা হোক– এ ধরনের দাবি অন্য সব রাজনীতিবিদকেও যে দুর্বল করে দেবে তাদের নিজেদের অগ্রহণযোগ্য অতীতের কারণে। সুতরাং, এর পরিবর্তে তারা সংসদে যথেষ্ট চিৎকার চেঁচামেচি করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাশীল দল একটি তদন্ত কমিশন গঠন করলেন এবং সেখানে যা কিছু প্রমাণাদি থাকুক না কেন– সেসব উপেক্ষা করলেন এবং নিজেদের মধ্যে এটা নিশ্চিত করলেন যে, আসল লোকগুলো যেন তাদের মতো করে চলতে পারে।

সামগ্রিক বিষয়টি ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। নির্বাচন দেওয়াটা উচিত কি উচিত নয়? সেই সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন নেবে, নাকি সুপ্রিম কোর্ট? যেই নিক, সেই নির্বাচনটি এখনই হওয়া উচিত, নাকি কিছুদিন দেরি করা উচিত, যাতে মোদীকে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দেওয়া যায়। এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি তার কর্মজীবন আরো চালিয়ে যেতে পারেন, যাতে করে গণতন্ত্রের মৌলিক ও চালিকাশক্তির আদর্শকে শুধু উৎখাতই করা হবে না বরং পরিকল্পিতভাবে সেগুলোর ওপর অন্তর্ঘাত করা সম্ভব হবে। এ ধরনের গণতন্ত্র সমস্যাই সৃষ্টি করে, সমাধান দিতে পারে না। আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো, এটি তার ভয়াবহ শত্রুকেও পরিবর্তন করে বন্ধু বানাতে পারে। আমাদের এই ক্রমবর্ধমাণ সমস্যার পাঁকে তলিয়ে যাওয়া এই গণতন্ত্রকে ইতিমধ্যেই এমনভাবে যথেষ্ট পরিমাণে দুমড়ানো-মোচড়ানো হয়েছে, লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে যা জনগণ অনুধাবন করতেই পারছে না, এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর কি যুক্তি থাকতে পারে?

কি হবে যদি বিজেপি নির্বাচনে জয়লাভ করে? আমরা জানি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় জর্জ বুশের ৬০ শতাংশেরও বেশি জনসমর্থন ছিল। এবং ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে অতর্কিতে জবরদখলের জন্য এর চেয়েও শক্ত জনসমর্থন ছিল অ্যারিয়েল শ্যারনের।[৩৭]

এই জনসমর্থন কি সবকিছুকে যথাযথ বলে প্রতিপন্ন করলো? কেন তা হলে আমরা আমাদের আইন ও বিচারব্যবস্থা, সংবিধান, সংবাদপত্র, আমাদের সামগ্রিক জনমতের ওপর এটি ছেড়ে দিচ্ছি না? অথবা কেন আমরা আমাদের মূল্যবোধ বা নৈতিকতা দিয়ে কোনো কিছু যাচাই করছি না? সব কিছুই আমরা কেন শুধু ভোটের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি? গণহত্যা তো জনমতের একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এবং গণহত্যাগুলোর তো একটি মার্কেটিং ক্যাম্পেইন বা বিপণন কৌশলও থাকতে পারে।

ভারতে ফ্যাসিবাদের খুব শক্তিশালী নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। আসুন আমরা ২০০২ সালের বসন্তকালকে চিহ্নিত করে রাখি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের যে জোট আছে তাদের আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারি যে, তারা আমাদের ফ্যাসিবাদের মৃত্যুবৎ অভিষিক্ত হওয়ার সময়টিকে এরকম একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুকূল পরিমণ্ডল তৈরি করে দিয়েছিলেন, তবে আমাদের এ যাবৎকালের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিজমকে এ পর্যন্ত টেনে আনার জন্য আমরা কি তাদের কৃতিত্ব দিতে পারি না?

১৯৯৮ সালে পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষা পর পরই এটির পালে প্রথম হাওয়া লাগে।[৩৮]

এর পর থেকে জনগণের রক্তলোলুপ দেশপ্রেমের যে সামষ্টিক শক্তি– সেটা রাজনৈতিক মুদ্রায় একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হলো। এই 'শান্তির অস্ত্র' ভারত এবং পাকিস্তানকে হুমকি-ধামকি ভীতি প্রদর্শন এবং পাল্টা ভীতি প্রদর্শনের একটি ক্রমবিবর্তিত ঘূর্ণাবর্তের ফাঁদে ফেলে দিল।[৩৯]

আর এখন, একটা যুদ্ধ আর পরবর্তীতে শত শত মানুষের লাশ, আর উভয় সীমান্তে দশ লাখেরও বেশি সৈন্য মুখোমুখি জমায়েত হয়েছে যাদের সবার চোখ আটকে আছে একটি দিকনির্দেশনাহীন পারমাণবিক বিস্ফোরণের কেন্দ্রে।[৪০]

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ক্রমবর্ধমাণ যুদ্ধংদেহী অবস্থা, সেটি সীমান্ত অঞ্চল থেকে ধাক্কা খেয়ে আমাদের রাজনীতির দেহ-অবয়বে ঢুকে পড়েছে, যেন সেটা একটি তীক্ষ্ণ ফলা–আমাদের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সংহতি ও সহিষ্ণুতা ছিল তাকে ফালা ফালা করে চিরে ফেলছে। বলতে গেলে একেবারে চোখের পলকেই নরকের রক্ষীরা যেন মানুষের মনের ভেতরে বসত গেড়ে নিয়েছে। আমরাই তাদের আমাদের মাঝে জায়গা করে দিয়েছি। ভারত এবং পাকিস্তানের ভেতরে যতবারই শত্রুতার পারদ চড়ে যায়, ভারতের অভ্যন্তরে এর মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুভাপান্ন মনোভাবের মাত্রাও একইসঙ্গে বেড়ে যায়। পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধেই আমরা নিজেদের ওপর, জীবনযাত্রার ওপর একটি ক্ষত তৈরিসহ আমাদের জমকালো বৈচিত্র্যপূর্ণ চারদিক এবং প্রাচীন সভ্যতা–সব কিছুর মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে নিজেদের পৃথক করি।

দিন দিন ক্রমেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বোঝানো হচ্ছে–যেটি পরস্পারিক কোনো শ্রদ্ধাবোধ থেকে আসেনি। বরং তা এসেছে অন্যদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব থেকে। আর এই 'অন্যদের' মানে এ মুহূর্তে শুধুই 'পাকিস্তান' নয়, এর অর্থ পুরো 'মুসলমান' সম্প্রদায়। এটা দেখা খুবই যন্ত্রণার যে, একটি পরিচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ কীভাবে ফ্যাসিজমের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। একদিকে যেমন আমরা ফ্যাসিস্ট বা উগ্রবাদীদেরকে একটি জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণের অনুমতি দিতে পারি না, অথবা অনুমতি দিতে পারি না এটা নির্ধারণের

যে এই জাতির সঙ্গে কারা অঙ্গীভূত আর কারা নয়। এটাও আমাদের জন্য স্মরণীয় যে, কমিউনিস্ট বা সমাজবাদী, পুঁজিবাদী ও ফ্যাসিস্ট–জাতীয়তাবাদ-এর সকল প্রবক্তাই বিংশ শতাব্দীর গণহত্যার মূলে কাজ করেছে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের কথা বলার সময় এ বিষয়টি আমাদের সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখা দরকার।

একটি সমসাময়িক জাতি হিসেবে না দেখে আমরা কি নিজেদেরকে একটি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী হিসেবে দেখতে পারি না? একটি ভূখণ্ডকে টহল দেওয়ার পরিবর্তে আমরা কি ভালবাসতে পারি না? সভ্যতা বলতে কি বোঝায় তা উপলব্ধি করা সঙ্ঘ পরিবারের সাধ্যের অতীত। এটি শুধু চায় সবকিছুকে সীমিত করতে, হ্রাস করতে, নির্দিষ্ট করতে, বিভক্তি আনতে এবং অতীতে আমরা কি ছিলাম এ ভাবনায় আমাদের স্মৃতিকে দূষিত করতে এবং বোঝাতে–আমরা আসলে কি এবং আমাদের স্বপ্ন কি? কী ধরনের ভারতবর্ষ তারা চায়– ছিন্নমস্তিষ্ক প্রাণহীন একটি দেহ? যেটি পড়ে রয়েছে একটি কসাইয়ের ধারালো ভারী ছুরির নিচে: এবং তার বিকলাঙ্গ হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে গভীরভাবে ছুরি চালানো হয়েছে। আমরা কি এমনটিই হতে দিতে পারি? এমনটিই কি আমরা হতে দিয়েছি?

বিগত বছরগুলোতে আমাদের এ যাবৎকালের হামাগুড়ি দিতে দিতে বেড়ে ওঠা ফ্যাসিজম বা উগ্রবাদ বিকশিত হয়েছে আমাদের অনেক 'গণতান্ত্রিক' প্রতিষ্ঠানগুলোর হাত ধরে। সংসদ থেকে শুরু করে সংবাদপত্র, পুলিশ, সরকার প্রশাসন, সাধারণ জনগণ–প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই চটুল স্তুতিবাক্যে ভাসিয়ে দিয়েছে। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ-নামধারীরাও উগ্রবাদের সঠিক আবহ তৈরির সাহায্যকারী হিসেবে অভিযুক্ত। প্রতিবার আপনি যখন একটি প্রতিষ্ঠানের অধিকারের পক্ষে ভূমিকা রাখেন (সব ধরনের প্রতিষ্ঠান–সুপ্রিম কোর্টসহ) অথবা আপনি যদি সর্মথন জানান একটি দায়মুক্ত জবাবদিহিতাশূন্য অসীম ক্ষমতাচর্চার পক্ষে– যাকে কোনোভাবেই চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, তা হলে আপনি অবশ্যই উগ্রবাদের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন।

গত কয়েক সপ্তাহে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার নিন্দা জানাতে আমাদের জাতীয় সংবাদপত্রগুলো বিস্ময়করভাবে সাহসী হয়ে উঠেছে। বিজেপি'র সহগামী অনেক ব্যক্তি– যারা নাকি দলটির পতনের প্রান্ত পর্যন্ত এক সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে– এখন তারা তাদের পায়ের নিচে তাকিয়ে নরকের অতল গহ্বর দেখতে পাচ্ছে, যে গহ্বরে গুজরাট একসময় পতিত হয়েছিল এবং প্রকৃত হতাশা নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কত দিন ধরেই-বা তারা এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে? এটা অবশ্যই আসন্ন ক্রিকেট মৌসুমের জন্য পরিচালিত গণসচেতনামূলক প্রচার-অভিযানের মতো কোনো ব্যাপার নয়; এবং সবসময়ই ধ্বংসযজ্ঞের মতো কোনো

বিষয় এর সামনে থাকবে না– যেটা প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। এই ফ্যাসিজম সবসময়ই খুব ধীরে এবং অবিচল গতিতে সরকারের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চুইয়ে চুইয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে। এটা হচ্ছে জনগণের মুক্তমানসিকতার ক্রমাগত ক্ষয়সাধন এবং আমাদের মানব সত্ত্বার গভীরে এটি দিনের পর দিন ধীরগতিতে অদৃশ্য ভাঙ্গন চালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ বলতে বোঝায় মানুষের মন ও হৃদয়কে পুনরায় জয় করার যে যুদ্ধ। যুদ্ধ মানে এই নয় যে, আরএসএস শাখাগুলো এবং মাদ্রাসাগুলো– যারা খুব খোলামেলাভাবে সাম্প্রদায়িক কতাবার্তা বলে, তাদের নিষিদ্ধ করে দেওয়া। যুদ্ধের অর্থ হলো, সেই ধরনের একটি দিন অর্জনের জন্য কাজ করা যেখানে সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে এ সব ফ্যাসিজমকে নষ্ট চিন্তাধারা হিসেবে পরিত্যাগ করবে। এর অর্থ হলো, গণমানুষের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তীক্ষ্ণ চোখ রাখতে হবে এবং সবসময় জবাবদিহিতার দাবি রাখতে হবে। এর মানে হলো, তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সবসময় গণমানুষের কাছাকাছি রাখতে হবে এবং সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতাহীন অসহায় লোকদের মধ্যে বঞ্চনার যে অস্ফুট গুঞ্জন চলছে, সেই না বলা কথাগুলোর দিকে কান পেতে রাখতে হবে। তার মানে হলো, আমাদের দিতে হবে সেরকম একটি প্লাটফরম– যেখানে অসংখ্য অসংখ্য কণ্ঠস্বর তাদের বঞ্চনার কথা শোনানোর সুযোগ পায়। এগুলো সেই সব সহস্র অযুত লোকের কণ্ঠস্বর যারা বঞ্চনার তলানিতে ঠেকে গিয়ে দেশ জুড়ে প্রতিরোধ অন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে– যারা প্রকৃত সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে। বাস্তব সে সব সমস্যার ভেতরে রয়েছে– দাসখতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, বিবাহ প্রতিষ্ঠানের আড়ালে ধর্ষণ, ব্যক্তিগত যৌন অভিরুচি, নারীদের বেতন কাঠামো, ইউরেনিয়াম বা তেজস্ক্রিয় বর্জ্যপদার্থকে নিরাপদ-পন্থায় আটকে রাখা, খনিজ সম্পদ আহরণের কর্মকাণ্ড, তাঁতীদের দুঃখ দুর্দশা এবং কৃষকদের আত্মহত্যার সমস্যা। এর অর্থ হলো, গৃহহীন হয়ে পড়া বা বাস্তুচ্যুত হওয়ার বিরুদ্ধে নিরন্তর নৈমিত্তিক সহিংসতা এবং অত্যন্ত নির্মম দারিদ্রের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ।

যুদ্ধ বলতে এটাও বোঝায় যে, আমাদের সংবাদপত্রের কলাম এবং টেলিভিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচার সময়কে আমরা ছিনিয়ে নিতে দেব না তাদেরকে– যারা তাদের মতাদর্শকে বারবার মানুষের সামনে তুলে ধরবে, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া।

একদিকে যেমন গুজরাটে যা ঘটেছে তা দেখে ভারতের বেশিরভাগ মানুষই খুব আতঙ্কিত হয়েছে, অন্যদিকে এমন হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা এর আদর্শবাদে এতটাই মুগ্ধ হয়েছে যে তারা এসব আতঙ্কের আরো গভীরে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমার আশেপাশে লক্ষ্য করে দেখো, হয়তো দেখতে পাবে যে,

ছোট ছোট পার্কগুলোতে অথবা গাড়ি পার্কিংয়ের খালি কোনো স্থানে অথবা কোনো গ্রামে জটলা পাকিয়ে আরএসএস তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এবং তাদের জাফরান রঙের ঝাণ্ডাটি তুলে ধরেছে সবখানে। হঠাৎ করেই তুমি তাদের যে কোনো জায়গায় দেখতে পাবে, খাকি পোশাকে বড় মানুষেরা উন্নত পদযাত্রায় যেভাবে এগিয়ে যায়, সেভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় এগিয়ে যাচ্ছে? কীসের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে?

ইতিহাসের প্রতি তাদের যে বৈরাগ্য সেটা একপ্রকার ঢাল হিসেবে কাজ করে। আর সে কারণেই ফ্যাসিজম সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেটা অর্জনের চেষ্টা করে সেটা এক পর্যায়ে নিজেই নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কারণ এর ভেতরে রয়েছে এক ব্যাপক মূঢ়তা। কিন্তু দুঃখজনক হলো, একটি পারমাণবিক হামলার পরে চলমান তেজস্ক্রিয়শীলতার মতোই এরও রয়েছে আরেকটি পর্যায় যেটা নাকি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বিকলাঙ্গ করে দেয়। বিক্ষোভ, ঘৃণা–এসবের মাত্রাকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। শুধু গণনিন্দার দ্বারা একে দমিয়ে রাখা সম্ভব হবে– এমনটি আশা করা যায় না। ভাতৃত্ববোধের স্তুতিগান এবং ভালোবাসা হয়তো অনেক বড়, তবে এখন তা আর যথেষ্ট নয়।

ঐতিহাসিকভাবেই, জাতীয়তাবাদের মরীচিকামূলক প্রতারণাই ইন্ধন জুগিয়েছে ফ্যাসিজম আন্দোলনের। ভারতবর্ষে ফ্যাসিজম শিকড় গেড়েছে সেই স্বপ্নের হাত ধরে যার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিন্নপথে লক্ষ্যচ্যুত ও অপচায়িত হয়েছে।

দেশবিভাগের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষ হত্যার রক্তস্রোতের কলঙ্ক দাগে আমাদের মনঃকল্পিত মুক্তি এসেছে– স্বাধীনতা নিজেই তাই মহাত্মা গান্ধীর সেই বিখ্যাত উক্তি– একটি 'উডেন লোফ' (রুটি নয়, যেন কাঠের টুকরো)।[৪১]

প্রায় অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এই ঘৃণা ও পারস্পারিক অবিশ্বাস ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, এবং এগুলোকে সবসময়ই জিইয়ে রাখা হয়েছে, রাজনীতিবিদরা কখনই চায়নি এগুলো পুরোপুরি নিরাময় লাভ করুক– যা ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সবসময়ই সামনের সারিতে রাখা হয়েছে। নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা নিতে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সংসদীয় প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসব বের করার চেষ্টা করেছে– যেমনটি উইপোকা একটি ঢিপির মধ্যে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অসংখ্য সুড়ঙ্গ তৈরি করে এগোয়– তেমনি করে রাজনীতিকরা যত দিনে এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' বৈশিষ্ট্যকে শত-ছিদ্র শূন্য খোলসে পরিণত না করছে ততদিন ধরে তারা এর অর্থকেই কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এর ফলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' সৌধটি এখন যেকোনো মুহূর্তে ভেঙেচুরে পড়ার উপক্রম হয়েছে। রাজনীতিবিদদের এই টুকরো

টুকরো ভেঙে ফেলার প্রবণতা আমাদের সামগ্রিক কাঠামোর ভিত্তিটাকেই দুর্বল করে দিয়েছে–যে কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সংবিধান, সংসদ এবং আমাদের আইনি আদালত। এই সব কিছুই একে-অন্যের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে যুক্ত– যার মাধ্যমে একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড গঠিত হয় ভারসাম্যযুক্ত উপাদানের মাধ্যমে। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিবিদদের অভিযুক্ত করা মূল্যহীন, কেননা তারা উচ্চমাত্রার নৈতিক বোধ ধারণ করতেই অক্ষম, তাদের থেকে এ বোধ আশা করাটাই বাতুলতা। তারা বরং এমন একটা প্রাণী যাদের আমরা করুণাই করতে পারি। তারা আমাদের দমিয়ে রাখতে পারে এ কারণে যে আমরা নিজেরাই তাদের এ কাজটি করার সুযোগ করে দিই। এটা এভাবে তর্ক করা যেতে পারে যে, রাজনীতিবিদরা আমাদের নাগরিক সমাজকে যতোটা ব্যর্থ করে দিয়েছে, নাগরিক সমাজও রাজনীতিকদের ততোটাই ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমাদের অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে একটি বিপজ্জনক ও পদ্ধতিগত একটি গলদ রয়েছে– আমাদের রাজনীতিবিদরা যার সুযোগ নিয়ে থাকে। গুজরাটে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যে জ্বলে ওঠা দেখলাম তা এই গলদেরই একটি কুৎসিত প্রকাশ। সরকার ব্যবস্থাপনার এসব নলের ভেতরে রয়েছে লেলিহান শিখা। এ সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে এবং এর পর একটি পদ্ধতিগত সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

আমাদের জীবনতটে ফ্যাসিজমের এই যে আবির্ভাব এটা কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভক্তি নিয়ে রাজনীতিবিদদের যে সুযোগসন্ধানী রূপ, শুধু এ কারণেই নয়। বিগত ৫০ বছরে আমাদের জনসাধারণের একেবারেই সাধারণ যা কিছু চাওয়া, খুব আটপৌরে যে আশা আকাঙ্খা– যেন সম্মানের সঙ্গে নিরাপত্তার সঙ্গে বেঁচে থাকা যায় এবং নিষ্ঠুর নিরন্তর দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়–একেবারে পরিকল্পিতভাবে সে আশার আলোকে নিকষ অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ দেশের প্রতিটি 'গণতান্ত্রিক' প্রতিষ্ঠান নিজেকে তুলে ধরেছে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা-বর্জিত, অগম্য একটি প্রতিষ্ঠান হিসেব। এসব 'গণতান্ত্রিক' শর্ত মেনে চলার ব্যাপারে এসব প্রতিষ্ঠান হয় অনিচ্ছুক, নয় তো অক্ষম। একটি প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যেসব কর্মকৌশল রয়েছে–যেমন ভূমিসংস্কার, শিক্ষাব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য অথবা প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম বণ্টন কিংবা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ– এ জাতীয় সব কিছুকেই খুব ধূর্ততার সঙ্গে, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, নিয়মিতভাবে অবহেলা করা হয়েছে এবং প্রতিকারহীন করে তোলা হয়েছে সেই সব শ্রেণীর মাধ্যমে যাদের নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুগভীর প্রভাব বিদ্যমান সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে।

আর এখন তো এই কর্পোরেট বিশ্বায়নের যুগে খুব নির্মম স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্তে, একটি সামন্ত সমাজব্যবস্থায় যেভাবে যা ইচ্ছে তাই করা হয়, সে ভাবে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ করছে আমাদের সমাজের গভীরে। সমাজের যে জটিল শ্রেণীবিন্যস্ত উপাদান রয়েছে তা ছিঁড়ে ফেলে ভেতরে প্রবেশ করছে কর্পোরেট বিশ্বায়নের বিষ।

এসবের ভেতরে প্রকৃতভাবে খুব গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে। এবং ফ্যাসিস্টরা এটি সৃষ্টি করেনি। বরং এই তৈরি জিনিসটাকে নিজেদের স্বার্থচরিতার্থে ফ্যাসিস্টরা ছিনিয়ে নিয়েছে। এটাকে আরো শক্তিশালী করেছে এবং এর ভেতর থেকে আরো গুপ্ত ও মেকি অহংকার বোধ গড়ে তুলেছে। তারা কাজে লাগিয়েছে মানুষের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে– যার নাম 'ধর্ম'। যেসব মানুষ তাদের জীবনের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে, যাদেরকে নিজ অঞ্চল থেকে মূলোৎপাটন করা হয়েছে, অথবা যারা তাদের ভাষা বা সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছে– তাদেরকে দিয়ে গৌরব বোধ করানো হচ্ছে অন্য কিছু দিয়ে। সেগুলো এমন কিছু নয়, যার জন্য তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতো এবং নিজ গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত অর্জন বলে বিবেচনা করতে পারে। অথচ সেগুলো এমন কিছু যা, ঘটনাক্রমে হয়েছে বা তেমন কিছুর ভ্রম জাগিয়েছে। অথবা আরো ভালোভাবে বলতে গেলে, এমন কিছু একটা– যা ঘটনাক্রমে হয়নি। এই যে মিথ্যাচারিতা, শূন্যতা, এই অহংবোধ তাদের ভেতরে ইন্ধন জোগাচ্ছে একটি শিকারীসুলভ-ক্রোধের– যেটাকে আমাদের চারদিকের কর্মক্ষেত্রে, নাট্যমঞ্চের দিকে চালিত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া আর কীভাবে সেসব প্রকল্পগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারেন– মানুষের অধিকার নির্মূল করাই যাদের উদ্দেশ্য। অথবা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দরিদ্র রাষ্ট্রের পদাতিক সৈন্যদের দিয়ে কেন নিঃশেষ করে ফেলা হয় দরিদ্র মানুষের ন্যূনতম অধিকারকে? এটাকে আপনি এর বাইরে আর কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন–যেখানে গুজরাটের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা যেসব আদিবাসী বা দলিতজন হাজার বছর ধরে উদ্বাস্তুদের চেয়েও নির্মমভাবে অত্যাচারের শিকার হতো; হঠাৎ করে সেই আদিবাসী বা দলিতরাই কিনা অত্যাচারী বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে হাত মেলাল সেসব মানুষকে হত্যা করতে যারা আদিবাসী বা দলিতদের চেয়ে কিছুটা কম দুর্ভাগ্যের ছিল মাত্র। আদিবাসী বা দলিতরা কি তাহলে অর্থের গোলাম কিংবা ভাড়াটে যোদ্ধা? তা হলে কি উচ্চবর্ণের পৃষ্ঠপোষকতা করা তাদের জন্য সঠিক ছিল? এবং সঠিক ছিল তাদের নিজেদের কৃতকর্মের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া? নাকি আমিই স্থূলবুদ্ধির, রয়েছি মরীচিকার ভেতরে?

সম্ভবত একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের পক্ষে এটা একটি সাধারণ অভ্যাস যে,

তার ক্ষোভ এবং ঘৃণাকে প্রকাশ করবে তার থেকে কম ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের ওপর। তারপরে যারা আরো কম ভাগ্যবিড়ম্বিত–তাদের ওপর। কেননা, তার প্রকৃত শত্রুর ধারেকাছে ঘেঁষার সাধ্য তার নেই, সুতরাং সে তার হিংসা উগরে দিচ্ছে হাতের কাছে পাওয়া তুলনামূলকভাবে কম ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের ওপর। কেননা, তাদের নিজেদের নেতারাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ দুর্বল করে রেখেছে এবং সেসব নেতা উঁচুমহলের বাসিন্দাদের সঙ্গে রসনাবিলাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদেরকে ফেলে রেখেছে একটি দিকনির্দেশনাহীন প্রান্তরে এবং সেখানে তারা আওড়াচ্ছে অর্থহীন হিন্দুরাজ্যে ফিরে যাওয়ার মন্ত্র। (আমরা ধারণা করে নিতে পারি, এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে 'একটি সর্বব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা'– আরম্ভ হিসেবে এটা এতটাই বাস্তববাদী একটি লক্ষ্য যা ছিল অতীতের ব্যর্থ হয়ে যাওয়া ফ্যাসিজমের প্রকল্পগুলোতেও। যেমন, রোম সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় রোমানদের মাহাত্ম্যকে পুনরাবৃত্ত করা কিংবা জার্মানদের জাতিগতভাবে বিশুদ্ধকরণ প্রকল্পগুলোকে পুনরায় উজ্জীবিত করা, কিংবা ইসলামিক সুলতানদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে।)

ভারতে প্রায় ১৫ কোটি মুসলমান বসবাস করে। হিন্দু ফ্যাসিস্টরা এদেরকে বৈধ শিকার হিসেবে বিবেচনা করে। মোদী এবং বাল থাকরের মতো লোকজন কি এটা মনে করে যে, একটি 'গৃহ যুদ্ধের' মাধ্যমে তাদের খতম করার দৃশ্য সমগ্র বিশ্ব নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখবে শুধু? সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে যে, ইতিমধ্যেই গুজরাটে যা ঘটেছে তাকে নাৎসি শাসিত আমলের সঙ্গে তুলনা করে নিন্দা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বেশ কিছু রাষ্ট্র।[৪২]

এ ব্যাপারে ভারত সরকারের ইঙ্গিতপূর্ণ এই প্রতিক্রিয়া ছিল যে, ভারতের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' নিয়ে বিদেশিদের ভারতীয় গণমাধ্যম ব্যবহার করা উচিত নয়।[৪৩] (কাশ্মীরে আতঙ্কে হিম হয়ে যাওয়ার মতো যা ঘটছে–তার মতোই?)

এর পরের ধাপটা তা হলে কী হবে? সেন্সরশিপ? ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া? আন্তর্জাতিক টেলিফোন কল আটকে দেওয়া? ভুল 'সন্ত্রাসী'দের হত্যা করা এবং তারপর তাদের ডিএনএ নমুনাগুলোর গোঁজামিল দেওয়া?[৪৪] রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের চেয়ে বড় কোনো সন্ত্রাসবাদ নেই।

কিন্তু কেই বা তার মোলাকাত করতে পারবে? তাদের ফ্যাসিস্ট ক্যান্টনমেন্ট হয়তোবা বিরোধীদলের কিছু বজ্রাঘাত ও রক্তের আঘাতে একটুখানি টোল খাবে মাত্র। এ পর্যন্ত একমাত্র লালুপ্রসাদ যাদব, যিনি বিহারে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রধান, প্রকৃত আবেগপূর্ণভাবে বলেছেন, 'কোন মায়ের সন্তান বলে এটা একটি হিন্দু রাষ্ট্র? তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও, আমি তার বুক চিরে

ফেলবো।[৪৫]

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দ্রুত সমাধান করার মতো কোনো কিছু আমাদের হাতে নেই। আমাদের প্রত্যেকেই, যারা এই সামগ্রিক ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছি, সবাই যদি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ থাকি, তখনই একমাত্র ফ্যাসিজম নিজে থেকেই ফিরে যাবে।

আমরা কি তা হলে প্রস্তুত আছি এই সূচনা পর্ব শুরু করার? আমাদের লাখ লাখ মানুষ, শুধুমাত্র রাস্তার র‍্যালিতে নয়, মনোবল পুনরুদ্ধারের কাজটি আমাদের কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, আমাদের বাড়িতে, আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি অঙ্গনে চালানোর জন্য আমরা কি প্রস্তুত আছি?

নাকি এখনো সে সময় আসেনি...?

যদি না এসে থাকে, তা হলে কিছু বছর পর যখন অবশিষ্ট বিশ্ব আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (তাদের যা করা উচিত), জার্মানীতে হিটলারের জামানার পরবর্তী সাধারণ নাগরিকদের মতোই অবশেষে আমাদের ঠেকে শিখতে হবে। আর বিশ্বের অন্যান্য মানবজাতি আমাদের প্রতি যখন ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে তখন আমরা নিজেদেরকে চিনতে পারবো। তখন আমরা এটাও উপলব্ধি করতে পারবো যে, আমাদের শিশুদের চোখের দিকে তাকাতে আমাদের মাথা লজ্জাবনত হচ্ছে এ কারণে যে, আমরা কী করেছিলাম, আর কী করিনি এবং আমরা কী হতে দিয়েছিলাম।

এই হলাম আমরা। এই ভারতে। রাতের নীরবতায় বিধাতা যেন এই সত্য আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করাতে পারেন।

ঘটনার
কতোটা গভীরে
আমরা যাবো?

২০০৪ সালের ৬ এপ্রিল ভারতের আলিগড়ের 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'-এ আই. জি খান মেমোরিয়াল লেকচার হিসেবে এই প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আমি প্রথম পাঠ করি। ভারতের দৈনিক 'হিন্দুস্তান'-এ ২৩-২৩ এপ্রিল ২০০৪ সালে এটি হিন্দিতে, এবং 'দ্য হিন্দু'তে ২৫ এপ্রিল ২০০৪-এ ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সম্প্রতি এক কাশ্মীরি তরুণ বন্ধু আমার সঙ্গে কাশ্মীরের জীবনযাত্রা নিয়ে আলোচনা করছিল। সেখানে বিষাক্ত রাজনীতির যে চিহ্ন রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে। কিংবা সেখানকার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে যে নির্দয় নৃশংসতা চলছে সে সম্পর্কে। কিংবা সেখান পরিপূর্ণ হিংসার সঙ্গে সমাজে বিভক্তির যে সূক্ষ্ম পর্দা রয়েছে সে সম্পর্কে। সেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন, পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থার অফিসার, সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারি, ব্যবসায়ী, এমন কি সাংবাদিকরাও প্রায়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে মতবিরোধিতায় লিপ্ত হয় এবং কখনো কখনো একে আরেকজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমার বন্ধু এমন একটা জীবনের কথা বলছিল যেখানে প্রতিনিয়ত হত্যাযজ্ঞের মধ্যে মানুষ তার দিনযাপন করে। এবং ক্রমবর্ধমান হারে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ঘটনার ভেতরেই বসবাস করে। কিংবা গুজব, ভীতি অথবা অমীমাংসিত রহস্য– এসবের সম্মিলনে এক ধরনের বাস্তবর্জিত একটি অস্বস্তিকর অবস্থা নিয়ে এখানে জীবন চালাতে হয়। অর্থাৎ, এসব ঘটনা এমন একটা কিছু– যা কেবল কাশ্মীরিরাই জানে যে, আসলে কি হচ্ছে। এবং কাশ্মীরের বাইরে অন্যদের যা বলা হয় তার সঙ্গে ভেতরের বাস্তবতার যে বিশাল পাথর্ক্য রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কথা বলছিল সে। সে বলেছিল, 'কাশ্মীর বরাবরই এমন একটি অঞ্চল যেখানে বহু মানুষের স্বার্থ জড়িত। আর এখন তো এটি মানসিক পাগলা-গারদে পরিণত হয়েছে।'

যতই আমি তার মন্তব্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করি ততই আমার মনে হয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গেও এই বর্ণনা যেন বেশ সুন্দর খাপে-খাপে মিলে যায়। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের মনিপুর, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম রাজ্য– এরা প্রত্যেকেই আসলে সেই মানসিক গারদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। এর কোনো কোনোটি হতে পারে সেই গারদের অধিকতর বিপজ্জনক কিছু কামরা। তবে মূল ভূখণ্ডেও আমাদের কিছু বিভাজন রয়েছে, যেমন– আমাদের জ্ঞান এবং তথ্য, আমরা যেটা জানি এবং আমাদের যেটা জানানো হয় সেগুলোর মধ্যে; কিংবা সেইসব অজানা বিষয় এবং সেসব বিষয়ের ওপর আমাদের যে নিশ্চয়তা দেওয়া দেয়– তাদের মধ্যে; যেটাকে গোপন রাখা হয়

এবং যেটাকে প্রকাশ করা হয়– তাদের মধ্যে; মূল সত্য এবং ধারণাপ্রসূত ব্যাপার– এদের মধ্যে; অথবা কল্পলোক এবং বাস্তবজগতের মধ্যে। এবং এই বিভাজনই এখন পরিণত হয়েছে এক নিরন্তর অনুমানভিত্তিক এবং সম্ভাব্য বিকারগ্রস্ত আলোচনায়। এটা একটা বিষাক্ত সূতিকাগার– যেখানে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলোকে উদ্দীপিত করে মানুষের বোধের ভেতরে তা গেঁথে দেওয়া হয়।

প্রতিবারই যখন তথাকথিত কোনো সন্ত্রাসী হামলা হয়, সরকার তাড়াহুড়ো শুরু করে কারো না কারো ওপর দোষরোপ করার জন্য। এই উদোর পিণ্ডি চাপিয়ে দেওয়া হয় কখনো অল্প কিছু তদন্ত সাপেক্ষে, কখনো তদন্ত ছাড়াই। ২০০২-এর ফেব্রুয়ারিতে গোধরার সবরবতী এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা, কিংবা ২০০১-এর ডিসেম্বরে পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণ কিংবা ২০০০ সালের মার্চে কাশ্মীরের ছত্তিসিংপরাতে তথাকথিত সন্ত্রাসী হামলায় ব্যাপক শিখ নিধন– এগুলো সবই সাড়া জাগানো ঘটনার সামান্য উদাহরণ মাত্র। (সেনাবাহিনী পরবর্তীতে যেসব তথাকথিত 'সন্ত্রাসী'দের হত্যা করে, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকেই নির্দোষ মানুষ হিসেবে প্রমাণিত হয়। যদিও পরবর্তীতে রাজ্য সরকার স্বীকার করেছে যে, ডিএনএ টেস্টে ভুয়া রক্তের নমুনা জমা দেওয়া হয়েছিল।[১] এই ঘটনাগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই শেষ অব্দি যে প্রমাণাদি মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়, সেগুলোতে এই জাতীয় ঘটনায় আমাদের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। অথচ এর পরপরই এ ঘটনাগুলোকে হিমাঘারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। গোধরার উদাহরণটাই ভেবে দেখা যাক। যে মুহূর্তে এটা ঘটল, তখনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন যে, এটা আইএসআই-এর একটি পরিকল্পনা। ভিএইচপি বলল, ট্রেনে পেট্রোল বোমা ছুড়ে মেরেছে উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান জনতা।[২]

গুরুতর প্রশ্নগুলো অমীমাংসিতই রয়ে গেল। এখানে ছিল সব ধারণাপ্রসূত কিছু সন্দেহ মাত্র। এ ঘটনায় সবাই সেই জিনিসটাই বিশ্বাস করছিল, যেটা তারা তাদের মনের ভেতরে প্রতিপন্ন করেছিল। যদিও ঘটনাটিকে খুব ন্যাক্কারজনকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার জন্ম দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণকে কেন্দ্র করে প্রচুর মিথ্যা এবং ভুল তথ্যের অবতারণা করেছিল যাতে তারা একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে, অথবা একটি রাষ্ট্র জবরদখল করে নিতে পারে। কিংবা দুটো– একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আরো কতো রাষ্ট্র তারা এর মাধ্যমে কব্জা

করতে চায়। ভারত সরকারও একই কৌশল গ্রহণ করেছে। তবে সেটা অন্য দেশের বিরুদ্ধে নয়, তার নিজের জনগণের বিরুদ্ধেই।

গত এক দশকে নিরাপত্তাবাহিনী, সেনাবাহিনী এবং পুলিশের হাতে যত মানুষ নিহত হয়েছে– তাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের কাছে মুম্বাইয়ের কিছু পুলিশ সদস্য খোলামেলাভাবেই স্বীকার করেছেন যে, শুধুমাত্র তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের 'নির্দেশে' তথাকথিত 'সশস্ত্র সন্ত্রাসী'দের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।[৩]

যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকার এক বছরেই প্রায় দুই শ' 'চরমপন্থী'কে তথাকথিত 'এনকাউন্টারে' হত্যা করেছে।[৪]

কাশ্মীরে অবস্থা এমন যে সেটাকে প্রায় যুদ্ধকালীন অবস্থা বলা যেতে পারে। হিসাব করে জানা গেছে যে, ১৯৮৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সেখানে প্রায় ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কেবলমাত্র 'নিখোঁজ' হয়ে গেছে হাজার হাজার মানুষ।[৫]

এসব নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারদের নিয়ে গঠিত সঙ্ঘ (এপিডিপি)-এর হিসাব অনুযায়ী শুধুমাত্র ২০০৩ সালেই তিন হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে– যাদের মধ্যে ৪৬৩ জন সৈন্য ছিল।[৬]

এ সমস্যা নিরাময়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ২০০২ সালের অক্টোবরে মুফতি মোহাম্মদ সাঈদ ক্ষমতা গ্রহণ করে। এপিডিপি-এর মতে, সে সময় ৫৪ জনের মৃত্যু ঘটে নিরাপত্তা হেফাজতে।[৭]

এখনকার এই উগ্র জাতীয়তাবাদের সময়টাতে যখনই কোনো 'মানুষ'– যারা এ সময় নিহত হচ্ছে– তাদের কপালে যদি এই লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হয় যে, হয় তারা ছিলেন সন্ত্রাসী কিংবা উচ্ছৃঙ্খল যুবক অথবা অনুপ্রবেশকারী নতুবা চরমপন্থী– তাদের হত্যাকারীরা খুন জায়েজ করার ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে চলতে পারে। যেন তারা ধর্মযোদ্ধা, যেন তারা জাতির স্বার্থে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং তারা বাধ্য নয় কারো কাছে কোনো জবাবদিহি করতে। ব্যাপারটা যদি সত্যও হতো (যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়টা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যা) যে, প্রতিটি নিহত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই সন্ত্রাসী বা কোনো সন্ত্রাসীবাহিনীর সদস্য কিংবা অনুপ্রবেশকারী অথবা চরমপন্থী– তা হলে এটা আমাদের সামনে এই চিত্রই তুলে ধরে যে, আমাদের সমাজব্যবস্থার কোথাও নির্মম কোনো ভুল রয়ে গেছে; যে ভয়াল ভুল এত বেশি লোককে এ ধরনের একটি চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করছে।

ভারতের জনগণকে হয়রানী করা বা সন্ত্রাসী হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রবণতা

সুনির্দিষ্ট। তাই সরকারী ব্যয় সংকোচনের যেসব কথা বলা হয়ে থাকে সেটার জন্যও এটা বেশ ফলপ্রসূ।

২০০৪-এর মার্চে পোটা আইনের বিরুদ্ধে যে গণ-আদালত গঠন করা হয়েছিল আমি তার একজন সদস্য ছিলাম।[১৩]

দুই দিনের বেশি সময় ধরে আমরা বহুলোকেরই মর্মবিদারী প্রামাণ্য সাক্ষী শুনেছিলাম যেটা আমাদের বিস্ময়কর গণতন্ত্রের প্রকৃতরূপ উন্মোচিত করছিল। আপনাদেরকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমাদের পুলিশ স্টেশনে এই গণতন্ত্রের অর্থ যে কোনো কিছুই হতে পারে : সেটা হতে পারে কাউকে জোরপূর্বক মূত্রপান করতে বাধ্য করা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলাসহ নানা ভাবে অবমানিত করা, বিদ্যুতের শক দেওয়া, কিংবা সিগারেটের টুকরো দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া অথবা লোহার রড তাদের পায়ুপথে ঢুকিয়ে দেওয়া, কিল ঘুষি লাথি দিয়ে পিটিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

সমগ্র দেশেই শত শত মানুষকে, যার ভেতরে অল্পবয়সী শিশুরাও রয়েছে, পোটা আইনের আওতায় বন্দী করা হয়েছে। তাদেরকে জামিন না দিয়ে অন্তরীণ করা হয়েছে বিশেষ পোটা আদালতে বিচারের অপেক্ষায়। এ বিচারকাজ জনগণের সামনে সম্পন্ন করা হয় না। পোটা আইনের আওতায় যারা দোষী সাব্যস্ত হয়, তাদের একটি বড় অংশ দুটো অপরাধের অবশ্যই একটি করেছে। হয় তারা দরিদ্র– বিশেষ করে দলিত বা আদিবাসী, অথবা তারা মুসলমান। আমাদের ফৌজদারি আইনের যে সাধারণ গ্রহণযোগ্য আদর্শ আছে, অর্থাৎ: একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দোষ যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতে তার অপরাধ প্রমাণিত না হয়; পোটা সেই দর্শন বা আদর্শকে উল্টিয়ে দিয়েছে। পোটা আইনের আওতায় আপনি জামিনের অধিকার রাখেন না, যতক্ষণ না আপনি নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন যে আপনি নির্দোষ। আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে সেই সব অপরাধের বিরুদ্ধে, যেটা আপনি তখন পর্যন্ত অফিশিয়ালি জানেনই না যে, কোন অপরাধের কারণে আপনাকে বিচারের সম্মুখিন করা হচ্ছে। অর্থাৎ, অনিবার্যভাবেই আপনার কী অপরাধ সেটা আপনার জানা না থাকলেও আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি নির্দোষ। এবং এটা আমাদের সবার ওপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ আইনের ভাষায়, আমরা এমন একটি জাতি যাদের প্রত্যেকেই যে কোনো সময় অভিযুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছি।

এটা অসম্ভব মুর্খতার পরিচয় হবে যদি আমরা ধরে নিই যে পোটা আইনকে অপব্যবহার করা হচ্ছে। বরং এটা ঠিক তার উল্টো। এ আইন যে উদ্দেশ্যে জারি

করা হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে এটি সেই সব কারণেই ব্যবহার করা হচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই 'মালিমাথ কমিটি'র যে সব নতুন সুপারিশমালা রয়েছে, সেগুলোকে যদি বাস্তবায়ন করা হয় তবে পোটা আইনটি 'অনাবশ্যক' হিসেবে বিবেচিত হবে। 'মালিমাথ কমিটি' সুপারিশ করেছে যে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ যে ফৌজদারি আইন রয়েছে সেগুলোকে পোটা আইনের যে সব ধারা রয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা দরকার।[১৪]

তখন আর কোনো অপরাধী আমাদের মধ্যে থাকবে না। থাকবে শুধু সন্ত্রাসীরা। এটাই আমাদের নির্জলা ফলাফল।

বর্তমানে জম্মু এবং কাশ্মীর এবং অনেক উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে সামরিক বাহিনীর হাতে 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট' বা বিশেষ ক্ষমতা আইন দিয়ে রেখেছে ভারত। শুধু অফিসারদেরই নয়, বরং তাদের জুনিয়র অফিসার, কমিশনড এবং নন-কমিশনড অফিসারকেও এ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে যে, তারা সন্দেহের বশে যে কারো ওপর যেকোনো প্রকার বল প্রয়োগ করতে পারে (এমন কি হত্যাও করতে পারে)। কেউ অস্ত্র বহন করছে অথবা সাধারণ জনশৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো কাজ করতে পারে– এ জাতীয় সন্দেহের বশেই তারা যে কাউকে হত্যা করতে পারে।[১৫]

কী অদ্ভুত! শুধু 'সন্দেহের বশবর্তী' হয়ে! ভারতে যারা বসবাস করে তাদের কেউই এখন আর এই স্বপ্ন দেখতে পারে না যে, এটা তাদেরকে আসলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? বিভিন্ন নির্যাতনের যেসব উদাহরণ বা ঘটনাসমূহের প্রমাণাদি আমরা আজকাল দেখতে পাচ্ছি– নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু, ধর্ষণ কিংবা গণধর্ষণের মতো ঘটনা (নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারাই) আপনার রক্তে হিম ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এগুলোই যথেষ্ট। এতকিছুর পরেও, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এবং নিজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ভারত এখনো তার সুনাম ধরে রেখেছে একটি আইনানুগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে– এটা এক বিস্ময়কর বিজয়। ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ওপর প্রয়োগ করার জন্য ১৯৪২-এর ১৫ আগস্ট লর্ড লিনলিথগোর জারি করা অধ্যাদেশ থেকেও 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট' অধিকতর নিষ্ঠুর রূপ। ১৯৫৮ সালে লর্ড লিনলিথগোর জারি করা অধ্যাদেশটি প্রয়োগ করা হয়েছিল মণিপুর রাজ্যের কিছু অংশের ওপর, যেটাকে তখন গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৫ সালে সমগ্র মিজোরাম এবং আসাম রাজ্যের কিছু অংশকে 'গোলযোগপূর্ণ' ঘোষণা দিয়ে এ আইনের আওতায় আনা হয়। এরপর ১৯৭২ সালে ত্রিপুরাতে এর পরিধি বিস্তৃত

করা হয়। এবং ১৯৮০-তে মণিপুর রাজ্যের সমগ্রটাই 'গোলযোগপূর্ণ' অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১৬]

কারো এটা উপলব্ধি করার জন্য এর থেকে আর কত বেশি প্রমাণ প্রয়োজন হয় যে, দমনমূলক পদক্ষেপ সবসময়ই বিপরীত ফল বয়ে আনে এবং সমস্যাকে আরো বাড়িয়েই তোলে?

জনগণের ওপর বলপ্রয়োগ বা নির্মূল করার এই উদগ্র বাসনা সরকারের রয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে যেটা ধরা পড়ে না, তার সঙ্গে যখন সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আমরা দেখি সরকারের প্রায় সুপ্ত অনিচ্ছা রয়েছে সেই সব মামলা তদন্তের আওতায় এনে বিচারের সম্মুখিন করার– যেগুলো মামলায় আনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণেই প্রমাণাদি রয়ে গেছে। যেমন ধরা যাক, ১৯৮৪ সালে দিল্লিতে তিন হাজারেও বেশি শিখ মেরে ফেলা কিংবা ১৯৯৩-তে মুম্বাইতে এবং ২০০২ সালে গুজরাটে মুসলমান গণহত্যা। (এসব ঘটনার কোনোটাতেই এখন পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি)। কয়েক বছর আগের চন্দ্রশেখর প্রসাদের হত্যাকাণ্ড (যে ছিল জওহরলার নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি) এবং ১২ বছর আগের ছত্তীশগঢ়ের মুক্তিমোর্চার শংকরগুহ নিয়োগীর হত্যাকাণ্ডের বিচার সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র।[১৭]

একটি সরকারের সম্পূর্ণ প্রশাসন-যন্ত্র তোমার বিরুদ্ধে জড়ো হলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণী এবং বিভিন্ন ধরনের বিপুল প্রমাণাদিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না।

ইতিমধ্যে অর্থনীতিবিদরা কর্পোরেট-সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় এই মর্মে তাঁদের আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করছেন যে, আমাদের জিডিপি-এর প্রবৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব উন্নতির দিকে যা এর আগে কখনো ঘটেনি। দোকানগুলোতে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উপচে পড়ছে, সরকারী গুদামঘরগুলো খাদ্যশস্যে ভরপুর এবং এই উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার পাশে আমাদের কৃষকরা ঋণের ভারে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে এবং কেউ কেউ একপর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।[১৮]

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিয়তই অনাহার এবং অপুষ্টির অসংখ্য প্রতিবেদন আমাদের কাছে আসে। তা সত্ত্বেও, সরকার ছয় কোটি ৩০ লাখ টন খাদ্যশস্য নিজস্ব গুদামঘরেই পচে যেতে দিল।[১৯]

এক কোটি ২০ লাখ টন খাদ্যশস্যকে রফতানি করা হয়, কিংবা ভর্তুকিমূল্যে বিক্রয় করা হয় যা ভারত সরকার নিজের গরীব জনগণকে দেওয়ার মানবিক মানসিকতা রাখে না।[২০]

উৎসা পট্টনায়েক, যিনি বহুল পরিচিত একজন কৃষি অর্থনীতিবিদ, অফিশিয়াল পরিসংখ্যানে হিসাব করে দেখিয়েছেন– ভারতে খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতার তুলনায় তা খাওয়ার পরিমাণ গত এক শ' বছরের মধ্যে প্রায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে। তিনি ১৯৯০ ও ২০০১ সালের খাদ্যশস্য গ্রহণের মাত্রা হিসাব করে দেখান যে, এর পরিমাণ বর্তমানে এতোটা নিচে নেমে এসেছে যা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ের অবস্থার চেয়েও খারাপ। এমনকি যে সময়টায় অত্যন্ত পরিচিত বাংলার-দুর্ভিক্ষ হয়েছিল– যার ফলে ৩০ লাখেরও বেশি লোক না খেয়ে মারা গিয়েছিল, বর্তমান খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতা তার চেয়েও নিচে।[২১]

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনাহারে মৃত্যুর খবরকে গণতন্ত্র খুব উদারভাবে গ্রহণ করে। কেননা, 'মুক্ত প্রকাশ'-এর মাধ্যমে এটা বিরুদ্ধপ্রচারকে খুব বেশি আক্রমণ করে।[২২]

সুতরাং, অনাহার, খুব বিপর্যয়কর অপুষ্টির মাত্রা এবং স্থায়ী হয়ে ওঠা নিরন্তর ক্ষুধার জ্বালায় এখনকার দিনের পছন্দের মডেল। তিন বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৪৭ শতাংশেরও বেশি ভারতীয় শিশু ন্যূনতম খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভোগে; ৪৬ শতাংশ শিশুর শারীরিক বিকাশ ব্যাহত হয়।[২৩]

উৎসা পট্টনায়েকের এই গবেষণায় ফল পাওয়া যায় যে, ভারতের গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করে ঠিক যেমনটি দেখা যায় আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে।[২৪]

১৯৯০ সালে গ্রামীণ পরিবার বছরে গড়ে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতো, তা আজকের দিনে প্রায় ১০০ কিলোগ্রামের মতো কমে গেছে।[২৫]

তবে ভারতের শহরাঞ্চলের যেখানেই আপনি যাবেন– দোকান, রেস্তোরাঁ, রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, জিমনেশিয়াম, হাসপাতাল– সবখানেই আপনি টেলিভিশন মনিটর দেখতে পাবেন, যেখানে ফুটে উঠছে– নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অবশেষে বাস্তবরূপ লাভের চেহারা। ভারত এখন ঝকঝকে চকচকে হয়েছে এবং আমরা সবাই আনন্দ অনুভব করছি। এই ভালো অনুভূতি পেতে হলে আপনার শুধু দরকার নিজের শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ রাখা, যাতে কোনো সাধারণ মানুষের পাঁজরের ওপরে পুলিশের বুট মাড়িয়ে যাওয়ার পীড়াদায়ক শব্দ আপনার কানে প্রবেশ করতে না পারে। এর সঙ্গে আপনার চোখ সরিয়ে রাখতে হবে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অত্যাচারিদের ওপর থেকে, বস্তিজীবনের ওপর থেকে, বিপর্যস্ত মানুষের ওপর থেকে– যারা উদ্বাস্তু হয়ে ফুটপাথের ওপর পড়ে আছে। আপনাকে দেখতে হবে একটি বন্ধুপ্রতীম টেলিভিশন মনিটর, যার হাত ধরে আপনি একটি অপার সুন্দর

জগতে চলে যাবেন। সে জগতে আছে বলিউডের প্রায় স্থায়ী হয়ে ওঠা কোমর দোলানো উত্তাল নাচগান এবং চিরস্থায়ীভাবে সুবিধাভোগী সুখী ভারতীয়রা– যারা ভারতের তিন রঙা পতাকা উড়িয়ে বেড়ায় এবং ভালো অনুভব করে। এটা কাউকে বলা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে যে, কোনটা আসলে বাস্তব জগৎ আর কোনটাই বা কল্পলোক। 'পোটা'র মতো আইনগুলো এখন পরিণত হয়েছে টেলিভিশন চ্যানেলের একটি বোতামের মতোই। আপনি এই আইনটিকে ব্যবহার করতে পারেন একটি বোতাম টিপে সুইচ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, যেখানে গরীব অনাকাঙ্খিত দুস্থ মানুষদের ওপর থেকে সহজেই মুখ সরিয়ে নেওয়া যায়।

ভারতে আজকাল নতুন এক ধরনের আগ্রাসী আন্দোলন শুরু হয়েছে। এটা কি আমরা নব্য আগ্রাসন বলতে পারি? এটা তখনই ঘটে যখন কিছু জনগণের প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি অর্থনৈতিক কাঠামো রয়েছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দেশ এবং একটি সম্পূর্ণ আলাদা গ্রহ রয়েছে– অথচ তারা ভান করে যে তারা এর অংশ। এটা হচ্ছে সেই ধরনের আগ্রাসন যাতে তুলনামূলকভাবে জনগণের ছোট একটি অংশ– যে কোনো কিছু ভোগদখলের মাধ্যমে বিপুল ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়। এসব ভোগদখল হতে পারে অবশিষ্ট বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ভূমি, নদী, জল, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সম্মান, মৌলিক অধিকার এবং প্রতিবাদ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে। এটা এক ধরনের খাড়া বা উলম্ব আগ্রাসন। এটা কোনো আনুভূমিক আগ্রাসন নয়– যা মূলত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর চালানো হয়। এটাই হচ্ছে সেই ব্যবস্থাগত সমন্বয়– যার মাধ্যমে ঝাঁ চকচকে ভারতকে একটি সাধারণ ভারত থেকে আলাদা করা যায়। এটাই হচ্ছে ভারতের প্রাইভেট লিমিটেড, যেটা ভারতের মূল জনগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন একটা কিছু।

এটাই সেই ধরনের আগ্রাসন যাতে জনগণের উন্নয়নের জন্য তৈরি করা ভৌতকাঠামো, তাদের উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় সম্পদ– যেমন: জল, বিদ্যুৎ, যাতায়াত ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ, এবং ভারতের যেকোনো রাষ্ট্রীয় সম্পদ– যা জনগণের পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে সরকারের সংরক্ষণ করার কথা ছিল এবং যেসব সম্পদ এতদিন জনগণের অর্থের বিনিময়ে দশকের পর দশক রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো, সেগুলি এখন সরকারের পক্ষ থেকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারী কর্পোরেশনের কাছে। ভারতে ৭০ শতাংশেরও অধিক মানুষ, প্রায় ৭০ কোটি লোক গ্রামে বসবাস করে।[২৬]

প্রকৃতিক সম্পদ এবং তা ব্যবহার করার ওপর নির্ভর করে এই গ্রামীন জনগণের জীবনযাত্রা যুগের পর যুগ বেঁচে রয়েছে। তাদের সুষ্ঠুভাবে বাঁচার সে

অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এবং সেগুলিকে মজুদ আকারে প্রাইভেট কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল সেটা এখন চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। এর ফলে এসব গ্রামীণ জনগণগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে সহায় সম্পদ খুইয়ে গৃহহীন এবং অধিকতর নির্মম দারিদ্র্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে।

ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বেশ ভালো মতোই তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে– যেখানে এর মালিকানা থাকবে অল্প কিছু কর্পোরেশনের হাতে এবং বড় অংশ থাকবে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে। এবং এসব কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরাই এক পর্যায়ে সমগ্র দেশটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে– এর অবকাঠোমো, এর সম্পদসমূহ, এর মিডিয়া এবং তার সাংবাদিকদেরকেও। এবং জনগণের কাছে এদের কোনো দায়বদ্ধতাও থাকবে না। আইনগত, সামাজিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক– সব দিক থেকেই এরা সম্পূর্ণভাবেই জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। যারা এরকম বলে যে ভারতের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিইও বা প্রধান নিবর্হী ক্ষমতার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও অধিক শক্তিধর– তারা আসলে ভালো করেই জানেন তারা প্রকৃতপক্ষে কী বোঝাতে চাচ্ছেন।

এ ধরনের ঘটনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য যা আছে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেও, এমন কি এখানে যা ছিল যদি তেমনভাবেই সব হতো (যদিও এটাই সব নয়)– এই অভূতপূর্ব, অত্যন্ত দক্ষ এবং বিস্ময়কর রাজনীতিই কি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য? যদি ভারত সরকার তার সকল দায়দায়িত্ব মুষ্টিমেয় কিছু কর্পোরেশনের হাতে বন্ধক রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে কি তা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, গণতন্ত্রের যে নাট্যমঞ্চ– সেটা সম্পূর্ণরূপেই অর্থহীন? নাকি এখনো কিছু অবদান রাখার অবস্থা এর আছে?

'মুক্তবাজার' (যেটা আসলে 'মুক্ত' হওয়া থেকে এখনো বহু দূরে রয়েছে)-এর জন্য প্রয়োজন একটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, এবং সেটা খুব তীব্রভাবেই প্রয়োজন। কেননা, ধনী এবং গরীবের মধ্যে যে বৈষম্য সেটা দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে দিন দিনই বেড়ে চলেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রকেই সেখানে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিভেদরেখা হিসেবে কাজ করতে হয়। কর্পোরেশনগুলো সবসময়ই অকল্পনীয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের 'কাঙ্খিত বাণিজ্যিক বোঝাপড়া' করতে চায়। তারা এসব বাণিজ্যিক বোঝাপড়া বা সমঝোতা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কখনই বাস্তবায়ন করতে পারতো না যদি সেসব দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ না থাকতো। আজকের দিনে কর্পোরেট বিশ্বয়ানের জন্য প্রয়োজন একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘ হবে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর একটি অনুগত ও বিশ্বাসী, দুর্নীতিপরায়ণ, এবং সম্ভব হলে

একনায়কতন্ত্রিক সরকারব্যবস্থা। এর মাধ্যমে তারা অজনপ্রিয় সংস্কারগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং যেকোনো ধরনের বিরুদ্ধমতকে নিশ্চিহ্ন এবং বাকরুদ্ধ করে দিতে পারে। আর এটাকেই বলা হয়ে থাকে– 'বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা'।

ভোটপ্রদানে সময় আমরা শুধু পছন্দ করতে পারি, কোন রাজনৈতিক দলকে আমরা দায়িত্ব প্রদান করবো, যারা আমাদের ওপর শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে, অত্যাচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

এই মুহূর্তে ভারতে উদার পুঁজিবাদ ব্যবস্থা এবং সাম্প্রদায়িক নব্যউগ্রতাবাদ নামের দুটি বিপজ্জনক স্রোতের মধ্যে সমঝোতা বা দরদস্তুর চলছে। যেহেতু পুঁজিবাদ বৈশ্বিক পর্যায়ে এখনো তার সকল আকর্ষণ শেষ করে ফেলেনি, ফলে ফ্যাসিজম বা উগ্রবাদ শব্দের ব্যবহার অনেকেই আহত করতে পারে। সুতরাং আমরা অবশ্যই নিজেদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি– আমরা কি আসলে এই শব্দ খুব হালকাভাবে ব্যবহার করছি? আমরা কি আমাদের বর্তমান অবস্থাকে খুব বেশি অতিরঞ্জিত করে ফেলছি? আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রতিনয়িত আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি সেগুলি কি আসলেই ফ্যাসিজমের সংজ্ঞায় পড়ে?

যখন একটি সরকার কমবেশি খোলামেলাভাবেই এর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি কর্মকাণ্ড বা ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করে যেখানে দুই হাজারেও বেশি মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়, তখন সেটাকে কি ফ্যাসিবাদ বলা যায়? যখন সেসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই একজন মহিলাকে জনসম্মুখে ধর্ষণের পর জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, তখন সেটাকে কি ফ্যাসিবাদ বলা যায়? যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পারস্পরিকভাবে ষড়যন্ত্রে মিলিত হয় যাতে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা না হয়, সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন দেড় লাখ মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়, একঘরে করে ফেলা হয় বা ক্যাম্পে আটকে রাখা হয় এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়, সেটা কি ফ্যাসিবাদ? সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর যেসব সদস্য দেশব্যাপী উগ্র প্রপাগাণ্ডা চালায় আর তাদের যখন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, (অ)বিনিয়োগ মন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা জানানো হয়, সেটা কি ফ্যাসিবাদ? একজন চিত্রকর বা লেখক বা বুদ্ধিজীবী বা একজন চলচ্চিত্রকর যখন প্রতিবাদ করেন এবং এর ফলে তাঁদের চিত্রকর্মকে পুড়িয়ে ফেলা হয়, বই বা ছবিকে নিষিদ্ধ করা হয়, তখন সেটাকে কি ফ্যাসিবাদ বলা যায়?[২১] স্কুলের ইতিহাস পাঠবইয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করার আদেশ জারি করে, সেটা ফ্যাসিবাদ নয়?

যখন দাঙ্গাবাজরা বিভিন্ন সুপ্রাচীন নথিপত্রের ভাণ্ডার পুড়িয়ে ফেলে, যখন প্রতিটি সংখ্যালঘু রাজনীতিবিদদের মধ্যযুগের পেশাদার ইতিহাসবিদ এবং পুরাতত্ত্ববিদ হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং যখন উচ্চমানসম্পন্ন মেধাবৃত্তিগুলোকে ভিত্তিহীন লোকরঞ্জনবাদী দাবিতে এইসব জঞ্জাল দিয়ে ভর্তি করা হয়, তাকে কি তখন ফ্যাসিবাদ বলা যায়?[২৮] যখন হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, অস্ত্রবাজ এবং দাঙ্গাবাজদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন জানায় রাজনৈতিক দলগুলো। আর অনুগত বুদ্ধিজীবীরা এটাকে ঘোষণা করে যথাযথ প্রতিক্রিয়া হিসেবে– যা হয়তোবা সত্য অথবা মনগড়া কোনো ঐতিহাসিক ভুল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে, যা করা হয়েছিল কয়েক শতাব্দী আগে– এটাকে কি ফ্যাসিবাদ বলা যায়? যখন মধ্যবিত্ত সমাজ অথবা অবস্থাসম্পন্ন মানুষেরা কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায়, একটুখানি ভেবে দেখতে চেষ্টা করে এবং তারপর আগের মতোই জীবনযাপনের গড্ডলিকায় নিজেদের ভাসিয়ে দেয়– এটা কি ফ্যাসিজম? যখন একজন প্রধানমন্ত্রীকে, যার নেতৃত্বে এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ঘটতে পেরেছে, প্রশংসিত করা হয় একজন চমৎকার রাষ্ট্রনায়ক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা হিসেবে, আমরা কি তখন ফ্যাসিবাদের চরম স্তরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছি না?

এই ধরনের অত্যাচারিত এবং পরাভূত জনগণের যে ইতিহাস রয়ে গেছে, এর বড় একটি অংশই ঘটনাপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যা 'সবর্ণ হিন্দু'দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর পুরোটাই এক ধরনের নির্লিপ্ততা। যদি কোনো ঐতিহাসিক ভুল আচরণের প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের একটি পছন্দের কর্মপন্থা হয়ে থাকে, তা হলে কি ভারতের আদিবাসী ও দলিত হিন্দুদেরও অস্ত্রবাজি অথবা যে কোনো ধরনের তাণ্ডবলীলার অধিকার তৈরি হবে?

রাশিয়াতে প্রচলিত কথা হলো, অতীতকে আগে থেকে অনুমান করা যায় না। ভারতবর্ষে আমাদের সাম্প্রতিক যে অভিজ্ঞতা হলো ইস্কুলের ইতিহাস বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বিকৃতির মাধ্যমে, আমরা এখন বুঝতে পারি কথাটি কতোটা সত্য। এখনকার দিনে আপাতদৃষ্টিতে 'ধর্মনিরপেক্ষবাদী' সবারই মনোভাবটা এরকম– তাঁরা খুব বেশি হলে এটুকু আশা করতে পারে যে, একজন পুরাতত্ত্ববিদ হয়তোবা বাবরি মসজিদের তলদেশ খনন করে কোনো রাম মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। কিন্তু যদি এটা সত্য হতো যে, ভারতের প্রতিটি মসজিদের নিচে একটা মন্দির রয়ে গেছে, তবে সেই মন্দিরের নিচে কি ছিল? সম্ভবত আরেকটা হিন্দু দেবতার অন্য একটি মন্দির। অথবা একটি বৌদ্ধ মন্দির। এবং খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে সেটি কোনো আদিবাসী ধর্মীয় পীঠস্থান হওয়ার। ইতিহাসের চাকা সবর্ণ হিন্দুত্ববাদ

থেকেই শুরু হয়নি, তাই নয় কি? কতোটা গভীরে তা হলে আমরা যাবো? কত কিছু আমরা ওলট-পালট করে দেখবো? একজন মুসলমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে আমাদেরই ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাকে কেন হঠাৎ বহিরাগত এবং জবরদখলকারী হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে? সেই সব দেশের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেট লেদদেন এবং উন্নয়ন সাহায্যের জন্য বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সরকার ব্যস্ত, যারা আমাদেরকে উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। ১৮৭৬ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের লাখ লাখ মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তখনো খাদ্যশস্য ও শিল্পের কাঁচামাল ইংল্যান্ডে রফতানি করেই যাচ্ছিল। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, মানুষের এই মৃত্যুর সংখ্যা এক কোটি ২০ লাখ থেকে দুই কোটি ৯৩ লাখের মতো ছিল।[২৯] এটাতে এটাই প্রতীয়মান হতে পারে যে, আমাদের রাজনীতির কোনো একটি জায়গায় প্রতিশোধ নেওয়ার একটি ব্যাপার রয়ে গেছে। তাই হওয়াই কি স্বাভাবিক ছিল না? নাকি আমাদের প্রতিশোধগুলো তাদের বিরুদ্ধেই যারা এমনিতেই দুর্বল এবং যাদেরকে সহজেই শিকার করা যায়?

একটি সফল ফ্যাসিবাদের জন্য যথেষ্ট নিষ্ঠা দরকার। এবং একই নিষ্ঠার দরকার বিনিয়োগের একটি ভালো পরিবেশের জন্য। এই দুটো কি এক সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ঠিকঠাক মতো চলতে পারে? ঐতিহাসিকভাবেই, কর্পোরেশনগুলো ফ্যাসিবাদ থেকে লজ্জা পেয়ে দূরে সরে যায়নি। সিমেন্স, আই.জি. ফারবেন, বায়েল, আইবিএম এবং ফোর্ডের মতো কর্পোরেশনগুলো নাৎসি সরকারের সঙ্গেও ব্যবসা করেছিল।[৩০] আর আমাদের সামনে তো আরো সাম্প্রতিক উদাহরণ রয়ে গেছে। আমাদের নিজস্ব 'কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ড্রাস্ট্রি' (সিআইআই) নির্লজ্জভাবে ২০০২ সালের গুজরাট সরকারের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিল।[৩১]

যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বাজার উন্মুক্ত, নিজের ঘরের ছোটখাট ফ্যাসিবাদ একটি লাভজনক ব্যবসায়িক সমঝোতার পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

এটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে, মাত্র কয়েক বছর আগে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের বাজারকে নব্য-উদারতাবাদের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিলেন মাত্র। লালকৃষ্ণ আদভানি তার প্রথম রথযাত্রা শুরু করেছিলেন যেটা সাম্প্রদায়িক আবেগকে উসকে দিচ্ছিল এবং আমাদেরকে নব্য ফ্যাসিবাদের জন্য প্রস্তুত করছিল।[৩২] ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে উচ্ছৃঙ্খল জনতা বাবরি মসজিদকে ধূলিস্যাত করে, ১৯৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার 'এনরন'-এর সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি

ক্রয়ের চুক্তিস্বাক্ষর করে। এটা ছিল ভারতের প্রথম বেসরকারি পাওয়ার প্রজেক্ট। এনরনের সেই চুক্তি পরবর্তীতে ধ্বংসাত্মক হিসেবে চিহ্নিত হলেও এটাই ভারতের নব্য প্রাইভেটাইজেশন যুগের সূচনা করে।[৩৩]

এখন কংগ্রেস যদিও দর্শকসারিতে বসে ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছে যে, বিজেপি বলপূর্বক তাদের হাত থেকে শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছে। সরকার এখন উভয় হাতে অসাধারণ কিছু ভিন্ন সুরের সংগীতযন্ত্র বাজিয়ে যাচ্ছে। এক হাতে সে ব্যস্ত পুরু পুরু খণ্ড ধরে জাতির সম্পদগুলো বিক্রয়ের কাজে, অন্য হাতে সে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার সূচারু কাজটি করছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের যে সমবেত স্বর রয়েছে তাকে কোণঠাসা করছে, হুঙ্কার দিচ্ছে ভিন্ন পথে নেওয়ার। এই বর্বর প্রক্রিয়া সরাসরি উন্মাদনা সৃষ্টির অন্যান্য প্রক্রিয়াকে সরাসরি ইন্ধন জোগান দেয় যা ঘৃণা প্রকাশেরও অযোগ্য।

অর্থনৈতিকভাবেও এই দ্বৈত কর্মযজ্ঞের কৌশল একটি কার্যকরী মডেল। ব্যাপকভাবে এক নাগাড়ে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা (এবং ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত থেকে সম্ভাব্য উপার্জনের কিছু অংশ) পাওয়া যায়, তার একটি অংশ এই হিন্দুত্ববাদী বিশাল সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন পরিচালনার কাজে ব্যয় করা হয়। অঙ্গসংগঠনগুলো হলো– আরএসএস, ভিএইচপি, বজরং দল, এ ছাড়াও আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং ট্রাস্টি বোর্ড যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ইস্কুল হাসপাতাল এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। দেশ জুড়ে এদের ১০ হাজারেরও বেশি শাখা প্রশাখা রয়েছে। নিরন্তর দারিদ্র এবং কর্পোরেট বিশ্বয়ানের প্রকল্পের ফলে ভিটেমাটি উচ্ছেদ হওয়া জনগণের মধ্যে যে অপ্রতিরোধ্য হতাশাবোধ তৈরি হয়, এবং তার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় এ জাতীয় ঘৃণা-জিঘাংসার শিক্ষা সেটা তখন গরীবের ওপর গরীবের সহিংসতাতেই ইন্ধন জোগায়। এটাই একটা নিখুঁত ধোঁয়াটে পর্দা যেটা ক্ষমতার মূল বলয়কে স্পর্শের বাইরে অপ্রতিরোধ্য রাখে।

জনগণের এই হতাশাবোধকে একটি সহিংসতার দিকে ধাবিত করাটাও সবসময় যথেষ্ট হয় না। 'একটা ভালো বিনিয়োগযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি' করার জন্য কখনো কখনো রাষ্ট্রকেই সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হয়। সাম্প্রতিক কালে পুলিশ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পুনঃপুনই গুলিবর্ষণের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। এমনই একটি ঘটনা ঘটে মূলত নিরস্ত্র আদিবাসীদের ওপর, এবং সেটা ছিল শান্তিপূর্ণ একটি মিছিলের ওপর। যেমনটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের নাগারনারে, মধ্য প্রদেশের মেহন্দী খেদায়, গুজরাটের উমেরগাঁ-এ, ওড়িশার রায়াগাদা ও চিলিকাতে, কেরালার

মুথানগাতে। বনাঞ্চলে প্রবেশের দায়ে সাধারণ জনগণকে হত্যা করা হয়েছে। বাঁধ, খনিজ সম্পদ আহরণ, ইস্পাত কারখানা তৈরির কর্মকাণ্ড থেকে বনভূমিকে রক্ষার আন্দোলনের কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। জাম্বুদ্বীপে, বাংলায়, ওড়িশার মাইকাঞ্জ গ্রামে এ ধরনের অত্যাচার চলছেই। এবং পুলিশের গুলবর্ষণের প্রায় প্রতিটি ঘটনাতেই যাদের গুলি করে মারা হয়েছে তাদের অভিহিত করা হয়েছে সশস্ত্র প্রতিরোধকারী হিসেবে।[৩৪]

যখন এ ধরনের অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সেই ধরনের ক্ষতির সম্মুখিন হতে চায় না, তখনই তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং তাদের সঙ্গে তেমনটাই আচরণ করা হয়। 'পোটা' হচ্ছে সেই ধরনের সুবিস্তৃত অ্যান্টিবায়োটিক যেটা প্রয়োগ করা হয় সেই সব অসুস্থ রোগীদের ওপরে যাদের মধ্যে মতপার্থক্য বা বিরোধিতা করার রোগ রয়ে গেছে। এ ছাড়াও, এর বাইরে আরো সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়মিত নেওয়া হচ্ছে। যেমন আদালতের রায়ের মাধ্যমে মুক্তবুদ্ধি চর্চার অধিকার, আন্দোলন করার অধিকার, জীবন এবং জীবিকার অধিকার ব্যাপকভাবেই সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে।

এ বছর জাতিসংঘে প্রায় ১৮০টি রাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য ভোট দিয়েছে, বিশেষ করে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের বর্তমান সময়টাতে। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রও এই বিবৃতির পক্ষে ভোট দিয়েছে। ভারত এই ভোট থেকে বিরত ছিল।[৩৫]

অর্থাৎ মানবাধিকারের ওপর একটি সার্বিক আক্রমণ পরিচালনার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। সুতরাং, কীভাবে সাধারণ জনগণ ক্রমবর্ধমাণ একটি সহিংস বা সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের অত্যাচার বা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে!

অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন এখনকার দিনে একেবারেই অকার্যকর। বেশ কয়েক বছর সংগ্রাম করার পর বেশ কিছু সংগঠনের অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর পিঠ দেয়ালে এসে ঠেকেছে। বাস্তব সম্মতভাবেই তারা এখন মনে করে, তাদের কার্যধারায় এখন হয়তো পরিবর্তন আনা উচিত। কোন দিকে এখন তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে সেটা এখন খুব তীব্রভাবে বিপরীত দুটি মেরুতে বিভাজিত হয়ে গেছে। এর ভেতরে কিছু লোক আছে, যারা মনে করে– একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের পথটিই অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কাশ্মীরের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা– যেগুলো ব্যাপক সংগ্রামেরই এলাকা। ঝাড়খণ্ডের সব কটি জেলা, বিহার, ছত্তীশগঢ়, ওড়িশা এবং মধ্য প্রদেশ সেই সব লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথটিই বেছে নিয়েছে।[৩৬]

অন্যরা আরো বেশি পরিমাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে তাদের আসলে

গণতান্ত্রিক নির্বাচনী পদ্ধতিতেই অংশগ্রহণ করা উচিত। তাদের মূল প্রক্রিয়াতে ঢুকে পড়া উচিত, তারপর এর ভেতরে থেকেই তাদের বোঝাপড়া করা উচিত। (অনুরূপভাবে, কাশ্মীরের জনগণের যে ধরনের পছন্দের ব্যাপার আসে, এটা কি তেমনই একটা ব্যাপার নয়?) যেটা মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই দুটি পদ্ধতি মৌলগতভাবেই একেবারেই ভিন্ন দুটি পথ। তবে প্রতিটি মতের লোকই একটা বিশ্বাসে মিল রয়েছে এবং মোটাদাগে বললে, 'অনেক হয়েছে, আর নয়'।

বর্তমানে যা চলছে অন্য কোনো বিতর্ক এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি আমাদের হয় খুবই ভালো নয়তো অসম্ভব মন্দ ফলাফল নিয়ে আসবে। এই দেশের জনগণের সবার জীবনব্যবস্থার মানের ওপরই এটা পরিবর্তন নিয়ে আসবে। হোক সে ধনী কিংবা নির্ধন, গ্রামবাসী বা শহরবাসী।

প্রতিটি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে অত্যন্ত ব্যাপক আকারে সহিংস ঘটনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই সেই ধরনের অরাজকতা দেখেছি, কাশ্মীরকে যার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই। সুতরাং আমাদের কি সেটাই করা উচিত যা করার পরামর্শ দিচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী? অর্থাৎ যে কোনো ভিন্নমত প্রকাশকে পরিত্যাগ এবং প্রবেশ করি নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতির পথে। আমরাও রোড শো তে শামিল হই এবং অর্থহীন প্রতিবাদ বা মতবিনিময়ে অংশ গ্রহণ করি, যেটা আমাদের সার্বিক মতৈক্যকে মানুষের চোখ থেকে আড়াল করে রাখে। আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে প্রতিটি বড় ধরনের ইস্যুতে, যেমন পারমাণবিক বোমা, বড় বড় বাঁধ, বাবরি মসজিদ বিতর্ক, কিংবা বেসরকারীকরণ– এই সবকিছুতেই কংগ্রেসই প্রথম বীজ বপন করেছে আর বিজেপি এর গুপ্ত ফসল নিজের ঘরে তুলেছে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, সংসদের কোনো মূল্য নেই, কিংবা নির্বাচনগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত। একটি ফ্যাসিবাদের ঝোঁক সম্পন্ন অত্যন্ত উগ্র একটি সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে একটি সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক দলের মধ্যে অবশ্যই একটা পার্থক্য রয়েছে। একই সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে সেই সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে যারা 'গর্বের সঙ্গে' বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক বাণী প্রচার করে এবং যারা একজন মানুষ থেকে আরেকজনের ঘৃণাবোধকে 'গোপনে গোপনে' উস্কে দেয়।
তবে এদের একদলের কর্মকাণ্ডের ধারা আমাদেরকে নিয়ে গেছে আরেক দলের ভীতিকর কর্মকাণ্ডের দিকে। এদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে সত্যিকারের কোনো 'বিকল্প' মুছে গেছে, যেটা একটি সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে আমাদের পাবার কথা ছিল। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা এবং বেশ একটা নিরপেক্ষ পরিবেশের আবহ তৈরি

করা হয়। এবং মিডিয়াতে তখন এ সংক্রান্ত আলোচনাই মূল জায়গা দখল করে বসে। কেননা, প্রত্যেকেই এটা জানে যে সে নিরাপদ; যে দলই জয়লাভ করুক না কেন, অবস্থা যা ছিল তেমনই থাকবে। (সংসদে পোটার খুব বিরুদ্ধচারণ করে ভাষণ দেওয়ার পরে এ আইনকে বাতিল করে দেওয়ার মতো কোনো কর্মকাণ্ড কোনো দলেরই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে অগ্রাধিকার পায়নি। তাদের সবারই জানা, আইনটি তাদের সবারই প্রয়োজন। হয় সেটা বর্তমান রূপে নয়তো অন্য কোনো রূপে।[৩৭]) নির্বাচনের সময় কিংবা বিরোধীদলে থাকার সময় তারা যাই বলুক না কেন, কোনো রাজ্য, জাতীয় সরকার, কিংবা রাজনৈতিক দল– ডানপন্থী, বামপন্থী কিংবা মধ্যপন্থী অথবা পার্শ্বপন্থী– কেউই নিও-লিবারেজম বা নব্য উদারতাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। তাই, সে রকম আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো পরিবর্তন সিস্টেমের মধ্যে থেকে হবে না।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি মনে করি না যে, নির্বাচনের পথে প্রবেশ করাটাই বিকল্প রাজনীতির একটি ধারা। সেটা অবশ্য এ কারণে নয় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে মানসিক ধারণা রয়েছে– রাজনীতি জিনিসটা খারাপ এবং সব রাজনীতিবিদই দুর্নীতিপরায়ণ। বরং এই কারণে আমি এটা বিশ্বাস করি যে, কৌশলগত কারণেই যুদ্ধ বা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে নিজেদের 'শক্তির কেন্দ্র' থেকে, নিজেদের 'দুর্বল অবস্থান' থেকে নয়।

গরিব এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নব্য-উদারতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা– এই দ্বৈত আক্রমণের শিকার হচ্ছে। যেহেতু নব্য-উদারতাবাদ ধনী ও গরীবদের মধ্যে ব্যবধানকে বাড়িয়েই তোলে। ব্যবধান তৈরি করে এখনকার ভারত ও ঝা চকচকে ভারতের মধ্যে। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো যদি এ জাতীয় অভিনয় করতে থাকে যে, তারা আসলে একই সঙ্গে ধনী এবং গরীব– উভয়ের স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে তবে দিন দিন এটা আরো বেশি হাস্যকর হয়ে উঠবে। কেননা, একজনের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে শুধুমাত্র আরেকজনের স্বার্থের বিনিময়েই। আমার 'স্বার্থ' একজন ধনী ভারতীয় হিসেবে (আমারও কি তা হলে এসব স্বার্থই সংরক্ষণ করা উচিত ছিল না) বেশি সম্ভাবনা মিলে যাবে একজন ধনীর সঙ্গেই; এ সম্ভাবনা খুবই কম যে, অন্ধ্র প্রদেশের কোনো দরিদ্র কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে তা মিলে যাবে।

যে রাজনৈতিক দল দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, সে দলটিও দরিদ্র হতেই বাধ্য। এ দলে তহবিল হবে একেবারেই যৎকিঞ্চিত। এবং এখনকার দিনে ভালো তহবিল ছাড়া একটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। বেশ কিছু

খ্যাতনামা সমাজকর্মীকে সংসদ ভবনে বসতে দেখাটা হয়তোবা আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এর বাস্তব কোনো মূল্য নেই। সুতরাং, এটা এমন কোনো পদ্ধতি নয় যেখানে আমাদের সকল শক্তিসামর্থ্য ব্যয় করা উচিত। ব্যক্তিগত ক্যারিশমা বা ব্যক্তিগত রাজনীতি সত্যিকার অর্থেই ব্যাপক পরিসরে কোনো পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে না।

যাই হোক, গরীব হওয়া আর দুর্বল হওয়া এক কথা নয়। দরিদ্রের শক্তি কোনো অফিস আদালতের মধ্যে নয়, বরং এ শক্তি হচ্ছে বাইরের জগতের। মাঠেঘাটে, পথে-প্রান্তরে, উপত্যকায়, পর্বতশৃঙ্গে, শহরের রাজপথে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে– এদের শক্তি মূলত এসব জায়গাতেই। নিষ্পত্তি যা হওয়ার তা এই উন্মুক্ত ক্ষেত্রেই হতে হবে। এসব জায়গাই সেসব জায়গা যেখানে প্রকৃত সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

এই মুহূর্তে এসব স্থান হিন্দুত্ববাদীদের হাতে জবরদখলে আছে। এদের সম্পর্কে যে যাই ভাবুক না কেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তারা সেসব অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং কঠোর নিষ্ঠায় তাদের দায়িত্ব পালন করছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অত্যান্ত অপরিহার্য জনসেবা খাত থেকে সরকারি তহবিল তুলে নিয়ে রাষ্ট্র যখন নিজের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে; তখন সঙ্ঘ পরিবারের পদাতিক বাহিনীরাই সেসব স্থান দখল করে নিয়েছে। ১০ হাজারেরও বেশি সংগঠনের মাধ্যমে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রচারণা ছড়ানোর পাশাপাশি তারা পরিচালনা করছে ইস্কুল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র। ক্ষমতাহীনতা কী জিনিস তারা তা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে। জনগণকেও তারা ভালো বুঝতে পারে, বিশেষ করে অক্ষম জনগণকে। তারা এটা জানে যে, ক্ষমতাহীন জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রচুর– যা শুধু বাস্তবসম্মত এবং আটপৌরে জীবনের প্রাত্যহিক চাহিদাই নয়, বরং সেসব চাহিদার মধ্যে রয়েছে আবেগের আতিশায্য, আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া, সঙ্গে আমোদ আনন্দের মিশেল। তারা একটা গুপ্ত মহাসঙ্কটের আয়োজন করেছে যেখানে রয়েছে রাগ-হতাশা দৈনন্দিন জীবনের অমর্যাদা, এবং ভিন্নতর এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন– যা সব কিছুকে মিলেমিশে একাকার দেয় এবং তাকে পরিচালিত করে ভয়াবহ উদ্দেশ্য সাধনের দিকে। আর এর ভেতরে প্রথাগত মূলধারার বামপন্থী দল এখনো সেই স্বপ্নের ঘোরেই রয়েছে যে, একদিন তারা 'ক্ষমতা অধিগ্রহণ' করবে। কিন্তু খুব অদ্ভুতভাবেই তারা বর্তমান সময়ের প্রয়োজনকে দেখতে অস্বীকার করতে এবং এ বিষয়ে কিছু কাজ করতে নির্বিকার এবং একেবারেই অনিচ্ছুক রয়ে গেছে। তারা

যেন নিজেরাই নিজেদের অবরোধ করে রেখেছে, এবং এমন একটি অগম্য বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে তারা নিজেদের পশ্চাদ্‌পদ করে রেখেছে– যেখানে সেই প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করে সুপ্রাচীন তত্ত্ব-তর্কের কূটকৌশলগুলোকেই আউড়ে যাওয়া হয়, যা এখনকার দিনের খুব কম মানুষই বুঝতে পারেন।

সঙ্ঘ পরিবারের এই যে অভিযান, এর বিরুদ্ধে ন্যূনতম কিছু চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছে তৃণমূল পর্যায় থেকে তৈরি হওয়া প্রতিরোধ আন্দোলন– যেটা দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। যারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ার বিরুদ্ধে, কিংবা মানবাধিকার হরণ করার বিরুদ্ধে; যেটা সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান উন্নয়ন মডেলের মাধ্যমে। এ জাতীয় বেশির ভাগ আন্দোলনই বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে। যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অভিযোগ করে যাওয়া হচ্ছে যে, এরা মূলত বিদেশি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এজেন্ট মাত্র। অথচ কোনো প্রকার অর্থ বা সহায়সম্পদ ছাড়াই তাঁরা তাঁদের এসব প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা অসাধারণ সব যোদ্ধা। তাঁদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে আছে, কিন্তু তাঁদের আছে শোনার মতো একটি কান, যা দ্বারা মাটির মানুষের অন্তরের কথা শুনতে পান। এবং তাঁদের যোগসূত্র রয়েছে এই ধূসর বিবর্ণ বাস্তবতার সঙ্গেই। যদি তাঁরা একত্রিত হতে পারতেন, যদি তাঁদেরকে সমর্থন করা যেত এবং অধিকতর শক্তিশালী করা যেত, তবে তাঁরা এমন একটা শক্তিতে পরিণত হতেন যাকে স্বীকৃতি না দিয়ে কোনো উপায় থাকতো না। তাঁদের সংগ্রাম, যখন এ সংগ্রাম চালিত হয়, তখন সেটাই হয় একটি আদর্শ সংগ্রাম– যার ভেতরটা শুধু তত্ত্বকথার ফুলঝুরিতে ফাঁপা নয়।

যখন সুবিধাবাদিতাই শেষ কথা, যখন আশা আকাঙ্খাগুলো মনে হয় যেন হারিয়ে গেছে, যখন সব কিছুই অবশেষে পরিণত হয় কোনো ন্যাক্কারজনক বাণিজ্যিক লেনদেনে, এরকম একটি সময়েও আমাদের অবশ্যই স্বপ্ন দেখার মতো সাহস খুঁজে নিতে হবে। আমাদেরকে পুনরায় অধিকার করতে হবে অতীতের সেই স্বপ্নালুতা। এই স্বপ্নালুতা ন্যায়বিচারের বিশ্বাসে, মুক্তির বিশ্বাসে, আত্মমর্যাদাবোধের বিশ্বাসে। সবারই জন্যই, আমাদের একটি সামষ্টিক সাধারণ উদ্দেশ্য তৈরি করতে হবে। এবং সেটা তৈরি করার জন্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে এতো বিশাল এবং পুরাতন একটি যন্ত্র কীভাবে কাজ করে, কারা এর জন্য কাজ করে, কাদের বিরুদ্ধে এটা কাজ করে; কারা এর জন্য মূল্য দেয় আর কারা এর থেকে সুবিধাভোগ করে।

অনেক অহিংস প্রতিরোধ-আন্দোলনের যোদ্ধা, যাঁরা একাকী দেশের কোনো

প্রান্তরে তাঁদের নিজস্ব কোনো ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাঁদের এ ধরনের একটি বিশেষ পন্থার রাজনীতি, স্থান-কাল হিসেবে কোনো এক সময় যার হয়তোবা উপযোগিতা ছিল, সেটা এখন আর যথেষ্ট নয়। তাঁরা একঘরে হয়ে গেছে, কিংবা তাঁদের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে। একটি অহিংস আন্দোলনকে কৌশল হিসেবে পরিত্যাগ করার অবশ্য এটাই যথেষ্ট কারণ নয়। আমাদের খুব গুরুতরভাবে প্রয়োজন অন্তর্বীক্ষণের, অর্থাৎ নিজেদের চিন্তা ও অনুভূতিকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখার। আমাদের দরকার– দূরদৃষ্টি। আমরা যারা বলি, আমরা প্রকৃত গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে চাই, আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, আমরা সবাই কর্মে ন্যায়পরায়ণ হবো এবং নিজস্ব কর্মপন্থায়ও গণতান্ত্রিক আচরণ করবো। যদি আমাদের সংগ্রাম বা আন্দোলন একটি আদর্শিক সংগ্রাম হতে হয়, তা হলে আমরা এমন কোনো শূন্যতা তৈরির সুযোগ দিতে পারি না যা সৃষ্টি হয় নিজেদের করা অন্যায় অবিচারে (যা আমরা প্রতিনিয়ত আরোপ করে চলি পরস্পরের ওপর, নারীর ওপর বা শিশুর ওপর)। একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাঁরা অর্থনৈতিক অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না। আবার যে সব আন্দোলনকারী বিভিন্ন ধরনের বাঁধ ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বিরোধিতা করে যাচ্ছে, তাঁদের প্রভাব বলয়ের আওতাধীন এলাকাতেই শুধু দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। এমন কি এর ফলে তাঁদের তাৎক্ষণিক প্রচারণার যদি কোনো স্বল্পমেয়াদি সফলতাকেও উপেক্ষা করে যেতে হয়, তা হলে তা-ই করতে হবে। আমরা যদি সুবিধাবাদী রাজনীতির কূপে আমাদের বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলি– যা নীতিবিরোধী হলেও সুবিধাজনক, তা হলে মূলধারার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আমাদের মধ্যে আর কি পাথর্ক্য রাখলো? যদি ন্যায়বিচারই আমাদের কাম্য হয়, তা হলে সেটা সবার জন্যই ন্যায়বিচারই হতে হবে, সমান অধিকার হতে হবে। তা শুধু একটি বিশেষ বিশ্বাসের অধিকারী মানুষদের জন্য নয়। এবং এ বিষয়ে কোনো গাফিলতি চলবে না। আমরা অহিংস আন্দোলনকে সে পর্যন্ত মেনে নিই, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে আমরা স্বস্তি বোধ করি। খুব বেশি হলে এটা মিডিয়ার জন্যই কিছুটা সাফল্য পায়। এখানে মিডিয়ার ছবি তোলার সংবাদ করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়। অথচ মিডিয়া এর ওপর কম ফোকাস করলে আমাদের সাফল্যও সবচেয়ে নিচে নেমে আসে।

আমাদের আসলে এখন খুঁজে দেখতে হবে এবং খুব জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা করতে হবে প্রতিরোধের কৌশল কী হতে পারে? সত্যিকারের সংগ্রাম

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

গড়ে তুলতে হবে এবং প্রকৃত ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে, ড্যান্ডি মার্চের ঘটনা একটা সুন্দর একটি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ ছিল না। সেটা ছিল একটি প্রকৃত গণমুখী আন্দোলন, যেটা গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ রাজত্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে।

রাজনীতিকে আমাদের নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। আমাদের নাগরিক সমাজের বিভিন্ন উদ্যোগকে যেভাবে 'এনজিও'করণ করা হচ্ছে, তা আমাদের প্রকৃতপক্ষে ঠিক তার উল্টে পথেই নিয়ে যাচ্ছে।[৩৮]

এটা আমাদের বরং রাজনীতিশূন্য করে ফেলছে। এটা আমাদের নির্ভরশীল করে তুলছে প্রচারপত্র বা সাহায্য-সহযোহিতার ওপরে। আমাদের পুনরায় চিন্তা করতে হবে যে, একটি ব্যাপক নাগরিক অসহযোগ-আন্দোলনের অর্থ কী?

সম্ভবত লোকসভার 'বাইরে' আমাদের প্রয়োজন একটি নির্বাচিত ছায়া সংসদ। এ ছায়া সংসদের সহযোগিতা এবং সমর্থন ছাড়া সংসদ ঠিকমতো যেন তার কার্যবিধি চালাতে না পারে। এটি এমন একটি ছায়া সংসদ, যেটা নাকি আমাদের মাটির মানুষকে সবসময় উচ্চ কণ্ঠে রাখবে। যেটা আমাদের দেবে গোয়েন্দা তথ্য এবং অন্যান্য উপাত্ত (যেটা ক্রমে মূল ধারার সংবাদমাধ্যমে দুর্লক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে)। নির্ভয় চিত্তে, কিন্তু অহিংস চিত্তে আমরা অবশ্যই রাষ্ট্রযন্ত্রের যে অংশ আমাদের নিষ্পেষণ করে যাচ্ছে সেটিকে অকার্যকর করে দেব।

আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। এমন কি যখন আমরা এ কথাগুলো বলছি সহিংস ওই চক্র ক্রমান্বয়েই যেন আমাদের আরো কাছে চলে আসছে। যেকোনোভাবেই হোক না কেন পরিবর্তন একটা আসবেই। সেটা হতে পারে রক্তের হোলিখেলার মধ্য দিয়ে অথবা তা হতে পারে অসাধারণ সুন্দর কোনো বিষয়। এটা নির্ভর করছে আমাদের নিজেদের ওপরে।

‘এবং তার জীবনটি বিলীন
হয়ে যাওয়া উচিত’

ভারতের সংসদ ভবনের ওপরে
আক্রমণের অদ্ভুত এক গল্প

২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবর ভারতের 'আউটলুক' ম্যাগাজিনে এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়।

আমরা এ টুকুই জানি : ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদে শীতকালীন অধিবেশন চলছিল। (তৎকালীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স সরকার আরেকটি দুর্নীতি কেলেঙ্কারির অভিযোগে আক্রমণের মুখে ছিল) সকাল ১১:৩০-এ হঠাৎ করেই পাঁচজন সশস্ত্র লোক একটি সাদা অ্যাম্বাস্যাডর গাড়িতে করে নয়াদিল্লীর 'পার্লামেন্ট হাউজ' গেট দিয়ে অনুপ্রবেশ করছিল। তাদের কাছে ছিল 'ইমপ্রোভাইস্‌ড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস' বা তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগে সক্ষম বিস্ফোরক জিনিসপত্র। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হলে তারা গাড়ি থেকে লাফিয়ে বের হয়ে যায় এবং গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। এরপর যে বন্ধুকযুদ্ধ চলে, তাতে সব ক'জন আক্রমণকারী নিহত হয়। আটজন নিরাপত্তাকর্মী এবং একজন মালিও নিহত হয়। পুলিশ বিভাগ যা বলেছে, তাতে নিহত সন্ত্রাসীদের কাছে যে পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল, তা দিয়ে সমস্ত পার্লামেন্ট ভবনকে উড়িয়ে দেওয়া যেত। এবং তাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল, যেটা দিয়ে পুরো এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্যবাহিনীকে শুইয়ে ফেলা যেত।[১] বেশিরভাগ সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে যা হয়, এ ক্ষেত্রে মোটেও সেরকমটি হয়নি। এই পাঁচজন সন্ত্রাসী তাদের পেছনে ফেলে রেখে যায় অত্যন্ত মোটা দাগের নমুনাসমূহ– অস্ত্রপাতি, মোবাইল ফোন, ফোন নম্বর, আইডি কার্ড, ছবি, শুষ্ক ফলের প্যাকেট, এমনকি একটা প্রেমপত্রও।[২]

আশ্চর্য নয় যে, মাত্র তিন মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের সঙ্গে ভারতের এই ঘটনাকে তুলনা করার সুযোগ নিতে ছাড়েনি প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি।

২০০১-এর ১৪ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের পরের দিনই দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল দাবি করল যে, বেশ কিছু সন্দেহভাজন লোককে তারা চিহ্নিত করতে পেরেছে। পরের দিন ১৫ ডিসেম্বর তারা ঘোষণা করলো যে, তারা পুরো ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছে। পুলিশ বলেছিল, এই আক্রমণ ছিল একটি যৌথ অপারেশন, যেটা চালিয়েছিল পাকিস্তান কেন্দ্রীক দুটো সন্ত্রাসী সংগঠন– লস্কর-এ-তৈয়বা এবং জইশ-এ-মহম্মদ। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ১২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। জইশ-এ-মহম্মদ-এর গাজী বাবা (যাকে প্রধান

সন্দেহভাজন মনে করা হয়), মৌলানা মাসুদ আজহার (দ্বিতীয় সন্দেহভাজন), তারিক আহমেদ (একজন 'পাকিস্তানি'), পাঁচজন নিহত হওয়া 'পাকিস্তানি সন্ত্রাসী' (যদিও আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি, তারা কারা?)। এবং তিন জন কাশ্মীরি লোক– এস.এ.আর. গিলানি, শওকত হুসেইন গুরু ও মোহাম্মদ আফজাল; এবং শওকতের স্ত্রী, আফসান গুরু। একমাত্র এই চার জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল।[৩] পরবর্তী টান-টান উত্তেজনার দিনগুলোতে সংসদ মুলতবী ঘোষণা করে দেওয়া হয়। ২১ ডিসেম্বরে পাকিস্তান থেকে ভারত তাঁর রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়। সব ধরনের বাস-ট্রেন ও বিমান পরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের যে কোনো ধরনের বিমানপরিবহন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এটি তখন তার সমর অভিযানের জন্য নির্ধারিত সকল রাষ্ট্রযন্ত্রকে একটি বিপুল সমর-প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাকিস্তান সীমান্তে পাঁচ লাখের বেশি সৈন্য মোতায়েন করা হয়, বিদেশি দূতাবাসগুলোর কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং যেসব পর্যটক ভারত ভ্রমণ করছিল তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা জানানো হয়। এ উপমহাদেশ একটি পারমাণবিক যুদ্ধের প্রায় দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সমগ্র বিশ্ব তাকিয়ে দেখছিল অত্যন্ত দম বন্ধ করা এক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে।[৪]

এই সামগ্রিক সমর-প্রস্তুতিতে ভারতের প্রায় ২০০ কোটি ডলার (১০,০০০ কোটি ভারতীয় রুপি) ব্যয় হয়। শুধুমাত্র এই আতঙ্কিত উন্মত্ততায় অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে সৈন্য মোতায়েন করতে গিয়েই বেশ কয়েক শ সৈনিক নিহত হয়।

এর প্রায় সাড়ে তিন বছর পর, ৪ আগস্ট ২০০৫, সুপ্রিম কোর্ট শেষ এ মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে। কোর্ট এটি মনে করে যে, পার্লামেন্ট ভবনে যে আক্রমণ ছিল তাকে একটি যুদ্ধের বিষয় হিসেবেই দেখতে হবে। মামলার রায়ে বলা হলো, 'পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণের যে উপক্রম, তা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের যে সার্বভৌম বৈশিষ্ট্য রয়েছে– তার ওপরে আক্রমণ; এবং এর মাধ্যমে ভারতের সরকার ব্যবস্থার ওপরও আক্রমণ বোঝায়, যা আত্মমর্যাদার মূল বেদী ... নিহত সন্ত্রাসীরা উত্তেজিত ছিল এবং একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভারত বিরোধী মানসিকতার মাধ্যমে তাদের এ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, যেটা প্রকাশ পায় তাদের গাড়িতে সংরক্ষিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি নকল স্টিকারের ওপর লিখিত কিছু কথাবার্তা থেকে (এক্স পিডাব্লিউ১/৮)।' মামলার রায়ে আরো বলা হয়, 'এই চরমপন্থী 'ফিদাঈন' (সংগ্রামী)দের যে কর্মপন্থা ছিল– তা ছিল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করার সার্বিক বহিঃপ্রকাশ।'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি নকল স্টিকারের ওপর যে লেখাটি পওয়া গিয়েছিল

সেটি নিচে হুবহু তুলে ধরা হলো।
(এটি দুর্বল ইংরেজিতে লেখা ছিল– যাতে দাড়ি কমার কোনো বালাই ছিল না। এবং সম্পূর্ণ লেখাটি রোমান বড় হাতের হরফে লেখা। নিচে তা হুবহু তুলে দেওয়া হলো)

> 'INDIA IS A VERY BAD COUNTRY AND WE HATE INDIA WE WANT TO DESTROY INDIA AND WITH THE GRACE OF GOD WE WILL DO IT GOD IS WITH US AND WE WILL TRY OUR BEST. THIS EDIET WAJPAI AND ADVANI WE WILL KILL THEM. THEY HAVE KILLED MANY INNOCENT PEOPLE AND THEY ARE VERY BAD PERSONS THERE BROTHER BUSH IS ALSO A VERY BAD PERSON HE WILL BE NEXT TARGET HE IS ALSO THE KILLER OF INNOCENT PEOPLE HE HAVE TO DIE AND WE WILL DO IT.' '

(অনুবাদ : 'ভারত একটি খুব খারাপ দেশ এবং আমরা ভারতেকে ঘৃণা করি আমরা চাই ভারতকে ধ্বংস করতে এবং ঈশ্বরের কৃপায় আমরা তা করবো ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে চেষ্টা করবো। এই 'ইডিয়েট' ওয়াজপেয়ী (বাজপেয়ী) এবং আদভানিকে আমরা হত্যা করবো। তারা অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে এবং তারা খুব খারাপ মানুষ তাদের ভাই বুশ-ও একজন অত্যন্ত খারাপ লোক সে আমাদের পরবর্তী শিকার হবে সেও অনেক নিরীহ মানুষের হত্যাকারী তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং আমরা তা করবো।')

যখন গাড়িটি পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করছিল তখন এই স্টিকারের ওপর লিখিত মেনিফেস্টোতে (প্রকাশ্যে লিখিত ঘোষণা) সূক্ষ্মভাবে এসব শব্দ চয়ন করা হয়েছিল, যা কিনা এই গাড়িবোমার জানালার কাচে লাগানো ছিল। (যে পরিমাণ কথা এখানে লিখিত আছে, এটা বিস্ময়কর যে, গাড়ির যিনি চালক ছিলেন তিনি এর কোনো কিছু পড়তে পেরেছিলেন কিনা। হতে পারে সে কারণেই তার গাড়িটা উপ-রাষ্ট্রপতির অশ্ব বহরের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ফেলে।)

সন্ত্রাস প্রতিরোধ আইন 'পোটা'র আওতায় স্থাপিত বিশেষ দ্রুত বিচার আদালতে পুলিশ তার চার্জশিট জমা দেয়। ২০০২-এর ১৬ ডিসেম্বর বিচারিক আদালত গিলানি, শওকত এবং আফজালকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। আফসান গুরুকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এর এক বছর পর হাই কোর্ট গিলানি এবং আফসানকে নির্দোষ ঘোষণা করে। তবে শওকত এবং আফজালের মৃত্যুদণ্ডকে বহাল রাখে। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট একইভাবে যাদের নির্দোষ

ঘোষণা করা হয়েছিল তা বজায় রাখে এবং শওকতের শাস্তিকে কমিয়ে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় দেয়। তবে যাই হোক না কেন, মোহাম্মদ আফজালের শাস্তি কে শুধু নিশ্চিতই করেনি, তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে তিনটি যাবজ্জীবন এবং দুটি ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

২০০৫-এর ৪ আগস্টের এ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে জানায়, 'মোহাম্মদ আফজাল যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা গ্রুপের সঙ্গে জড়িত, তার কোনো প্রমাণাদি নেই।' সেই সঙ্গে কোর্ট এই কথাও বলে, 'যেহেতু মামলাটি অনেক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি নাও থাকতে পারে, যেটা নাকি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। যাই হোক, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত, এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বিচার করে নির্ভুলভাবেই এটা এই নির্দেশ করে যে, 'সম্ভবত' নিহত তথাকথিত 'ফিদাঈন' আন্দোলনকারী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে অভিযুক্ত আফজালের যোগসূত্র থাকতে পারে।'

সুতরাং সরাসরি কোনো প্রমাণ পাওয়া যাইনি, তবে হ্যাঁ, যেটুকু ছিল তা ঘটনাস্থল থেকে উদঘাটিত কিছু নমুনা মাত্র।

এই রায়ের একটি বিতর্কিত অনুচ্ছেদে এটা পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে, 'ঘটনাটি, যেটা শেষ অব্দি রক্তক্ষয় এবং জীবনহানির অবস্থা সৃষ্টি করে, সেটা সমগ্র জাতির সত্তাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এবং আমাদের সমাজের যে সম্মিলিত নীতিবোধ– তাকে শুধুমাত্র তখনই সন্তুষ্ট করা যাবে যদি এ ধরনের অপরাধীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়।'[৬]

একটি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করার জন্য যখন 'সমাজের সম্মিলিত নীতিবোধ'– এই যুক্তিকে সামনে দাঁড় করানো হয়, (রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড বলতে এখানে মৃত্যুদণ্ড বোঝানো হচ্ছে) সেটা আমাদের আইনকে খুব অনিশ্চিত করে তোলে, যা যেমন-ইচ্ছে-তেমন আইনে পর্যবসিত হয়। এটা চিন্তা করলে শরীর হিম হয়ে যায় যে, এ ধরনের বিধিনিয়ম আসেনি কোনো শিকারী রাজনীতিকের দ্বারা, অথবা কোনো চাঞ্চল্যকর শিরোনামপ্রার্থী সাংবাদিকের দ্বারা (যদিও এ দুই গোত্র তাদের কাজ ঠিকঠাক মতোই করেছে), কিন্তু এ ঘটনা ঘটেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একটি রায়ের মাধ্যমে।

আফজালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কারণ হিসেবে বলতে গিয়ে মামলার রায়ে আরো বলা হয়েছে, 'আপীলকারী, যে একজন আত্মসমর্পনকারী সশস্ত্র সংগঠনের সদস্য এবং যে নাকি জাতির বিরুদ্ধে বারবারই চুক্তিভঙ্গ করার মতো কর্মকাণ্ড পুনরাবৃত্ত করেছে, সে সমাজের একজন কীট। এবং তার জীবন নিশ্চিত —

এই বাক্যের মধ্যে নিহিত আছে যুক্তির ভুলপ্রয়োগ। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্তমান সময়ে কাশ্মীরে আত্মসমর্পণকৃত সশস্ত্র সংগঠনের সদস্য বলতে কী বোঝায়– সে সংক্রান্ত সার্বিক অজ্ঞতাও এই বাক্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুতরাং, মোহাম্মদ আফজালের জীবন কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া উচিত?

ক্ষুদ্র, তবে প্রভাবশালী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যারা বুদ্ধিজীবী, সক্রিয় কর্মী, সম্পাদক, আইনজীবী এবং কিছু সেলিব্রেটিরা আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে আফজালের এই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা মনে করেন শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড-এর বিধান থাকা উচিত নয়। তাঁরা এই যুক্তিও উপস্থাপন করেছিলেন যে, এমন কোনো ব্যবহারিক প্রমাণ নেই যেখান থেকে আমরা ধারণা পেতে পারি যে, মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি সত্যিকার অর্থেই সন্ত্রাসীকে তাদের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে পারে। (সেটা কীভাবে হবে, বিশেষ করে 'ফিদাঈন'রা যে বয়সে এ কাজে নামে এবং যারা আত্মঘাতি বোমারু হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদের কাছে মৃত্যুটাই বরং প্রধান আকর্ষণ বলেই বিবেচিত।)

যদি সম্পাদক বরাবর চিঠি অথবা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা অনুষ্ঠানে দর্শকদের থেকে যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়, কিংবা বিভিন্ন ধরনের জনমত জরিপে যেসব ফল আসে– তা যদি জনমতের সঠিক প্রতিফলন বলে আমরা মনে করি, তাহলে আমরা বলবো, উচ্ছৃঙ্খল জনগণের ঢল প্রতিমুহূর্তেই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, ভারতীয় নাগরিকদের বড় অংশই বিস্ময়করভাবে দেখতে চায়, মোহাম্মদ আফজালকে প্রতিদিনই ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে, এমন কি সাপ্তাহিক বন্ধের দিনও যেন বাদ না যায়, এবং কয়েক বছর ধরে প্রতিনিয়তই যেন এটি করা হয়। বিরোধী দলীয় নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি অত্যন্ত অশোভনভাবে এর গুরুত্ব প্রকাশ করেন এভাবে যে, তিনি চান মুহূর্তকাল মাত্র বিলম্ব না করে আফজালকে যেন ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।[৭]

ইতিমধ্যে কাশ্মীরের জনমতও একইভাবে বিস্ময়কর। প্রবল রাগ-উত্তেজিত প্রতিবাদ এই ব্যাপারটাকেই ক্রমে স্পষ্ট করে করে তোলে যে, আফজালকে যদি ফাঁসিতে ঝোলোনো হয়, এর ফল হবে রাজনৈতিক। কিছু লোক এর প্রতিবাদ করছে বটে, তারা এটাকে দেখছে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত হিসেবে। তবে তারা এ জাতীয় প্রতিবাদ জানালেও ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার কাছ থেকে তারা কোনো ন্যায়বিচার আশা করেনি। কেননা, চলমান বিচারব্যবস্থায় তারা এত বেশি নির্মমতা-নৃশংসতার ভেতর দিয়ে বসবাস করে যে, আদালত, সাক্ষী, প্রমাণাদি বা ন্যায়বিচারের আস্থা রাখার কোনো কারণ নেই তাদের। আবার অন্য কেউ কেউ দেখতে চায় যে, ফাঁসির মঞ্চে মোহাম্মদ আফজাল হেঁটে যাবে মকবুল বাটের

মতো- যে ইতিপূর্বে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য জীবনদান করেছিল।[৮] সামগ্রিকভাবে, কাশ্মীরি জনগণের বেশির ভাগই আফজালকে দেখেছে যুদ্ধবন্দী হিসেবে, যাকে দখলদার শক্তির আদালতের অধীনে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে (ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে তাই ছিল।) স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ ভারতে যেমন, কাশ্মীরেও তেমন। তারা বাতাসে নিজ নিজ স্বার্থের গন্ধ পেয়েছিল, এবং খুব ন্যাক্কারজনকভাবে একটি হত্যাকাণ্ড (আফজালের ফাঁসি) সংঘটনের জন্য অপেক্ষা করছিল।

দুঃখজনকভাবে, এই উন্মাদনার মধ্যে আফজাল যে একজন ব্যক্তি, একজন বাস্তবের রক্তমাংসের মানুষ-এই সম্পর্কিত যাবতীয় অধিকার সে হারিয়ে ফেলে। সে হয়ে দাঁড়ায় সব মানুষেরই কল্পনার একটি ফানুস মাত্র, যে হতে পারে একজন 'জাতীয়তাবাদী, অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী অথবা একজন মৃত্যুদণ্ডবিরোধী কিংবা মৃত্যুদণ্ডরহিত সমাজকর্মী। সে হয়ে দাঁড়ায় ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু, এবং কাশ্মীরের মহানায়ক। যা এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের পণ্ডিত, নীতিনির্ধারক কিংবা শান্তি বিশেষজ্ঞরা যাই বলুক না কেন, এত বছর পরও কাশ্মীরে যুদ্ধ চলছে। সেটি কোনো অর্থেই সমাপ্ত হয়নি।

এরকম ভয়াবহ একটি পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা যখন এমন চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিকীকরণ করা হয়, তখন এটা বিশ্বাস করা খুব স্বাভাবিক যে, সম্ভবত হস্তক্ষেপ করার একটি উপযুক্ত সময় এসেছিল এবং চলেও গেছে। কেননা, আর যাই হোক, এই বিচারপ্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাস ধরে চলেছিল। এবং সুপ্রিম কোর্ট তার সামনে উপস্থাপিত সমস্ত প্রমাণাদি পরীক্ষা করে দেখেছে। এই কোর্ট দুইজনকে দোষী এবং অন্য দুইজনকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে। নিশ্চিতভাবেই কি এটা নিজেই বিচারব্যবস্থার নৈর্ব্যক্তিকতার প্রমাণ? তা হলে বলার আর কিছু কি অবশিষ্ট থাকে? এর দিকে ভিন্নভাবেও দেখা যেতে পারে। এটা কি একটু অদ্ভুত নয় যে, একটা মামলায় একই বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্যে অর্ধেকটা অংশ যখন ব্যাপকভাবে গোঁজামিল হিসেবে প্রমাণিত হলো, তখন বাকি অর্ধেকটা কীভাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সত্য প্রমাণিত হলো?

মোহাম্মদ আফজালের এই গল্প অত্যন্ত সূচারুভাবে মনোগ্রাহী। এই কারণে যে, সে আসলে মকবুল বাট নয়। তার ঘটনাটি কাশ্মীর উপত্যকার যেকোনো গল্পের মতোই জটিলভাবে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। এটি এমন একটি গল্প-যার বিস্তার সুদূরপ্রসারী। এটি আদালতের চার দেওয়ালেরও বাইরে, কিংবা স্বঘোষিত সুপার-পাওয়ার রাষ্ট্রের কেন্দ্রভূমিতে যে সব লোক নিরপাদ বলয়ে বসবাস করে, তাদের সীমাবদ্ধ কল্পনা শক্তিরও বহু বাইরে। মোহাম্মদ আফজালের এই গল্পের মূলসূত্র

কাশ্মীরের সেই সব যুদ্ধাবস্থাপূর্ণ অঞ্চলে রয়েছে, যেখানকার আইন সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের বাইরে, স্বাভাবিক বিচারপ্রক্রিয়ার যে স্পর্শকাতরতা– তা থেকে বহু দূরে।

এসব কারণ মিলিয়েই এটা খুব জটিল হয়ে যায়, যখন আমরা এই অদ্ভুত দুঃখজনক এবং অত্যন্ত তীব্র পৈশাচিক পার্লামেন্ট ভবনের ১৩ ডিসেম্বরের আক্রমণের গল্পটি বিবেচনা করি। এই গল্পটি আমাদেরকে বলে দেয়, বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে চলে কীভাবে? এটা বড় সব বিষয়ের সঙ্গে ছোট বিষয়গুলো যোগসূত্র স্থাপন করে। এবং এর মাধ্যমে সেই পদরেখা দেখতে পাই যে, আমাদের পুলিশ স্টেশনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন্দ্রগুলোতে প্রকৃতই কী ঘটে। আর তার সঙ্গে স্বর্গের ন্যায় কাশ্মীর উপত্যকার বরফাচ্ছন্ন শীতের রাজপথগুলোতে কী ঘটে এবং সেখানকার ক্রমবর্ধমান মারাত্মক উত্তেজনা যা একটি জাতিকে পারমাণবিক যুদ্ধের প্রান্তদেশে নিয়ে আসে। এটা সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে যার জন্য দরকার সুনির্দিষ্ট উত্তর। অবশ্যই তা কোনো তত্ত্বকথা নয়, কিংবা অতীতের কোনো পুনরাবৃত্তি নয়, দরকার শুধু– উত্তর।

এ বছরের ৪ অক্টোবর আমি ছিলাম কিছু মানুষের ক্ষুদ্র একটি জমায়েতের মধ্যে, যারা মোহাম্মদ আফজালের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে নয়াদিল্লীর 'যন্তর মন্তর'-এ সমবেত হয়েছিল। আমি সেখানে ছিলাম এই কারণে যে, আমি বিশ্বাস করি মোহাম্মদ আফজাল প্রকৃতপক্ষে পৈশাচিক একটা খেলার ঘুঁটি মাত্র। সে আসলে ড্রাগন নয়– যেরকমটি তাকে বানিয়ে তোলা হয়েছে। সে একটা ড্রাগনের পায়ের ছাপ মাত্র। যদি পায়ের ছাপকে 'বিলুপ্ত' করে ফেলা হয়, তা হলে আমরা কখনই জানতে পারবো না যে ড্রাগনটা আসলে কে।

বিস্ময়কর নয়, সেই বিকেলবেলা যতোটা না প্রতিবাদকারী সমবেত হয়েছিল তার থেকে বেশি ছিল সাংবাদিক এবং টেলিভিশন ক্যামেরার সমারোহ। এখানে আকর্ষণের বেশিরভাগটা ছিল গালিবের ওপর, যে ছিল আফজালের দেবদূতের মতো দেখতে ছোট্ট শিশু। কোমল হৃদয়ের মানুষেরা ঠিক বুঝতে পারছিল না এই ছোট্ট শিশুর সঙ্গে কী আচরণ করতে হবে– যার বাবা কিছুক্ষণ পর ফাঁসিকাঠে গিয়ে দাঁড়াবে। তাঁরা তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিভিন্ন আইস-ক্রিম এবং কোমল পানীয়র দোকানে। আমি যখন আশেপাশে লক্ষ্য করলাম, কারা এখানে সমবেত হয়েছে, তখন একটা ছোট্ট দুঃজনক সত্য অনুধাবন করলাম। এই প্রতিবাদের আয়োজনকারী হচ্ছেন একজন ছোটখাট মানুষ, যে খুব সন্ত্রস্তভাবে বিভিন্ন বক্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন ঘোষণা জানাচ্ছিলেন। তিনি হচ্ছেন– এস.এ.আর. গিলানি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্যের তরুণ প্রভাষক, পার্লামেন্ট আক্রমণ মামলার তিন নম্বর অভিযুক্ত আসামী। পার্লামেন্ট ভবন

আক্রমণের পরের দিন ২০০১-এর ১৪ ডিসেম্বর দিল্লী পুলিশের বিশেষ শাখা তাঁকে গ্রেফতার করে। যদিও পুলিশি হেফাজতে তাঁর ওপর অত্যন্ত নির্মম অত্যাচার চালানো হয়, এবং তাঁর পরিবার– তার স্ত্রী, ছোট বাচ্চা, এবং তাঁর ভাই– সবাইকে বেআইনীভাবে কারাবন্দী করে রাখা হয়, তারপরও তিনি যে অপরাধ করেননি সে অপরাধের দায় স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। নিশ্চিতভাবেই, তাঁর গ্রেফতার হওয়ার পরের দিনের সংবাদপত্র পড়ে আপনি তখন এটি জানতে পারতেন না। তারা বরং একটি কাল্পনিক কনফেশন বা অপরাধ স্বীকারোক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণী দিয়েছিল। দিল্লীর পুলিশ গিলানিকে এঁকেছিল অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে, যে নাকি এ ঘটনার ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ভারতের মাটিতে সবচেয়ে বড় হোতা। এই পুরো গল্পটির যারা লেখক তারা সমবেতভাবে তার বিরুদ্ধে চালিয়েছিল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক প্রপাগাণ্ডা। আমাদের অত্যন্ত তীব্র জাতীয়তাবাদী এবং রোমাঞ্চ-সন্ধানী সংবাদমাধ্যম খুব আগ্রহের সঙ্গে এটাকে বহুগুণ বাড়িয়ে উপস্থাপন করছিল। পুলিশ খুব ভালো করেই জানতো, এ ধরনের ফৌজদারি বিচারকার্যে সংবাদমাধ্যমে কী ধরনের প্রতিবেদন আসছে, সেসব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার কথা নয় বিচারকদের। তারা জানতো, 'সন্ত্রাসী'দের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা মাথায় তারা যে গল্প ফেঁদেছে তা সম্ভবত একটি সুনির্দিষ্ট জনমত গঠনে সাহায্য করবে এবং এই বিচার প্রক্রিয়াকে চালিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে। কিন্তু এই ব্যাপার শেষ পর্যন্ত আমাদের আইনের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। আমাদের মূলধারার সংবাদপত্রে যে সব নির্জলা মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো হয়েছে এখানে সে ধরনের কিছু বিদ্বেষপূর্ণ সংবাদ নিচে দেওয়া হলো :

'রহস্য উন্মোচন: আক্রমণের পেছনে ছিল 'জইশ', নীতা শর্মা এবং অরুণ জোশি, দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, ১৬ ডিসেম্বর, ২০০১:

> দিল্লীতে গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ শাখা জাকির হোসেন কলেজের (সান্ধ্যকালীন) আরবি বিভাগের একজন প্রভাষককে আটক করেছেন... যখন তারা এ প্রমাণ পান যে, কতিপয় সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যদের করা একটি সেলফোনের কল সে রিসিভ করেছিল।

'দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক সামগ্রিক সন্ত্রাসমূলক কাজের মূল হোতা', দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৭ ডিসেম্বর ২০০১:

> পুলিশ কমিশনার অজয় রাজ শর্মা রবিবার বলেছেন, ১৩ ডিসেম্বরের পার্লামেন্ট

ভবন হামলাটি ছিল জইশ-ই-মোহাম্মদ (জেম) ও লস্কর-ই-তৈয়বা (লেট) নামের দুটি সন্ত্রাসী সংগঠনের একটি যৌথ অপারেশন, যেখানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক সৈয়দ এ. আর. গিলানি ছিলেন দিল্লীতে প্রধান সমন্বয়কারী।

'ফিদাঈন'রা ছিলেন একজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে' দেবেশ কে. পাণ্ডে, দ্য হিন্দু, ১৭ ডিসেম্বর ২০০১:

জিজ্ঞাসাবাদের সময় গিলানি প্রকাশ করেছেন, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি জানতেন। 'ফিদাঈন'রা যখন থেকে এই হামলার পরিকল্পনা করে তখন থেকেই তিনি এ সম্পর্কে জানতেন।

'একজন ডন তার অবসর সময়ে সন্ত্রাসের ছক কষেন' সুতীর্থ পত্রনবিশ, দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, ১৭ ডিসেম্বর ২০০১:

তদন্তে বের হয়েছে যে, তার সান্ধ্যকালীন 'সময়'টি ছিল কলেজে আরবি সাহিত্য পড়ানোর জন্য। অবসর সময়ে তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে, নিজের বাড়িতে অথবা শওকত হোসেইন (যিনি অপর এক সন্দেহভাজন, যাকে গ্রেফতারের জন্য সন্ধানে নেমেছে পুলিশ)-এর বাড়িতে তিনি সন্ত্রাসবাদের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং দিতে যেতেন।

'অধ্যাপকের এগিয়ে যাওয়া', দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, ১৭ ডিসেম্বর ২০০১:

গিলানি সম্প্রতিককালে ২২ লাখ রুপি (৪৪,৩০০ ডলার)-এর বিনিময়ে পশ্চিম দিল্লীতে একটি বাড়ি কিনেছেন। দিল্লী পুলিশ তদন্ত করে দেখছে এত বিশাল সম্পদ তিনি হঠাৎ করে কীভাবে অর্জন করলেন।

'আলিগড় থেকে ইংল্যান্ড– গিলানি রোপন করেছে সন্ত্রাসের বীজ' সুজিত ঠাকুর, রাষ্ট্রীয় সাহারা, ১৮ ডিসেম্বর ২০০১:

তদন্ত সংস্থার বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গিলানি পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে জইশ-ই-মোহাম্মদের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিলেন... গিলানির কাজের ধারা এবং অত্যন্ত নির্ভুল পরিকল্পনা তৈরির যোগ্যতার কারণে ২০০০ সালে জইশ-ই-মোহাম্মদ তাকে সন্ত্রাসবাদের দর্শনকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় [সংবাদটি মূল হিন্দি থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন লেখক স্বয়ং]

'সন্ত্রাসের সন্দেহভাজন ব্যক্তির পাকিস্তান মিশনে বারবার যাতায়াত', স্বাতী চতুর্বেদী, দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, ২১ ডিসেম্বর ২০০১:

> জিজ্ঞাসাবাদে গিলানি স্বীকার করেছেন যে, তিনি পাকিস্তানে বেশ ক'বার ফোন করেছিলেন এবং তিনি জইশ-ই-মোহাম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলছিলেন। গিলানি বলেছেন যে, জইশ-ই-মোহাম্মদের কিছু সদস্য তাকে কিছু অর্থ তহবিল দিয়েছে, এবং বলেছে, দুটো ফ্ল্যাট কিনতে– যা কিনা এসব সশস্ত্র অভিযানে ব্যবহার করা যাবে।

'এ সপ্তাহের মুখ', সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৩ ডিসেম্বর ২০০১:

> একটি সেলফোন তার কুকীর্তি প্রমাণ করে দিয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সৈয়দ এ. আর. গিলানি ছিলেন ১৩ ডিসেম্বরের মামলার প্রথম গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি–যা আমাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেয় যে, সন্ত্রাসের শিকড় কত দূর ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে জী টিভির কর্মকাণ্ড এদের সবাইকে টেক্কা দেয়। 'ডিসেম্বর ১৩' নামে এরা একটি 'ডকুড্রামা' নির্মাণ করে, যেখানে দাবি করা হয়, এটি 'পুলিশ চার্জশীটে'র ভিত্তিতে 'সত্যঘটনা' অবলম্বনে নির্মিত। (এই শব্দগুলোর ভেতরেই স্ববিরোধিতা আছে। আপনি কী মনে করেন?) এই চলচ্চিত্রটি অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল. কে. আদভানি উভয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এর বেশ প্রশংসাই করেন। তাদের এই প্রশংসা সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পায়।[৯]

এই ডকুড্রামা সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা হয়েছিল। কোর্ট এই আপীল এই বলে বাতিল করে দেন যে, বিচারকরা সংবাদমাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত হন না।[১০]

(সুপ্রিম কোর্ট এটা কি বিবেচনা করেছিল যে, যদিও সংবাদমাধ্যমে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, বিচারকরা তার প্রভাবের উর্ধ্বে থাকেন, কিন্তু 'সমাজের সম্মিলিত নীতিবোধ' তার উর্ধ্বে নাও থাকতে পারে)। '১৩ ডিসেম্বর' ডকুড্রামা জী টিভির জাতীয় নেটওয়ার্কে সম্প্রচার করে ঠিক তখন, যখন দ্রুতবিচার আদালতের রায় ঘোষণার কিছুদিন বাকি। এই রায়ে গিলানি, আফজাল এবং শওকতকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ঘটনাচক্রে গিলানি ১৮ মাস কারারুদ্ধ থাকে এবং তার জন্য ছিল বেশির ভাগ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের জন্য নির্ধারিত নির্জন একটি কারাকক্ষ।

হাইকোর্ট গিলানি এবং আফসান গুরুকে নির্দোষ ঘোষণা করার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। (আফসান, গ্রেফতারের সময় যিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, কারারুদ্ধ অবস্থাতেই বাচ্চা প্রসব করেন। এই দুর্ভোগ তার স্বাস্থ্যকে একেবারেই ভেঙে ফেলে, বর্তমানে তিনি অত্যন্ত জটিল মানসিক রোগে ভুগছেন।) সুপ্রিম কোর্ট তাদের প্রতি হাইকোর্টের এই রায় বহাল রাখে। পার্লামেন্টে হামলা কিংবা সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে গিলানির যোগসূত্র থাকার মতো কোনো প্রমাণই আদালতের কাছে ছিল না, কোনো সংবাদপত্র অথবা সাংবাদিক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল এস.এ.আর. গিলানি সম্পর্কিত তাদের মিথ্যা তথ্যের জন্য তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। কিন্তু তাঁর দুর্ভোগ এখানেই শেষ নয়। তাঁর এই 'নিরাপরাধ' অবস্থা গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ শাখাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়, যেখানে একটি পরিকল্পনা আছে কিন্তু কোনো 'মূল পরিকল্পনাকারী' নেই। এটি, আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই, বিশেষ শাখার জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, গিলানি ছিলেন একজন মুক্ত মানুষ-যিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে পারতেন, আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, এবং তার সম্পর্কে যা বলা হচ্ছিল সেগুলি সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য দিয়ে অবস্থান পরিষ্কার করতে পারতেন। সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত শুনানির একটি দিন, ২০০৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় একদিন গিলানি তাঁর আইনজীবীর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই একজন রহস্যময় সশস্ত্র ব্যক্তি অন্ধকার আড়াল থেকে বের হয়ে আসলেন এবং পাঁচটি গুলি তার শরীর তাক করে ছোঁড়েন।[১১]

অলৌকিকভাবে হলেও তিনি বেঁচে যান। এটা এই গল্পের অত্যন্ত বিস্ময়কর একটি নতুন বাঁক এনে দেয়। স্পষ্টভাবেই কেউ একজন হয়তো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন গিলানি কী জানতেন এবং কী বলে দিতে পারেন- সেটা নিয়ে। যে কেউ কল্পনা করতেই পারে, এ ঘটনা তদন্তে সে ক্ষেত্রে পুলিশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা। কেননা, এর ভেতরে এই আশাটা রয়েছে যে, এর মাধ্যমে পার্লামেন্ট ভবনে হামলা ঘটনার নতুন কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। তার পরিবর্তে 'বিশেষ শাখা' বরং গিলানির সঙ্গে এমন আচরণ করলেন যেন মনে হতে পারে, তাঁকে গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টার ব্যাপারে তিনিই প্রধান সন্দেহভাজন। তারা তারা কম্পিউটার ও গাড়ি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করে। শতাধিক প্রতিবাদকারী তাঁর হাসপাতালের সামনে জমায়েত হয়েছিল এবং এ ধরনের গুপ্তহত্যা চেষ্টার তদন্তের দাবি জানিয়েছিল। এটি 'বিশেষ শাখা'র বিরুদ্ধেও তদন্ত হওয়ার দাবি জানিয়েছিল। (সন্দেহাতীতভাবে সেটা কখনই ঘটেনি। এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে

যাওয়ার পরও কোনো লোকই ওই ঘটনার তদন্তের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। কী অদ্ভুত!)

সুতরাং, সেই এস.এ.আর. গিলানি, আজকে এখানে। যিনি এরকম একটি নির্মম ঘটনার পরও টিকে গেছেন, 'যন্তর মন্তরে' জনতার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন এই বলে যে, মোহাম্মদ আফজালকে যে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে, এরকমটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তার জন্য এটিই কত সহজ ছিল যে, নিজের মাথাটা নীচু রেখে নিজের বাড়িতেই চুপচাপ বসে থাকা। আমি খুব গভীরভাবে অভিভূত এবং বিনয়াবনত হয়ে পড়েছিলাম তার এই অসীম সাহসের নীরব প্রদর্শনীতে।

এস.এ.আর. গিলানির অন্য প্রান্তে, যেখানে সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারদের ভীড়ের মধ্য থেকে অন্য এক ব্যক্তি নিজেকে তাঁর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় একেবারেই বিশেষত্বহীন করে রেখেছিলেন। তার গায়ে ছিল একটি লেমন টি-শার্ট এবং গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট। ছোট্ট একটি টেপ রেকর্ডার হাতে ধরে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন আরেকজন গিলানি– ইফতিখার গিলানি। তিনিও কারাগারে ছিলেন। তাকেও ২০০২ সালের ৯ জুন গ্রেফতার করে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়। সে সময় তিনি ছিলেন জম্মু-ভিত্তিক কাশ্মীর টাইমস পত্রিকার একজন সাংবাদিক। 'অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' আইনের ধারায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।[১২]

তার 'অপরাধ' ছিল যে, 'ভারত-অধিকৃত কাশ্মীর'-এ কোথায় কখন ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে, সে সম্পর্কিত পুরাতন হয়ে যাওয়া খবরগুলো তার জানা ছিল। (পরবর্তীতে দেখা যায় এই 'তথ্য' প্রকৃতপক্ষে ছিল পাকিস্তানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত একটি বিবরণ, যা ইন্টারনেট থেকে যে কেউ ডাউনলোড করে পেতে পারেন।) ইফতিখার গিলানির কম্পিউটার নিয়ে যাওয়া হয়, আইবি-এর কর্মকর্তারা তার হার্ড ড্রাইভ বিকৃত করেন, সেখানে যেসব ডাউনলোড করা ফাইল আছে, সেগুলোর পরিবর্তন আনেন। কিছু শব্দ, যেমন 'ভারত-অধিকৃত কাশ্মীর'কে 'জম্মু এবং কাশ্মীর' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন যেন এটাকে দেখলে মনে হয় যে, এটি একটি ভারতের নিজস্ব নথি। আরো কিছু শব্দ যোগ করা হয়, যেমন– 'এটা শুধু রেফারেন্সের জন্য, এটি কোনোভাবেই প্রকাশনার জন্য নয়।' যেন মনে হয় এটি একটি গোপনীয় নথি, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোনোভাবে বাইরে পাচার করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখার মহাপরিচালককে পাকিস্তানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত এই বিবরণীর একটি অনুলিপি দেওয়া হলেও তিনি ইফতিখার গিলানির আইনজীবীর আপীল বারবার উপেক্ষা করেন। পরবর্তী ছয় মাসের ভেতরে এই বিষয়টির কোনো কিছু পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে অসম্মত হন।

আবারও এই হীনউদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যাচারিতা, যেটা বিশেষ শাখা করেছিল, সেটাকেই আজ্ঞাবহ হিসেবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হলো। এখানে এ ধরনের মিথ্যাচারিতার আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

> '৩৫ বছর বয়সী ইফতিখার গিলানি, যিনি হুরিয়তের কঠোরপন্থী সৈয়দ আলী শাহ্ গিলানির জামাই, মনে করা হয়, শহরের একটি আদালতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি একটি পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।' – নীতা শর্মা, দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, ১১ জুন, ২০০২
>
> 'ইফতিখার গিলানি ছিলেন হিজবুল মুজাহিদীনের সৈয়দ সালাউদ্দিনের প্রধান যোগাযোগের সূত্র। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর চলাচল সম্পর্কে সালাউদ্দিনকে তিনি তথ্য প্রদান করতেন। সাংবাদিক পরিচয়ের আড়ালে তিনি তার মূল উদ্দেশ্যগুলোকে সহজেই লুকিয়ে ফেলতে পারতেন। এতটা চমৎকারভাবে সেটা তিনি করতেন যে, তার স্বরূপ উন্মোচন করতে বছরের পর বছর সময় লেগে গেল। এ গুলো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানানো হয়েছে।' – প্রমোদ কুমার সিং, দ্য পাইওনিয়ার, জুন ২০০২
>
> 'গিলানির কন্যা জামাতার বাড়ি থেকে আয়কর অভিযানের সময় হিসাব বহির্ভূত সম্পদ এবং সংবেদনশীল নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে।' – হিন্দুস্তান, ১০ জুন ২০০২

কিছু মনে করবেন না যে, পুলিশের চার্জশীটে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা অর্থের পরিমাণ বলা হয়েছে মাত্র ৩,৪৫০ রুপি (৬৯ ডলার)। অপর দিকে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, তিনটি শয়নকক্ষবিশিষ্ট একটি ফ্লাটের মালিক তিনি এবং তার অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ ২২ লাখ রুপি (৪৪,৩০০ ডলার)। এবং তিনি প্রায় ৭৯ লাখ রুপি (১৫৯,০০০ ডলার) আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন। আরো বলা হয়েছিল, তিনি এবং তার স্ত্রী গ্রেফতার এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু তিনি তখন গ্রেফতার অবস্থাতেই ছিলেন। কারাগারে গিলানিকে প্রহারের সম্মুখিন হতে হয় এবং খুব বাজেভাবে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়। তার লেখা বই 'মাই ডেইজ ইন প্রিজন' (কারাগারে আমার দিনগুলো)-এ তিনি বর্ণনা করছেন, কীভাবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাকে তার নিজের পরিধানের জামা দিয়েই টয়লেট পরিষ্কার করতে বাধ্য করা হতো এবং সেই জামা তাকে দিনের পর দিন পরে থাকতে বাধ্য করা হতো।[১০] বেশ কয়েক মাস ধরে আদালতের যুক্তিতর্ক এবং তার সহকর্মীদের জোর তদ্বিরের মাধ্যমে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার বিরুদ্ধে এই মামলা চলতে থাকলে সরকারের জন্য বড় ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি

সৃষ্টি করবে, তখন তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।[১৪]

সেই লোকটি আজকে এখানে। একজন মুক্ত মানুষ, একজন সাংবাদিক, যিনি 'যন্ত্রর মন্তরে' এসেছেন একটি ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য। আমার কাছে প্রথমেই মনে হলো এস.এ.আর গিলানি, ইফতিখার গিলানি এবং মোহাম্মদ আফজাল– এরা সবারই তো 'তিহার' জেলে একই সময়ে থাকার সম্ভাবনা ছিল। (এবং এর সঙ্গে আরো অনেক নাম না-জানা কাশ্মীরিরাও, যাদের গল্প হয়তোবা আর কখনই আমরা জানতে পারবো না।) এটা সম্ভবত আগামীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হবে, এস.এ.আর গিলানি ও ইফতিখার গিলানি–উভয়ের মামলাই ভারতের বিচারব্যবস্থাপনা কতোটা নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষ এবং নিজের ভুল সংশোধন করার ক্ষেত্রে এর ক্ষমতা, সেটা আমাদের দেখিয়ে দেয়। এবং তারা এটাকে অস্বীকার করে না। দিল্লীতে খুঁটি গেড়ে বসা কাশ্মীরি হিসেবে এস.এ.আর গিলানি এবং ইফতিখার গিলানি– উভয়েই সৌভাগ্যবান ছিলেন। কেননা, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহকর্মী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মিলে সামাজিকভাবে ঘনিষ্ট একটি পরিচিত জগতে তাদের বসবাস ছিল। এরা তাকে খুব ভালোভাবে চিনতেন এবং প্রয়োজনের সময় এরা তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের সম্ভাব্য সবকিছুই করেছেন। এস.এ.আর. গিলানির পক্ষে আইনজীবী নন্দিতা হাস্কর 'অল ইন্ডিয়া ডিফেন্স কমিটি' (সর্বভারতীয় প্রতিরোধ কমিটি) গঠন করে অনেককেই একত্রিত করেছিলেন (যেখানে আমিও একজন সদস্য ছিলাম)।[১৫] সমাজকর্মী, আইনজীবী, সাংবাদিকদের মধ্যে সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে সেখানে গিলানি সম্পর্কে সঠিক প্রচারণা চালানো হয়েছিল। অত্যন্ত নামকরা আইনজীবী রাম জেঠমালানি, কে.জি. কাননাবিরান এবং বৃন্দা গ্রোভার তার পক্ষে মামলা লড়েছিলেন। তারা দেখিয়েছিলেন যে এই মামলাতে প্রকৃতপক্ষে কী জিনিস দেখার রয়েছে, কী পরিমাণ মনগড়া ধারনার সমাহার, অনুমান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যাচারিতা। এসবকে অধিকতর শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছিল কাল্পনিক বা বানোয়াট কতক প্রমাণের মাধ্যমে। সুতরাং, নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আমাদের বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা ছিল, কিন্তু 'নিরপেক্ষতা'টা যেন এক লাজুক প্রাণী মাত্র– যার বসবাস আমাদের এই আইনব্যবস্থার গুহার অতি গভীরে। খুব কম ক্ষেত্রেই নিজেকে সে দেখা দেয়। একদল শীর্ষ সারির আইনজীবীদের পূর্ণ একটা দলের প্রয়োজন হয়েছিল সেই 'নিরপেক্ষতা' নামক প্রাণীটিকে গুহার বহু স্তরের নীচ থেকে টেনে বের করতে এবং তার ভূমিকা রাখতে। এটাই সেই জিনিস, সংবাদপত্রে যাকে বলা হতো

হারকিউলীয় কাজ (অতিদুষ্কর কাজ, যা গ্রিক পুরানের মহাবীর হারকিউলিস দ্বারা হয়তো সম্ভব)। সমস্যা হলো মোহাম্মদ আফজালের জন্য এরকম কোনো হারকিউলিস ছিল না।

মোহাম্মদ আফজালকে গ্রেফতার করার পর চার্জশীট দেওয়া অব্দি এই পাঁচ মাস বন্দী করে রাখা হয় উচ্চ নিরাপত্তাবিশিষ্ট কারাগার কক্ষে। আইনগত পরামর্শ দেওয়া কিংবা আইনগত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা– কোনোটাই তার ছিল না। তার জন্য ছিল না কোনো শীর্ষ পর্যায়ের আইনজীবী বা কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরক্ষা কমিটি (সেটা ভারত কিংবা কাশ্মীর– কোথাও ছিল না), এবং তার পক্ষে কোনো প্রচারণাও ছিল না। যে চার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তাদের মধ্যে সে-ই ছিল সবচেয়ে নাজুক। এবং গিলানির চেয়েও তার মামলাটি ছিল অনেক জটিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবেই, কাশ্মীরের 'স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ' (এসওজি) এই পুরো সময়টাতেই আফজালের ছোটভাই হিলালকেও অবৈধভাবে আটকে রাখে। আফজালের বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। (তথ্যটি এই ধাঁধার একটি টুকরো মাত্র, গল্পটি আমরা যখন ক্রমশ জানতে থাকবো, এই টুকরো তখন কোনো এক সময় খাপে খাপ মিলে যাবে।)

২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর কার্যপ্রণালীবিধিকে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করে তদন্ত কর্মকর্তা, পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসিপি) রাজবীর সিং ('সন্ত্রাসী'দের এনকাউন্টারে হত্যা করার খ্যাতি থাকার জন্য তাকে আদর করে দিল্লীর 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' ডাকা হয়), 'স্পেশাল সেল'-এ একটি সংবাদ সম্মেলন করেন।[১৬] তাতে মোহাম্মদ আফজালকে জনসম্মুখে স্বীকারোক্তি প্রদানে বাধ্য করা হয়েছিল। সাংবাদিকদের পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসিপি) অশোক চাঁদ বলেছিলেন যে, আফজাল ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে, যদিও পরবর্তীতে এটা অসত্য বলে প্রকাশ পায়। পুলিশের কাছে মোহাম্মদ আফজালের আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তির ঘটনা ঘটেছিল সেই সংবাদ সম্মেলনের পরের দিন (এবং যার পর থেকে সে সার্বক্ষণিকভাবে পুলিশের হেফাজতেই থাকতো, এবং সেটা ছিল নিপীড়নের নাজুক পরিবেশে যা কার্যপ্রণালী ভঙ্গের আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি)। পার্লামেন্ট ভবন হামলার সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্টতা আফজাল নিজেই সংবাদমাধ্যমের সামনে 'স্বীকারোক্তি' দেয়।[১৭]

সাংবাদিকদের সামনে এই 'মিডিয়া স্বীকারোক্তি' প্রদানের সময় একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে। একটা সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আফজাল খুব পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, এ হামলার ব্যাপারে গিলানির কোনো ভূমিকা ছিল

না, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই মুহূর্তে সহকারী কমিশনার রাজবীর সিং তার প্রতি চিৎকার করে ওঠেন এবং তাকে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চুপ করিয়ে দেন। এবং সংবাদমাধ্যমকে অনুরোধ করেন, আফজালের স্বীকারোক্তির এই অংশ যেন তারা প্রকাশ না করে। সংবাদমাধ্যম সেই অনুরোধ খুব সুন্দরভাবে রক্ষা করেছিল। এই সত্যি ঘটনাটি তিন মাস পর প্রকাশ পায়, যখন 'আজতক' নামে একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সেই স্বীকারোক্তির অনুষ্ঠানটি পুনরায় সম্প্রচার করে। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'হামলে কে সাও দিন' (হামলার এক শ' দিন) এবং সেই পুনর্সম্প্রচারের মধ্যে কোনোভাবে এই অংশ রয়ে গিয়েছিল। সাধারণ জনগণের চোখে, যারা আইন ও অপরাধ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে খুব কমই জানেন– সাংবাদিকদের সামনে এই স্বীকারোক্তি আফজালের দোষটাকেই নিশ্চিত করেছিল। সুতরাং, এটা সম্ভবত দ্বিতীয়বার অনুমান করার প্রয়োজন হয় না যে, মামলার রায়ে প্রতিফলন ঘটেছিল 'সমাজের সম্মিলিত নীতিবোধ' নামের অনুষঙ্গটির।

সাংবাদিকদের সামনে এই স্বীকারোক্তির পরের দিন আফজালের কাছ থেকে 'অফিশিয়াল' স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া হয়। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অশোক চাঁদের সামনে সে যথাযথ ও সাবলীল ইংরেজিতে একটি নিখুঁত ধারাবর্ণনার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল (ডেপুটি কমিশনারের ভাষায়, 'সে ঘটনার বর্ণনা করে গিয়েছিল আর আমি তা লিখেছিলাম')। এই 'নিখুঁত ইংরেজির স্বীকারোক্তি'টাকে সিলগালা করা একটি খামে করে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এই স্বীকারোক্তিতে আফজাল, যে এখন মামলার শুনানীর কেন্দ্রবিন্দু, সেখানে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে একটি গল্প ফেঁদে ফেলা হয়, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে তোলা হয় গাজী বাবা, মৌলানা মাসুদ আজহার এবং তারিক নামের একজন এবং পাঁচ জন নিহত সন্ত্রাসীকেও। এসব সন্ত্রাসীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, গোলাবারুদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবেশাধিকারের অনুমতিপত্র, ল্যাপটপ কম্পিউটার, একটি ভুয়ো পরিচয়পত্র এবং একটি বিস্তারিত জিনিসপত্রের তালিকা, যেখানে যথাযথভাবে কোন রাসায়নিক পদার্থের কত কেজি সে কোথা থেকে কিনেছিল, এবং বিস্ফোরক তৈরির সুনির্দিষ্ট অনুপাত এবং যথার্থভাবে সেই সময়, যখন তার মোবাইল ফোন কারো কল রিসিভ করেছিল। (কোনো এক কারণে, ইতিমধ্যেই গিলানি সম্পর্কে আফজাল তার মন পরিবর্তন করে ফেলে এবং এই ষড়যন্ত্রে তাকেও পরিপূর্ণভাবে জড়ায়।)

আফজালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর প্রতিটি বিষয়বস্তুই পুলিশের ইতিমধ্যে জোগাড় করা আলামতের সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে মিলে যায়। অন্যভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, মাত্র একদিন আগেই পুলিশ যেভাবে সাংবাদিকদের

সামনে আফজালের স্বীকারোক্তি নিয়েছিল, তার সঙ্গে এই স্বীকারোক্তি পুরোপুরি মিলে যায়। এটা যেন কাচের চপ্পলের মধ্যে সিন্ডারেলার পায়ের ছাপ! (এটা যদি একটি চলচ্চিত্র হতো, আপনি হয়তোবা বলতেন এটা একটা সাজানো বা গাঁজাখুরি নাটক, যা শুধু লেখকের কাল্পনিক চিত্রনাট্যেই সম্ভব। বাস্তবিকভাবে এখন আমরা জানি, যে এটাকে প্রকৃতই একটি চিত্রনাট্যে পরিণত করা হয়েছিল, জী টিভির কাছে আফজালের কিছু রয়্যালটি পাওনা রইলো।)

ঘটনাচক্রে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট– উভয়ই আফজালের স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এই কারণে যে, কারো নিরাপত্তা বিধানে যে কার্যপ্রণালীবিধিতে যে ব্যবস্থা রয়েছে এটা অনেক ক্ষেত্রে তার বিঘ্ন ঘটিয়েছে এবং সেসব কার্যবিধি ভঙ্গ করেছে। কিন্তু এরপরও আফজালের সেই স্বীকারোক্তিটা টিকে গেল। এই মামলার সমগ্র বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে এটাই হচ্ছে সেই ভৌতিক দশার মূল কেন্দ্রবিন্দু। যখন এটাকে পদ্ধতিগত এবং আইনগতভাবে পাশে সরিয়ে ফেলা হলো, অথচ তার সেই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর নথিপত্র স্বীকারোক্তি থেকেও বড় হয়ে দাঁড়ালো। আইনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যর চেয়েও আরো বড় কোনো উদ্দেশ্য এটি সাধন করে ফেলে। ২০০১ সালের ২১ ডিসেম্বর ভারত সরকার যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিতে শুরু করে, তখন বলা হয়েছিল যে, এ ঘটনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের যোগসাজশের ব্যাপারে এদের কাছে 'সুস্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ' আছে।[১৮] আফজালের স্বীকারোক্তি ছিল ভারত সরকারের কাছে সেই একমাত্র 'প্রমাণ', যা পাকিস্তানের যোগসাজশ প্রমাণ করে। আফজালের স্বীকারোক্তি এবং সেই স্টিকার-মেনিফেস্টো। একটু চিন্তা করে দেখুন। আইন বহির্ভূত এই যে স্বীকারোক্তি, যা নির্যাতনের মাধ্যমে আদায় করা হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই লাখ লাখ সেনা পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন করা হলো জনগণের রাজস্বের টাকা বিশাল অপচয়ের মাধ্যমে এবং সমগ্র উপমহাদেশই আরেকটি পারমাণবিক যুদ্ধের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল যাতে সমগ্র বিশ্বকেই জিম্মি করে ফেলা হচ্ছিল।

মানুষের মুখে তখন একটি বড় প্রশ্ন ফিসফিসানিতে ঘুরে ফিরছিল– ব্যাপরটা আসলে অন্যরকম? আসলেই কি এই স্বীকারোক্তি যুদ্ধের উন্মাদনা শুরু করেছিল, নাকি একটি যুদ্ধের প্রয়োজনেই এ ধরনের একটি স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া হয়েছিল?

পরবর্তীকালে যখন আফজালের স্বীকারোক্তিকে হাই কোর্ট অগ্রাহ্য করলো, তখন জইশ-ই-মোহাম্মদ ও লস্কর-ই-তৈয়বা সংক্রান্ত সব আলোচনাই স্তিমিত হয়ে গেল। পাকিস্তানের যোগসাজশের আর একটি মাত্র যোগসূত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল,

সেই পাঁচ নিহত ফিদাঈনের পরিচিতি। মোহাম্মদ আফজাল তখনও পুলিশের হেফাজতেই ছিল, সে সেই পাঁচ ফিদাঈনকে শনাক্ত করে মোহাম্মদ, রানা, রাজা, হামজা এবং হায়দার হিসেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, তাদেরকে দেখলে পাকিস্তানি বলেই মনে হয়। পুলিশ বলল, তারা পাকিস্তানি ছিল। এবং বিচারিক আদালতের বিচারকও বলেছিলেন যে, তারা পাকিস্তানি ছিল।[১৯] এবং ব্যাপারটা সেখানেই থেমে গেল। (আমাদেরকে যদি বলা হতো, সেই পাঁচ ফিদাঈনের নাম ছিল হ্যাপি, বাউন্সি, লাকি, জলি এবং কিড়িঙ্গামানি, যারা এসেছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে, আমাদেরকে সেটাই গ্রহণ করতে হতো।)

আমরা আজও জানি না, আসলেই তারা কারা ছিল। এবং তারা এসেছিলই বা কোথা থেকে। কেউ কি বিষয়টা জানতে আগ্রহী? দেখে তা মনে হয় না। হাই কোর্ট বলেছিল, 'সেই পাঁচ নিহত ফিদাঈনকে অবশেষে শনাক্ত করা গেল। এমন কি যদি অন্য কিছু হতো তা হলেও তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো– এই অভিযুক্তদের সঙ্গে কথিত পাঁচ ফিদাঈনের সংযোগ কতটুকু আছে, সেটা; তাদের নাম নয়।'

অভিযুক্তের জবানবন্দিতে (এটা পুলিশি হেফাজতে স্বীকারোক্তি থেকে ভিন্ন। যেটা আদালতে বলা হয় সেটা অভিযুক্তের জবানবন্দি) আফজাল বলেন, 'আমি কোনো সন্ত্রাসীকেই শনাক্ত করিনি। পুলিশ আমাকে সন্ত্রাসীদের নাম বলে দিয়েছে এবং আমাকে জোর করেছে এই নামগুলো বলার জন্য।'[২০] কিন্তু ততদিনে জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। আফজাল যে সব মৃতদেহকে শনাক্ত করেছিলেন, বিচারের প্রথম দিনে বিচারিক আদালত কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী সেই প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। এবং ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে সেগুলোকে অবিতর্কিত আলামত হিসেবে সরাসরি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যদিও এর আনুষ্ঠানিক কোনো প্রমাণ নেই! এই ধরনের হতবুদ্ধিকর আচরণের ফলে আফজালের মামলাটির পরিণতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে আমরা উদ্ধৃতি প্রদান করে বলতে পারি, 'আফজালের বিরুদ্ধে প্রথম যে ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলো, আফজাল নিহত সন্ত্রাসীদের চিনতেন। তিনি তাদের মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই আলামতগুলো অবিতর্কিত রয়ে গেল।'

নিশ্চিতভাবেই এটা এভাবে সম্ভব ছিল যে, নিহত সন্ত্রাসীরা প্রকৃত বিদেশী সন্ত্রাসী ছিলেন। কিন্তু এটাও একইভাবে সম্ভব ছিল যে, তারা বিদেশী ছিলেন না। মানুষ হত্যা করে এবং তাদেরকে মিথ্যাভাবে 'বিদেশী সন্ত্রাসী' হিসেব শনাক্ত করা, অথবা মিথ্যাভাবে কোনো মৃতব্যক্তিকে 'বিদেশী সন্ত্রাসী' হিসেবে শনাক্ত করা,

অথবা একজন জীবিত ব্যক্তিকে 'বিদেশী সন্ত্রাসী' হিসেবে শনাক্ত করা– আমাদের পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে এমন শনাক্তকরণ অভূতপূর্ব কোনো ঘটনা নয়। এ ব্যাপারে কাশ্মীরের সঙ্গে দিল্লীর রাজপথের কোনো পার্থক্য নেই।[২১]

কাশ্মীরের সুন্দরভাবে নথিবদ্ধ অনেক ঘটনার মধ্যে একটি অত্যন্ত খ্যাতনামা ঘটনা আছে। ঘটনাটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রীতিমতো কেলেঙ্কারি হিসেবে প্রকাশ পেতে যাচ্ছিল। এটি ঘটেছিল ছত্তিসিংপাড়া গণহত্যার কিছুকাল পরে। ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল, যেদিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন নয়া দিল্লীতে অবতরণ করার কিছু সময় আগে ছত্তিসিংপাড়া নামের একটি গ্রামের ৩৫ জন শিখকে হত্যা করা হয়। পরিচয়হীন একজন বন্দুকধারী এ কাজ করে, যার পরনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উর্দি।[২২] (কাশ্মীরে অনেকেই সন্দেহ করে থাকে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর লোকজনই অনেক গণহত্যার পেছনে জড়িত।) এর পাঁচ দিন পর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, অভ্যুত্থানকারীদের প্রতিহত করতে যারা সেনাবিহিনীর একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করে, পাথ্রিবাল নামের একটি গ্রামের বাইরে যৌথ অপারেশনের মাধ্যমে তারা পাঁচ জন মানুষকে হত্যা করে।[২৩] পরের দিন সকাল বেলা তারা ঘোষণা করে যে, নিহত লোকজন ছিল পাকিস্তান ভিত্তিক সশস্ত্র বিদেশী সংগঠনের সদস্য, যারা ছত্তিসিংপাড়া হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল। মৃতদেহগুলো পোড়া এবং বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। লাশগুলোর 'অদগ্ধ' সেনা-উর্দির তলে সাধারণ মানুষের পোশাক পরা ছিল। পরবর্তীতে এটা প্রকাশ পায় যে, ওই পাঁচজন ছিল স্থানীয় জনগণ, যাদেরকে অনন্তনাগ জেলা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে খুব ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে খুন করা হয়।

এর বাইরেও আরো অনেক ঘটনা আছে :

২০ অক্টোবর ২০০৩ : শ্রীনগরের সংবাদপত্র 'আল-সাফা'তে একজন পাকিস্তানি সশস্ত্র যোদ্ধার ছবি ছাপা হয়। তাকে হত্যার কারণ হিসেবে 'এইটটিনথ রাষ্ট্রীয় রাইফেল' থেকে দাবি করা হয় যে, সে নাকি ক্যাম্পে ঝড়ের গতিতে ঢুকে পড়ার পায়তারা করছিল। কুপওয়ারা এলাকার ওয়ালি খান নামের এক রুটিওয়ালা ছবিটি দেখে নিজের সন্তান হিসেবে শনাক্ত করেন। ফারুক আহমেদ খান নামে তার এই সন্তানকে দুই মাস আগেই সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এক বছরেরও বেশি সময় পর শেষ পর্যন্ত তার লাশ ফেরত দেওয়া হয়।[২৪]

২০ এপ্রিল ২০০৪ : লোলাব উপত্যকায় 'এইটটিনথ রাষ্ট্রীয় রাইফেল'-এর ঘাঁটি থেকে দাবি করা হয়, তারা ভয়ানক বন্দুকযুদ্ধে চার জন বিদেশি সশস্ত্র যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। পরবর্তীতে এটি প্রকাশ পায় যে, ওই চারজন ছিল সাধারণ

শ্রমিক। জম্মু থেকে আগত এসব শ্রমিককে সেনাবাহিনী ভাড়া করে কুপওয়ারাতে নিয়ে এসেছিল। এসব শ্রমিকের কোনো একটি পরিবারকে একটি বেনামি চিঠির মাধ্যমে এ ঘটনা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এসব মৃত শ্রমিকের পরিবার কুপওয়ারাতে এলে তাদের কাছে এসব লাশ হস্তান্তর করা হয়।[২৫]

৯ নভেম্বর ২০০৪ : জম্মুর নাগরোটা সংবাদমাধ্যমের সামনে সেনাবাহিনী ৪৭ জন আত্মসমর্পনকারী সশস্ত্র যোদ্ধাকে উপস্থাপন করছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'জেনারেল অফিসার কমান্ডিং সিক্সটিনথ কর্‌পস', এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের মহাপরিচালক। পরবর্তীতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ আবিষ্কার করে যে, এই আত্মসমর্পনকারী যোদ্ধার মধ্যে ২৭ জনই বেকার যুবক, যাদেরকে ভুয়ো নাম ও উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এবং সরকার থেকে এই শর্তে চাকুরি দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে যেভাবে বলা হবে সেভাবে তারা নিজেদের উপস্থাপন করবে।[২৬]

এগুলো তাড়াহুড়ো করে দেখানো কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। শুধু এটাই বোঝানোর জন্য যে, অন্য কোনো প্রমাণের অনুপস্থিতিতে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর মুখের কথাই যথেষ্ট নয়।

২০০২-এর মে মাসে দ্রুত বিচার আদালতের শুনানি শুরু হয়েছিল। যে পরিবেশের ভেতর দিয়ে বিচার ব্যবস্থাটি চলছিল, তা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। ৯/১১ হামলার পরবর্তীতে যে উন্মাদনা শুরু হয়েছিল, তার রেশ তখনও বাতাসে রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র তখন আফগানিস্তানে তার বিজয়ের আস্ফালনে ব্যস্ত। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছে গুজরাট। এর মাত্র কয়েকমাস আগে সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনের এস-৬ বগিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ফলে ৫৮ জন হিন্দু তীর্থযাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল। প্রতিশোধ হিসেবে একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই হাজারেরও বেশি মুসলমানকে জনসম্মুখে কসাইদের মতো নৃশংসতায় হত্যা করা হয় এবং দেড় লাখেরও বেশি মুসলমানকে বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়।

আফজালের জন্য যতগুলো বিষয় তার প্রতিকূলে যেতে পারতো তার কোনো কিছুই তার পিছু ছাড়েনি। তাকে কঠোর নিরাপত্তায় কারারুদ্ধ করে অত্যাচার করা হচ্ছিল, যেখানে বহির্বিশ্বের কারো কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। একজন পেশাদার আইনজীবীকে নিজের জন্য নিয়োগ করার মতো টাকাপয়সাও ছিল না তাঁর। পরবর্তীতে এই মামলায় আদালত কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবীকেও তিন সপ্তাহ পরে তার দায়িত্ব থেকে সরে আসবার জন্য আবেদন করা হয়। কেননা, তখন এ আইনজীবীকে পেশাগতভাবে এস.এ.আর. গিলানির প্রতিরক্ষার জন্য গঠিত

অন্যান্য আইনজীবীদের গঠিত দলে নিযুক্ত করা হয়। আফজালের আইনজীবীর যে কনিষ্ঠ সহকারী ছিলেন, এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা যার খুব সামান্যই ছিল, আদালত তাকে আফজালের জন্য নিযুক্ত করেন। নতুন নিযুক্ত আইনজীবী এই পুরো সময়টাতে একবারের জন্যও আফজালের নির্দেশনা নিতে বা অবস্থা দেখতে জেলখানাতে যাননি। আফজালের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এ আইনজীবী একজন সাক্ষীও হাজির করেননি। এবং বিচার ব্যবস্থায় অন্যান্য যেসব সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি তাদেরকে জেরা করতেন। তার নিযুক্তির পাঁচ দিন পর ৮ জুলাই আফজাল আদালতকে অনুরোধ করেন তার জন্য অন্য কোনো আইনজীবী নিয়োগ দিতে, এবং তার পছন্দের একটি আইনজীবীদের তালিকা তিনি আদালতের কাছে পেশ করেন। আফজাল আশা করেছিলেন এই পছন্দের তালিকা থেকে একজন আইনজীবীকে আদালত তার জন্য নিযুক্ত করবেন। কিন্তু তালিকার আইনজীবীদের সকলেই এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। (সংবাদমাধ্যমে এ মামলা নিয়ে যে ধরনের উন্মাদনামূলক প্রচারণা চলছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রত্যাখ্যান একেবারের বিস্ময়কর কিছু নয়। এই বিচার কার্যক্রমের একেবারে শেষ সময়ে রাম জেঠমালানি নামের একজন সিনিয়র আইনজীবী অবশেষে গিলানির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে রাজি হন। এ কারণে শিবসেনাদের একটি উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী তার মুম্বাই অফিসে ঢুকে ভাংচুর করে।[২৭]) বিজ্ঞ বিচারকরা এ ব্যাপারে কিছু করতে তাঁদের সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবং আফজালকেই সাক্ষীদের জেরা করার অধিকার দিয়েছিলেন। এটা খুবই বিস্ময়কর ছিল যে, বিচারকরা আশা করছিলেন একজন সাধারণ মানুষ একটি ফৌজদারি আদালতের কার্যবিধি অনুযায়ী সাক্ষীদের জেরা করতে সক্ষম হবেন। সেসব মানুষের জন্য এটা মোটামুটিভাবে একটি অসম্ভব কাজ বলা যায়, যাদের ফৌজদারি আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা সম্পর্কে ধারণা নেই; এবং তার ভেতরে সাম্প্রতিক সময়ে জারি হয়েছে নতুন নতুন আইন, যেমন 'পোটা'; অথবা আরো সেসব রয়েছে, যেমন আলামত এবং টেলিগ্রাফ আইনের সংশোধনীসমূহ। এসব কারণে একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীকেও এসব বিষয়ে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার জন্য অতিরিক্ত সময় নিয়ে কাজ করতে হয়।

আফজালের বিরুদ্ধে যে মামলাটি ছিল, সেটা বিচারিক আদালতে পরিচালিত হয়েছিল প্রায় ৮০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে। এর ভেতরে ছিল, ভূ-স্বামী, দোকানদার, সেলফোন কোম্পানির টেকনিশিয়ান এবং কিছু পুলিশ সদস্য। এই মামলার আইনগত ভিত্তি তৈরির জন্য এটাই ছিল বিচারপ্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালীন সময়। এর জন্য প্রয়োজন ছিল অতি সতর্ক ও

যত্নশীল কঠোর আইন-সংক্রান্ত কাজ, যার ভেতর দিয়ে আলামতগুলোকে জোগাড় করতে হতো, সেগুলোকে নথিভুক্ত করতে হতো, এবং আত্মরক্ষার জন্য সাক্ষীদেরকে ডাকতে হতো এবং তাদের সাক্ষ্যসমূহকে বিচারের জন্য আদালতে জেরা করার মাধ্যমে সত্যতা যাচাই (ক্রস-এক্জাম) করতে হতো। এমন কি এর পরেও যদি আদালতের রায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও যেত (সাধারণত বিচারিক আদালতগুলো খুব কুখ্যাতি অর্জন করেছে তাদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য), যে সাক্ষ্যপ্রমাণগুলো অন্তত জোগাড় করা হতো, উচ্চতর আদালতে এ মামলা পরিচালনার সময় সেগুলো নিয়ে আইনজীবীরা আরো কাজ করতে সক্ষম হতেন। সাক্ষ্যগ্রহণের এই ক্রান্তিকালীন সময়ে আফজাল খুব অরক্ষিত সময় অতিবাহিত করেন। এটা ছিল সেই সব মুহূর্ত, যখন তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল এবং তার গলাতে ফাঁসির রজ্জু শক্ত হয়ে গেঁথে বসছিল।

এমন-কি এর পরেও, তার বিচার চলাকালীন অবস্থাতে স্পেশাল সেলের সিন্দুক থেকে খুবই বিব্রতকরভাবে থলের বেড়াল বের হয়ে আসতে শুরু করেছিল। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মিথ্যাচারিতা, বানোয়াট এবং যেসব কাল্পনিক বা বিকৃত নথিপত্র আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছিল, এগুলো সম্মিলিতভাবে, এবং এর কার্যপদ্ধতির ভেতরে যে গুরুতর গলদ ছিল সেটা তদন্তমূলক কর্মকাণ্ডের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। যখন দিল্লী হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলোতে এই জিনিসগুলোর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয়েছিল, তারা তখন পুলিশকে শুধুমাত্র তিরস্কারমূলক ইঙ্গিত জানিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোকে অভিহিত করেছিলেন একটি সমস্যাযুক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে, যেখানে এই পুরো কর্মকাণ্ডটিই ছিল এই বিরক্তিকর বৈশিষ্ট্যের সমাহার। এই বিচারপ্রক্রিয়ার কোনো ক্ষেত্রেই পুলিশকে খুব গুরুতরভাবে তিরস্কার করা হয়নি, শাস্তি দেওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে কার্যপদ্ধতির যে স্বাভাবিক ধারা রয়েছে স্পেশাল সেল প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপেই তার প্রতি ন্যূনতম মর্যাদা রাখেনি। তাদের সেই উগ্র, নির্বিকার ও প্রবল আস্থার মনোভাব, যার মাধ্যমে তারা তদন্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছিল, দেখে মনে হয় যে, এসব মিথ্যার বেসাতিকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব নয়। তদন্ত কর্মকাণ্ডের প্রায় প্রতিটি অংশের মধ্যেই এ ধরনের গোঁজামিল রয়ে গেছে।[২৮]

'আপনি বিবেচনা করে দেখুন, গ্রেফতার এবং বিভিন্ন জিনিস জব্দ করার স্থান ও সময়।' দিল্লী পুলিশ বলেছিল, গিলানিকে গ্রেফতারের পর তাঁর দেওয়া একটি তথ্যের ভিত্তিতে আফজাল এবং শওকতকে শ্রীনগর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিচারিক আদালতের নথি ঘেঁটে দেখা যায় যে, ১৫ ডিসেম্বর ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটে

শওকত ও আফজালকে সন্ধানের জন্য শ্রীনগর পুলিশের কাছে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দিল্লী পুলিশের নথি অনুযায়ী গিলানিকে দিল্লীতে গ্রেফতার করা হয়েছিল ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। অর্থাৎ প্রায় তারও চার ঘণ্টা পর, যখন নাকি শ্রীনগর পুলিশ শওকত ও আফজালকে ইতিমধ্যেই খোঁজা শুরু করে দিয়েছিল। কেন এ ধরনের স্ব-বিরোধিতা রয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি স্পেশাল সেল। হাই কোর্টের রায়ে এটাকে রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে যে, পুলিশের বক্তব্যের মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতি রয়ে গেছে এবং এটি কোনোভাবেই সত্য হতে পারে না। এবং এ ধরনের একটি বক্তব্যকেই তারা বলে বসলো যে, 'বিরক্তিকর বৈশিষ্ট্য'? কেন দিল্লী পুলিশকে মিথ্যা কথা বলতে হলো, সেটা একবারও জিজ্ঞাসা করা হলো না, তার উত্তরও বাকি রয়ে গেল।

পুলিশ যখন কাউকে গ্রেফতার করে, তখন কার্যবিধি অনুযায়ী সেই গ্রেফতারের সপক্ষে গ্রেফতারি পরোয়ানাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর প্রয়োজন। এবং জব্দকৃত জিনিপত্র যেমন, দ্রব্যসামগ্রী, টাকাপয়সা, নথিপত্র– যাকিছু হোক না কেন, সেই তালিকাতেও সাক্ষীর স্বাক্ষর দরকার হয়। পুলিশ দাবি করে, ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় তারা আফজাল এবং শওকতকে একসঙ্গে গ্রেফতার করে। পুলিশের ভাষ্যমতে, দুজন লোক নিয়ে পলায়নরত একটি ট্রাককে তারা আটক করে (ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন ছিল শওকতের স্ত্রীর নামে)। তারা এটাও জানায় যে, তারা একটি নকিয়া মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ ও প্রায় দশ লাখ রুপি (প্রায় ২০,১০০ ডলার) আফজালের কাছ থেকে জব্দ করে। অভিযোগের জবানবন্দীতে আফজাল জানিয়েছে, শ্রী নগরের একটি বাস স্ট্যান্ড থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছ থেকে কোনো ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন কিংবা অর্থ জব্দ করা হয়নি।

ন্যাক্কারজনকভাবে, আফজাল এবং শওকতের গ্রেফতারি পরোয়ানাতে ঘটনাস্থল হিসেবে নাম রয়েছে দিল্লীর, যেখানে বিসমিল্লাহ্ নামে একজন লোকের স্বাক্ষর দেখা যায়। বিসমিল্লাহ্ ছিল গিলানিরই ছোট ভাই, যাকে ওই সময় 'লোধি রোড পুলিশ স্টেশন'-এ অবৈধভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। এরই মধ্যে, যে দুজন সাক্ষী জব্দকৃত মালামালের তালিকায় স্বাক্ষর করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন এবং প্রায় দশ লাখ রুপি– তারা দুজনেই ছিলেন জম্মু এবং কাশ্মীরের পুলিশ। তাদের ভেতরে একজন আবার হেড কনসস্টেবল মোহাম্মদ আকবর (যিনি এ মামলার ৬২ নং সাক্ষী)। আমরা একটু পরেই জানতে পারবো, তিনি মোহাম্মদ আফজালের অপরিচিত কেউ নন। তিনি শুধু একজন বৃদ্ধ পুলিশই নন যিনি হঠাৎ করেই ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন কি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের নিজস্ব স্বীকারোক্তি মতে, আফজাল এবং শওকতকে তারা প্রথম দেখতে পেয়েছিল

'পরিমপুরা ফ্রুট মান্ডি' নামের একটি এলাকায়। কোনো কারণবশত পুলিশ সেসময় তাদেরকে গ্রেফতার করেননি। পুলিশ জানিয়েছে, তারা সেসময় ওই দুজনকে একটি জনবিরল এলাকার দিকে অনুসরণ করছিল যেখানে চাক্ষুষ স্বাক্ষী হিসেবে কোনো জনমানুষের চিহ্ন ছিল না।

সুতরাং এ মামলার বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি গুরুতর অসঙ্গতি রয়ে গেল। এগুলো সম্পর্কে হাই কোর্টের রায়ে বলা হলো যে, 'অভিযুক্তের গ্রেফতারের স্থান ও কালের মধ্যে খুব গোলমাল রয়েছে।' এটা খুবই দুঃখের যে, এটা হলো সেই স্থান ও কাল, পুলিশের দাবি অনুযায়ী যেখান থেকে তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ করেছিল। যে আলামতের মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আফজালের সংশ্লিষ্টতার সন্ধান পাওয়া যায়: মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ। আবারো, গ্রেফতারের সময় এবং তারিখ হিসেবে যেসব তথাকথিত বস্তুসামগ্রী তার কাছ থেকে জব্দ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন এবং প্রায় দশ লাখ রুপি। একজন 'সন্ত্রাসী'র কথার বিপরীতে আমরা শুধু পুলিশের বক্তব্যই শুনতে পাচ্ছি।

জব্দকৃত মালামালের তালিকায় আছে একটি ল্যাপটপ; পুলিশের কথা অনুযায়ী এর ভেতরে অনেক ফাইল রয়েছে–যার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবেশাধিকারের জাল অনুমতিপত্র এবং পরিচয়পত্র তৈরি করা হয়েছিল। এ ছাড়া এর ভেতরে আর বিশেষ কোনো তথ্য ছিল না। পুলিশের দাবি অনুযায়ী আফজাল এটা বহন করে শ্রীনগরে গাজীবাবাকে ফেরত দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসিপি) রাজবীর সিং বলেন, ২০০২ সালের ১৬ জানুয়ারিতে কম্পিউটারের হার্ডস্কিটাকে সিল করে দেওয়া হয় (অর্থাৎ ল্যাপটপটি জব্দ করার এক মাস পরে)। কিন্তু কম্পিউটারে যখন হার্ডডিস্কটি লাগানো হয় তখন এই প্রমাণও মেলে যে, ১৬ জানুয়ারিতে সিল করে দেওয়ার পরেও হার্ডডিস্কটি ব্যবহার করা হয়েছে। আদালত এটিও বিবেচনা করেছেন অথচ এটাকে আমলে নেননি।

(অনুমান করে এটা বলাই যায় যে, ওই ল্যাপটপ থেকে যদি আর সব কিছু মুছেই ফেলা হয়, তবে কেন এর একমাত্র সংশ্লিষ্টতা পাওয়ার উপযোগী তথ্য, অর্থাৎ এর জাল অনুমতিপত্র এবং পরিচয়পত্র তৈরিতে ব্যবহৃত ফাইল এবং জী টিভির একটি সিনেমার ক্লিপ– যেখানে পার্লামেন্ট ভবনের ভিডিও চিত্র দেখা যায়– এগুলো কেন মুছে ফেলা হয়নি? এটা কি অদ্ভুত নয়? কেনই বা গাজী বাবা কিংবা একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রধান পরিচালকের একটি ল্যাপটপের প্রয়োজন হয়েছিল? এটার ওপরে এত দুর্বল কারুকাজ কী করে হলো? এবং কেনই বা এত

জরুরি ভিত্তিতে ল্যাপটপটা তার প্রয়োজন হলো?)

মোবাইল ফোনে কথা বলার কথাই এবার চিন্তা করুন : স্পেশাল সেলের তৈরি করা অত্যন্ত 'নিরেট আলামত'গুলোর দিকে আপনি যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন তবে এর ভেতরে অনেক সন্দেহজনক ব্যাপার আপনার কাছে প্রকাশ পাবে। এই মামলার মূলসূত্র ছিল এই মোবাইল ফোন, সিম কার্ড এবং এটার কল আদান-প্রদানের তালিকা, সেলফোন কোম্পানির অফিসারদের সাক্ষ্য এবং সেই দোকানদারের সাক্ষ্য, যিনি এ মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড বিক্রি করেছিলেন আফজাল ও তার সহযোগীদের কাছে। মোবাইল ফোন কল আদান-প্রদানের তালিকাটি আদালতের কাছে উপস্থাপন করা হয় এটা দেখানোর জন্য যে, শওকত-আফজাল-গিলানি এবং মোহাম্মদ (সেই নিহত সন্ত্রাসীদের একজন)–এরা প্রত্যেকেই পার্লামেন্ট হামলার পরও একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। অথচ কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করা এই কল আদান-প্রদানের তালিকার সত্যতার কোনো অফিসিয়াল প্রমাণ ছিল না। এমন কি এটি মূল ডকুমেন্টের অনুলিপিও নয়। এটি ছিল বিলিং সিস্টেমের একটি টেক্সট ফাইল, যে ফাইলকে যেকোনো সময়ই যেকোনোভাবে পরিবর্তিত করা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই কল আদান-প্রদানের তালিকাটির মধ্যে দুটো কল পাওয়া যায় যেখানে হুবহু একই সময় একই সিম কার্ড থেকে কল করা হয়েছে, অথচ সেই ফোন কলের আইএমইআই নম্বর ও হ্যান্ডসেট– দুটোই আলাদা। তার মানে হচ্ছে, হয় সিম কার্ডটিকে ক্লোন করা হয়েছে, অর্থাৎ আরেকটি প্রতিরূপ তৈরি করা হয়েছিল, অথবা কল আদান-প্রদানের তালিকাটিই নকল।

এবার সিম কার্ডটির কথা চিন্তা করুন : নিজেদের গল্পের সব কুশীলবদের ঠিক রাখার জন্য এই মামলায় একটি মোবাইল ফোন নম্বরের ওপর খুব বেশি নির্ভরতা ছিল। নম্বরটি হলো : ৯৮১১৪৮৯৪২৯। পুলিশের ভাষ্যমতে, এটি আফজালের মোবাইল ফোন নম্বর। এই নম্বরের মাধ্যমেই আফজাল ও মোহাম্মদের মধ্যে যোগাযোগ হতো। আরো যোগাযোগ হতো আফজাল ও শওকতের মধ্যে এবং শওকত ও গিলানির মধ্যে। পুলিশ আরো জানিয়েছে যে, এই নম্বরই লেখা ছিল ওই নিহত সন্ত্রাসীদের পরিচয়পত্রের ট্যাগের ওপর। বাহ্, চমৎকার সুবিধাজনক ব্যাপার তো। বাচ্চা পথ হারিয়েছে! মাকে ফোন দাও : ৯৮১১৪৮৯৪২৯।

এটা প্রণিধানযোগ্য যে, অপরাধের ঘটনাস্থল থেকে যেসব আলামত সংগ্রহ করা হয় সেগুলোকে, স্বাভাবিক কার্যবিধির প্রয়োজন অনুযায়ী, তাৎক্ষণিকভাবে সিলগালা করে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু পরিচয়পত্রগুলোকে কখনই সিলগালা করে দেওয়া হয়নি। সবসময়ই এটা পুলিশের হেফাজতেই ছিল এবং যেকোনো সময়

এর ভেতরে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল।

এই ৯৮১১৪৮৯৪২৯ পুলিশের একমাত্র আলামত, আফজালের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এটা আফজালেরই মোবাইল ফোন নম্বর ছিল– আমরা দেখতেই পেলাম যেটাকে আদৌ কোনো প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। সিম কার্ডটা তো কখনই পাওয়া গেল না। পুলিশ কামাল কিশোর নামে একজন সাক্ষীকে উপস্থাপন করেছিল। কামাল আফজালকে এই হিসেবে সনাক্ত করে যে, ২০০১ এর ৪ ডিসেম্বর তার কাছেই সে মোটোরোলা ফোন এবং একটি সিম কার্ড বিক্রি করেছিল। তবে মজার ব্যাপার হলো হলো, যেই কল-রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে মামলাটি চালিত হচ্ছে সেই কল রেকর্ডের মধ্যেই দেখা যায় যে, এই নির্দিষ্ট সিম কার্ড ৬ নভেম্বরের আগে ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থাৎ আফজাল যখন এটা কিনেছে বলে বলা হচ্ছে, তার প্রায় এক মাস আগে থেকেই এটা ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং, সাক্ষী এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলেছে, অথবা ওই কল-রেকর্ডটি ভুয়া। হাই কোর্ট এই বিশাল গলদটাকে এড়িয়ে যায় এই কথা শুনেই যে, আফজালের কাছে কামাল সিম কার্ড বিক্রি করেছে। কিন্তু এই সিম কার্ডটাই বিক্রি করেছে কিনা– সে কথা কামালের কাছে জিজ্ঞেস করেনি। আর সুপ্রিম কোর্ট খুব উদারভাবে বলেছে, 'সিম কার্ডটি ৪.১২.২০০১ তারিখের আগে বিক্রি করা হয়েছিল।'

অভিযুক্তকে শনাক্তকরণের ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখুন : বেশ কিছু সাক্ষীর ধারাবাহিক ক্রম, যাদের বেশিরভাগ ছিল বিভিন্ন দোকানদার–.যারা আফজালকে শনাক্ত করেছিল তার কাছে বিভিন্ন জিনিস বিক্রির সুবাদে। যেমন, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যালুমিনিয়াম পাওয়ার, সালফার, সুজাতা কোম্পানির মিক্সার-গ্রাইন্ডার, শুকনো ফলের প্যাকেট এবং এ জাতীয় আরো বিভিন্ন জিনিস এসব দোকানদার আফজালের কাছে বিক্রি করেছিলেন। স্বাভাবিক কার্যবিধি অনুযায়ী এটা প্রয়োজন ছিল যে, এসব দোকানদাররা অনেক লোকজনের ভেতর থেকে আফজালকে শনাক্ত করবে। কিন্তু সেটা করা হয়নি। বরং এর পরিবর্তে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় আফজাল বিভিন্ন দোকানে তদন্তদলকে নিয়ে যায়, যেখানে দোকানদারদের কাছে আফজালের পরিচয় তুলে ধরা হয় একজন পার্লামেন্ট হামলাকারী হিসেবে (আমাদের যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে আমরা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, আসলে এসব দোকানগুলোতে আফজালই পুলিশকে নিয়ে গিয়েছিল, নাকি পুলিশই আফজালকে নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, যাই হোক না কেন আফজাল তখনও পুলিশের হেফাজতেই ছিল, এবং তখনো সে অত্যাচারের হুমকির সম্মুখেই ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার স্বীকারোক্তিকে আইনগতভাবেই যদি সন্দেহজনক মনে করা

হয়, তাহলে এগুলোকেও কেন ধরা হবে না?)

এই যে কার্যবিধির স্বাভাবিক পন্থাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে, বিচারকরা এসব নিয়ে কিছু সময় নাড়াচাড়া করলেও তা গুরুতর হিসেবে বিবেচনা করেননি। তারা বলেছিলেন, একজন সাধারণ মানুষ কেনইবা অকারণে একজন নির্দোষ মানুষকে এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেবে? কিন্তু এটা আসলেই কি কোনো যথার্থ ধারণা? বিশেষ করে, সংবাদমাধ্যমের এই যে ব্যাপক প্রচারণা চলছিল সেই প্রপাগাণ্ডার ডামাডোলের মধ্যে সাধারণ জনগণের বড় একটি অংশের মধ্যে কি মামলাটি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়নি? অথবা আমরা যদি এই সত্যটাও স্বীকার করেই নিই যে, সাধারণ দোকানদাররা– বিশেষ করে যারা গ্রে-মার্কেটে লেনদেনের কোনো প্রকার ক্যাশমেমো না রেখেই বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রী বিক্রি করে, তারা কি দিল্লী পুলিশের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত?

আমি এতক্ষণ যেসব অসামঞ্জস্য তুলে ধরালাম, সেসব আমার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে পরিচালিত গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি নয়। বরং নির্মলাংশু মুখার্জীর লেখা 'ডিসেম্বর ১৩ : টেরর ওভার ডেমোক্র্যাসি' (বাংলায়– '১৩ ডিসেম্বর : গণতন্ত্রের ওপর সন্ত্রাস') নামে একটি অসাধারণ গ্রন্থে এ সংক্রান্ত অসংখ্য তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাবে। এর দুটো প্রতিবেদন ('ট্রায়াল অব এররস' {ভুলে ভরা তদন্ত} এবং 'ব্যালান্সিং অ্যাক্ট' {ভারসাম্যমূলক কর্মকাণ্ড}) দিল্লীর "পিপলস' ইউনিয়ন ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইটস" প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিচারিক আদালত, হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের মামলার রায়ের যে বড় বড় খণ্ড রয়েছে তা এর তিন খণ্ডের ভেতরে বেশ ভালোভাবে নথিভুক্ত হয়েছে।[২৯]

এবং এর সবগুলোই পাবলিক ডকুমেন্ট, অর্থাৎ এগুলো 'উন্মুক্ত নথি' যা আমার টেবিলের ওপর পড়ে আছে। তা হলে কেন এই সমগ্র তমসাচ্ছন্ন ব্যাপারটি নিজেকে পরিষ্কার করার জন্য এভাবে আকুল হয়ে আছে। আর আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ব্যস্ত লালায়িত রাজনীতিক এবং অজ্ঞ মানুষের মধ্যে শূন্যগর্ভ বিতর্ক আয়োজনে। একটি দুটো আকস্মিক ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ সংবাদপত্র প্রথম পাতার প্রথম সারিতেই এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের গল্প ছাপায় যে, কে হতে যাচ্ছে জল্লাদ; অথবা মোহাম্মদ আফজালকে যে দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে তার দৈর্ঘ, প্রস্থ, ওজন কেমন হতে পারে– এসবের অত্যন্ত নিষ্ঠুর বর্ণনা।[৩০]

ব্যাপারটা তা হলে এমন কেন? 'ফ্রি প্রেস' বা মুক্ত সংবাদের বন্দনা করতে আমরা কি ক্ষণিকের জন্য এসব অপলাপ থেকে বিরত থাকতে পারি না?

বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই এটা সহজ কাজ নয়, তারপরও তুমি যে ধারণার বশবর্তী হয়ে আছো ক্ষণিকের জন্য হলেও সেই ভাবালুতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করো যে, 'পুলিশ' মাত্রই 'ভালো' / 'সন্ত্রাসী' মাত্রই 'শয়তান'। আমাদের সামনে যেসব আলামত রয়ে গেছে সেখান থেকে আমরা যদি বিশ্বাসগত ফাঁদগুলো বাদ দিই, তবে আমাদের সামনে অত্যন্ত ভয়াবহ কিছু সম্ভাব্য-চিত্র প্রকাশিত হবে। এটি আমাদের এমন একটি দিক নির্দেশ করে, যেদিকে আমাদের বেশিরভাগ লোকই দৃষ্টিপাত করতে চায় না।

এই মামলার পুরো বিচারব্যবস্থার ভেতরে সবচেয়ে অবহেলিত আইনি নথিপত্রের পুরস্কারটি পাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ নম্বর ধারায় অভিযুক্ত আফজাল হোসেনের দেওয়া জবানবন্দী। এই নথিপত্রের মাধ্যমে আদালতে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অভিযোগ প্রশ্ন সহযোগে উপস্থাপন করা হয়। এসব নথিপত্রকে আফজাল হয় স্বীকার করে নেবে, নয়তো এগুলোর বিরুদ্ধে সে আপত্তি তুলবে। এবং আফজালের নিজের ভাষায় পুরো ব্যাপারটি তুলে ধরারও সুযোগ রয়েছে। অথচ আফজালের ক্ষেত্রে কখনই সত্যিকার অর্থে বাস্তব সম্মতভাবে তার নিজের বক্তব্য যথাযথভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়নি। একমাত্র এই জবানবন্দীর নথিপত্রই তার নিজের ভাষায় বলা গল্প হিসেবে আমাদের সামনে প্রকাশ পায়।

এই নথিপত্রে তার বিরুদ্ধে আনা কিছু কিছু অভিযোগ আফজাল স্বীকার করে নিয়েছে। সে এটা স্বীকার করেছে যে, তারিক নামের একটি লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে এটাও স্বীকার করেছে যে, তারিক তাকে মোহাম্মদ নামে একজন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এবং সে এটাও স্বীকার করেছে যে, মোহাম্মদকে সে দিল্লীতে আসতে এবং তাকে একটি পুরনো সাদা রঙের অ্যাম্বাস্যাডর গাড়ি কিনে দিতে সাহায্য করেছিল। সে আরো স্বীকার করেছে যে, পার্লামেন্ট ভবন হামলায় যে পাঁচজন ফিদাঈন নিহত হয়েছিল, তাদের একজন এই মোহাম্মদ। অভিযুক্ত হিসেবে আফজালের জবানবন্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সে নিজেকে সম্পূর্ণ দোষী অথবা পরিপূর্ণ নির্দোষ দাবি করার কোনো চেষ্টা করেননি। বরং সে তার কার্যক্রমগুলোকে সেইসব পরিপ্রেক্ষিতের ভেতর দিয়ে দেখিয়েছে– যা ছিল বিপর্যয়কর। আফজালের জবানবন্দী এই ব্যাখ্যা করে যে, পার্লামেন্ট ভবন হামলার ব্যাপারে সে কী ধরনের পারিপার্শ্বিক ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এটা সেই সব কিছু কারণের দিকেও আমাদের বোধোদয়কে নিয়ে যেতে চায় যে, তদন্তপ্রক্রিয়াটি কেন এত তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছিল। এবং সবচেয়ে ক্রান্তি কালীন বাঁকের মুহূর্তেই কেন এটি সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে গেছে? এবং

এটাও অতি গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঘটনাকে আমরা শুধুমাত্র অদক্ষতা বা তাড়াহুড়োর ফল হিসেবে বাতিল করতে পারি না। এমন কি আফজালের কথা বিশ্বাস না করলেও আমরা জানি বিচারব্যবস্থা কীভাবে চলেছিল এবং স্পেশাল সেলের ভূমিকাই বা কি ছিল। এ বিষয়ে আমাদের অন্য কোনো অজুহাত থাকতে পারে না যে, কেন আমরা সেই দিকে তাকালাম না যেদিকে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল। সে একেবারে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য দিয়েছিল, কিছু নাম, কিছু স্থান এবং কিছু তারিখ। (ব্যাপারটা মোটেও সহজ ছিল না, বিশেষত যখন তার নিজের পরিবারবর্গ, তার ভাই, তার স্ত্রী, তার বাচ্চারা কাশ্মীরেই বসবাস করতো। এবং সেই সব লোকদের কাছে তারা ছিল খুবই সহজ শিকার যাদের নাম সে উচ্চারণ করতো বা যাদের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ তুলতো।)

আফজালের নিজের কথায় :

> জম্মু এবং কাশ্মীরের সপর-এ আমি থাকতাম। ২০০০ সালে যখন আমি সেখানে ছিলাম, সেনাবাহিনীর লোকজন আমাকে প্রায় প্রতিদিনই নাজেহাল করতো। রাজামোহন রায় নামের এক লোক আমাকে প্রায়ই বলতো যে, 'এ এলাকার সশস্ত্র গোষ্ঠী সম্পর্কে যা জানো, আমাকে তা বলো'। আমি ছিলাম একজন আত্মসমর্পনকৃত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য। এবং প্রতি রবিবার সামরিক ক্যাম্পে এ ধরনের আত্মসমর্পনকৃত সশস্ত্র বাহিনীর সব সদস্যকে হাজিরা দিতে হতো। আমাকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হতো না, কিন্তু সে আমাকে প্রায়ই হুমকি দিতো। আমি প্রায়ই তাকে সামান্য টুকরো টুকরো কিছু তথ্য দিতাম। নিজেকে রক্ষা করতে এসব তথ্য আমি বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করতাম। ২০০০ সালের জুন/ জুলাইয়ের দিকে আমি আমার গ্রাম ছেড়ে বরামোল্লা নামে একটি শহরে চলে যাই। শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী একটি দোকানের ব্যবসা চালাতাম আমি, যেখানে মূলত এসব পণ্যের কমিশন থেকে আমার আয় হতো। একদিন আমি স্কুটারে করে যাওয়ার সময় এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স)-এর লোকজন হঠাৎ এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তারা টানা পাঁচ দিন আমার ওপর নির্যাতন চালায়। কেউ একজন এসটিএফ-কে এই তথ্য দিয়েছিল যে, আমি পুনরায় সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছি। সে ব্যক্তিকে আমার সামনে হাজির করা হয়েছিল, এবং আমার সামনেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে আমাকে ২৫ দিন এসটিএফ-এর অধীনে বন্দী থাকতে হয়। এবং প্রায় এক লাখ রুপির (দুই হাজার ডলার) বিনিময়ে আমি তাদের হাত থেকে ছাড়া পাই। স্পেশাল সেলের লোকজন এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেছিল যে, প্রকৃতই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এরপর এসটিএফ আমাকে

একটি সনদপত্র দেয় এবং তারা আমাকে ছয় মাসের জন্য স্পেশাল পুলিশ অফিসার বানায়। তারা জানতো যে, আমি তাদের হয়ে কাজ করবো না। এসটিএফ-এর হেজাফতে থাকার সময় পালহালানের এসটিএফ ক্যাম্পে তারিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তারিক পরবর্তীতে শ্রীনগরে আমার সঙ্গে দেখা করে। এবং আমাকে বলে যে, সে মূলত এসটিএফ-এর পক্ষেই কাজ করছে। আমি তাকে বলেছিলাম, আমিও এসটিএফ-এর পক্ষে কাজ করছি। মোহাম্মদ, পার্লামেন্ট ভবন হামলায় যে নিহত হয়, তারিকের সঙ্গেই ছিল। তারিক আমাকে বলল যে, কাশ্মীরের 'কেরন' সেক্টর থেকে সে এসেছে। তারিক আরো জানালো যে, মোহাম্মদকে আমার দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ কিছু দিনের জন্য দিল্লী থেকে মোহাম্মদকে দেশের বাইরে যেতে হবে। আমি জানতাম না যে, ২০০১ সালের ১৫ ডিসেম্বর শ্রীনগর পুলিশ কেন আমাকে গ্রেফতার করেছিল। আমি সে সময় বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীনগরের একটি বাসে উঠেছিলাম। সাক্ষী আকবর এই কোর্টে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, ২০০০-এর ডিসেম্বরে বছরখানেক আগে সে আমার দোকানে অভিযান চালায় এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমি নাকি নকল সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি বিক্রি করছি। একথা বলে সে আমার কাছ থেকে ৫০০০ রুপি ছিনিয়ে নেয়। স্পেশাল সেলে আমার ওপর নির্যাতন চালানো হয়, এমন কি ভূপ সিং নামে একজন আমাকে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করে। এবং সেখানেই আমি দেখি এস.এ.আর. গিলানির পরিবারকে। গিলানি তখন অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ছিলেন। এমন কি তার তখন দাঁড়িয়ে থাকার মতো অবস্থাও ছিল না। শারীরিক পরীক্ষার জন্য আমাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রাখা হতো যে, ডাক্তারকে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে, আমরা ভালো আছি। এর সঙ্গে আমাদের এই হুমকিও দেওয়া হতো যে, যদি আমরা তা না করি তবে আমাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন চালানো হবে।

এরপর সে আরো কিছু তথ্য সংযুক্ত করার জন্য আদালতের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে।

পার্লামেন্ট হামলায় নিহত সন্ত্রাসী মোহাম্মদ কাশ্মীর থেকে আমার সঙ্গে দিল্লী এসেছিল। এ লোকটিকে আমার হাতে যিনি তুলে দেন– তার নাম তারিক। সিকিউরিটি ফোর্স এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এসটিএফ-এর সঙ্গে কাজ করে তারিক। সে আমাকে জানিয়েছিল, যেহেতু সে সিকিউরিটি ফোর্স ও এসটিএফ-

এর সঙ্গে রয়েছে তাই মোহাম্মদকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা হলে সে আমাকে সাহায্য করবে। তারিক এও বলেছিল যে, মোহাম্মদকে শুধু দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই চলবে। অন্যদিকে, আমি যদি মোহাম্মদকে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ায় সাহায্য না করি তবে আমাকে অন্য কোনো মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাধ্য হয়ে মোহাম্মদকে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে দিই। এবং আমি এটাও জানতাম না যে, সে একজন সন্ত্রাসী ছিল।

সুতরাং এখানে নাটের গুরু আসলে কে ছিল– সে সম্পর্কে আমরা এখান থেকে একটি দৃশ্যপট দেখতে পাচ্ছি। 'সাক্ষী আকবর' (যে এ মামলার ৬২ নং সাক্ষী), এই মো. আকবর জম্মু ও কাশ্মীরের পারিমপরা পুলিশ হেড কন্সটেবল, যে আফজালের গ্রেফতারের সময় জব্দকৃত মালামালের তালিকায় স্বাক্ষর করেছিল। এই বিচারপ্রক্রিয়ার একটি সময়ের অত্যন্ত হিম-আতঙ্কের একটি বর্ণনা দিয়ে আফজাল তার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর কাছে একটা চিঠি লেখে। আদালতে সাক্ষী আকবর, যে কিনা এই জব্দকৃত মালামালের তালিকার ব্যাপারে শ্রীনগর থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এসেছিল, আফজালকে পুনরায় আশ্বস্ত করে যে, 'কাশ্মীরে তার পরিবার 'এখনো' ভালো আছে।' আফজাল সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে যে, এটা আসলে প্রচ্ছন্ন একটি হুমকি। আফজাল এটাও জানায় যে, তাকে যখন শ্রীনগরে গ্রেফতার করে পারিমপরা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তখন তাকে লাঠিপেটা করা হয়, এবং খুব সরলসাদাভাবে জানানো হয় যে, যদি সে তাদের কথা মতো না চলে তবে তার স্ত্রী ও পরিবারের আর সবাই খুব বিপর্যয়কর পরিণতির শিকার হবে। (আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে, আফজালের ভাই হিলাল পরবর্তীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাস ধরে এসওজি-এর হাতে অবৈধভাবে বন্দী ছিল।)

এই চিঠিতে আফজাল বর্ণনা দিয়েছে, কীভাবে এসটিএফ ক্যাম্পে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। তার যৌনাঙ্গের ওপর বিদ্যুৎ শলাকা দিয়ে শক দেওয়া হয় এবং পায়ুপথে মরিচের গুড়ো ও পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হয়। সে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট দ্রাবিন্দ্র সিং-এর নাম উল্লেখ করে বলে যে, দ্রাবিন্দ্র সিং তাকে বলেছিল, দিল্লীতে তাকে 'ছোটখাট একটা কাজ' করতে হবে। এবং সে এটাও বলেছিল, চার্জশীটে যেসব ফোন নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, তার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলে এর কোনো কোনোটির সঙ্গে কাশ্মীরের এসটিএফ ক্যাম্প পর্যন্ত যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

এটা আফজালের গল্প যেটা আমাদের সামনে এক ঝলকের জন্য দৃশ্যপট তুলে

ধরে যে, কাশ্মীর উপত্যকার জীবন সত্যিকার অর্থে কী রকম। এটা তো একটি বইয়ের প্রতিলিপি মাত্র। আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনে থাকি যে, ওখানকার নিরাপত্তা বাহিনী সশস্ত্র জঙ্গিদের মোকাবিলা করছে, আর নির্দোষ কাশ্মীরিরা মধ্যে মধ্যে এই গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যায়। আর এর যদি আরেকটু সাবালক সংস্করণ পাই, তা হলে দেখবো– কাশ্মীর হচ্ছে এমন একটি উপত্যকা যেটি পরিপূর্ণ হয়ে আছে অসংখ্য জঙ্গি, আছে বিশ্বাসঘাতক, নিরাপত্তা বাহিনী, ডাবল-এজেন্ট (দ্বৈত-ভূমিকার গুপ্তচর), ইনফরমার (তথ্য সংগ্রহকারী), ভূতুরে ঘটনা, ব্ল্যাকমেইলার, ব্ল্যাকমেইলিজ (যাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে), চাঁদাবাজ, গুপ্তচর (যারা ভারত বা পাকিস্তান–দুই দেশেরই হতে পারে।), আরো আছে নানা ধরনের মানবাধিকার কর্মী, এনজিও এবং অকল্পনীয় পরিমাণ হিসাব বহির্ভূত অর্থ ও অস্ত্র। এখানে এটা পরিষ্কার করে বোঝার উপায় নেই যে, কোথায় এই সব জিনিস ও জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা আছে। এবং এটা বলা খুব সহজ নয় যে, এই অঞ্চলে কে আসলে কার পক্ষে কাজ করছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় অন্য সব কিছুর চেয়ে 'সত্য' জিনিসটি হলো সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার। যত গভীরে আপনি ঘটনার অনুসন্ধান করবেন, ততই জিনিসটা খারাপের দিকে যাবে। এবং আপনি যদি কোনো ঘটনার একেবারে তলদেশে চলে যান, তবে দেখতে পাবেন এসওজি (স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ) এবং এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স)-কে– যাদের কথা বলেছিল আফজাল। এরাই হচ্ছে সে সব নির্মম আইন-শৃঙ্খলা-বহির্ভূত ভয়াবহ উপাদান যেটা কাশ্মীর উপত্যকাতে ভারতীয় নিরাপত্তাব্যবস্থার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে। অন্য সব প্রাতিষ্ঠানিক বাহিনী থেকে এদের পরিবেশ পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। এরা নিজেদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে ধোঁয়াটে আলো আঁধারে, যেখানে পুলিশ, বিভিন্ন আত্মসমর্পনকৃত জঙ্গি, কিংবা বিশ্বাসঘাতক এবং সাধারণ কোনো অপরাধী– সবাই নিজেদের স্বার্থচরিতার্থ করছে। এবং তারা স্থানীয় সাধারণ মানুষকেই শিকার হিসেবে বেছে নেয়। তাদের প্রধান শিকার হচ্ছে কাশ্মীরের হাজার হাজার তরুণ, যারা নাকি বড় হয়েছে বিভিন্ন বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে; যেমন– ১৯৯০-এর প্রথম দিকে সৃষ্ট অত্যন্ত অরাজক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যারা বেড়ে উঠেছে। এদের অনেকেই, যারা আত্মসমর্পন করেছে, একটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায়।

১৯৮৯ সালে আফজাল যখন সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করেছিল, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। কিন্তু সে কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই ফেরত এসেছিল, এবং এ জাতীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার

মোহমুক্তি ঘটেছিল। সে তার অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে চলে এসেছিল এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। ইতিপূর্বে সশস্ত্র যোদ্ধার কোনো চর্চা তার ছিল না, ১৯৯৩ সালে আফজাল স্ব-উদ্যোগে বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। অযৌক্তিকভাবেই এখান থেকে তার দুঃস্বপ্নের শুরু। তার এ আত্মসমর্পণকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তার জীবন নরকে পরিণত হয়। একজন কাশ্মীরি তরুণ যুবককে কি দোষ দেওয়া যাবে যদি তারা আফজালের এ অবস্থা থেকে এ শিক্ষা নেয় যে, অস্ত্র আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা শুধু গাধার মতো নয়, উন্মাদের ন্যায় কাজ হবে এবং তারপর একটি দুর্বিষহ নিরন্তর বর্বরতার মধ্যে নিজেকে পৌঁছে দেওয়া হবে।

মোহাম্মদ আফজালের এই কাহিনি কাশ্মীরের জনগণকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। কেননা তার এ কাহিনি আসলে কাশ্মীরের আর সকলেরই কাহিনি। তার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা অন্য যে কারো ক্ষেত্রে ঘটতে পারতো। এগুলো আসলে অবিরতই ঘটে যাচ্ছে এবং অতীতেও ঘটেছে কাশ্মীরের হাজার হাজার তরুণ এবং তাদের পরিবারের ওপরে। পাথর্ক্য একটাই যে, তাদের ঘটনাগুলো ঘটেছে হয়তোবা যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রের ক্ষুদ্র কোনো জায়গায়, সামরিক ক্যাম্প অথবা পুলিশ স্টেশনে– যেখানে তাদেরকে হয়তো ছ্যাঁকা দেওয়া হয়, কিংবা প্রহার করা হয়, বিদ্যুতের শক দেওয়া হয়, এবং ব্ল্যাকমেইল বা হত্যা করা হয়। তাদের লাশগুলোকে ট্রাকের পেছন থেকে ফেলে দেওয়া হয় যাতে কোনো পথচারি যেন খুঁজে পায়। অন্যদিকে আফজালের ঘটনাটা মধ্যযুগীয় কোনো নাট্যমঞ্চে ঘটেছে এবং সেই নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে পরিষ্কার দিবালোকে জাতির মূল রঙ্গমঞ্চে। তথাকথিত গণতন্ত্রের যত অনুষ্ঠান আর বাগাড়ম্বর আছে, 'মুক্ত সাংবাদিকতা'র যত শূন্যগর্ভ সুবিধাদি রয়েছে, এবং একটি 'নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা'র আইনগত যে ধারাবাহিকতা রয়েছে– এই সবকিছু সমর্থনের মাধ্যমে তার এ কাহিনি পরিচালিত হয়েছে।

আফজালকে যদি ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, তা হলে আমরা কখনই মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে পারবো না যে, কে আসলে ভারতীয় পার্লামেন্টে আক্রমণ করেছিল। এটা কি লস্কর-এ-তৈয়বা? জইশ-এ-মহম্মদ? নাকি এর উত্তর রয়ে গেছে এই দেশের অত্যন্ত গভীর গোপনীয় কোনো কেন্দ্রস্থলে– যেখানে আমরা বসবাস করি, এবং যাকে আমরা ভালোবাসি বা ঘৃণা করি নিজেদের মতো করে সুন্দর বা জটিল বা কাঁটা বিছানো পথে?

১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট আক্রমণের এ ঘটনায় একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটি

থাকা উচিত ছিল। বিচারিক কাজে এই ঘটনার তদন্ত এখনও অবশ্য বাকি রয়ে গেছে, 'সপর'-এ আফজালের পরিবারের লোকজনদের অবশ্যই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে হবে, কেননা, তারাও জিম্মি হতে পারে এই অদ্ভুত কাহিনির।

সত্যিকারে কি ঘটেছে সেটা না জেনেই আফজালকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়াটা হবে এমন একটি অপকর্ম যা সহজে ভুলে যাওয়া যাবে না। কিংবা একে ক্ষমা করা হবে না, এবং সেটা উচিতও নয়।

এমন কি ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত হলেও।

খবরের
ভেতরের
খবর

পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের ওপর বিভিন্ন আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং লেখকদের লেখা একটি সংকলন বই '১৩ ডিসেম্বর – এ রিডার : দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব দ্য অ্যাটাক অন দ্য পার্লামেন্ট' (নয়া দিল্লি : পেঙ্গুইন বুক ইন্ডিয়া, ২০০৬) -এর ভূমিকা হিসেবে এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

২০০১-এর ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের পর এই বইয়ের পাঠক ('১৩ ডিসেম্বর – এ রিডার : দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব দ্য অ্যাটাক অন দ্য পার্লামেন্ট', ২০০৬) প্রায় পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সাংবাদিকের কাছে গেছেন। যখন পাঁচ জন জঙ্গি (কারো মতে ছয় জন) একটি সাদা অ্যাম্বাস্যাডর গাড়িতে করে ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবনের প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে পড়েছিল, তখন তারা এমন একটা কিছু করার চেষ্টা করছিল যেটা শেষ পর্যন্ত দেখে মনে হচ্ছিল, এটি বিস্ময়করভাবেই একটি অপরিকল্পিত অদক্ষ সন্ত্রাসী হামলা।

এর পরবর্তী ঘটনাগুলো আমরা যদি এক জায়গায় জড়ো করি, দেখবো, দক্ষতাই যেন হয়ে উঠল সব জায়গার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন: আলামত সংগ্রহ করা, অথবা দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল কর্তৃক তদন্ত কাজের যে মারাত্মক গতি কিংবা অভিযুক্তদের যে দ্রুততার সঙ্গে গ্রেফতার করা এবং তার বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করা, আর দ্রুত বিচার আদালতে শুরু হওয়া ৪০ মাস ব্যাপী বিচার প্রক্রিয়া।

এ সব ঘটনার মধ্যে এই শব্দগুলো মনে হয় সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে, সেটা হচ্ছে, আপনি যদি পুরো ঘটনাটি খুব সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করেন তবে দুই ধরনের ছদ্মবেশ দেখতে পাবেন। একটি ছদ্মবেশ হলো– 'দক্ষতা'র সমাহার (মাত্র দুই দিনের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং রহস্য উন্মোচন করা।) আর তারপরেই যখন সব কিছু রহস্যময় হয়ে উঠতে শুরু করলো, তখনই প্রকাশ পেল আরেকটি মুখোশ– সেটি হলো লজ্জাজনক অদক্ষতা (অত্যন্ত দুর্বল অথবা ভুয়া আলামত, কিংবা কার্যবিধি পালনে দুর্বলতা, এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদান)। কিন্তু এই সব কিছুর গভীরেও, যেমনটি এই সংকলনের প্রতিটি প্রবন্ধেই তুলে ধরা হয়েছে, সেটা যেন এগুলো থেকে অধিকতর পৈশাচিক এবং দুশ্চিন্তাযুক্ত। বিগত কয়েক বছরে এই দুশ্চিন্তা বাড়তে বাড়তে পর্বতের সমান আকার ধারণ করেছে। এটি ভুল ধারণা বা ভুল চিন্তাভাবনার পর্বত, যা উপেক্ষা করা অসম্ভব।

পার্লামেন্ট আক্রমণের পরের দিন ১৪ ডিসেম্বর ২০০১ থেকেই সন্দেহের সূত্রপাত হয়। পুলিশ এস.এ.আর. গিলানি নামে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ প্রভাষককে গ্রেফতার করলো। এই গিলানি ছিলেন গ্রেফতারকৃত চার জনের একজন। তার বিক্ষুব্ধ সহকর্মী এবং বন্ধুরা, যারা নিশ্চিত ছিলেন যে, গিলানিকে

একটি নাটকের কুশিলব বানিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা যোগাযোগ করলেন খ্যাতনামা আইনজীবী নন্দিতা হাস্করের সঙ্গে এবং মামলটি গ্রহণ করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়। গিলানির জন্য একটি নিরপেক্ষ বিচারপ্রক্রিয়ার প্রচারণার সূত্রপাত ঘটেছিল এর মাধ্যমেই। এই প্রচারণা চলেছিল গণউন্মাদনার ভেতর দিয়েই। তখনকার গণমাধ্যম অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে যে ক্ষতিকর প্রচারণা চালাচ্ছিল, গিলানির এই হিতাকাঙ্খী নিরপেক্ষ অংশটি এমন প্রপাগাণ্ডার বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিল। তাদের এ প্রচারণা সাফল্যের মুখ দেখে এবং গিলানি শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণিত হন। তার সঙ্গে এই মামলার আরেকজন আসামী আফসান গুরুও নির্দোষ প্রমাণিত হয়।

গিলানির এই 'নিরাপরাধ' অবস্থা পার্লামেন্ট হামলা মামলার বিবরণীর ভেতরে এক প্রকাণ্ড শূন্যতা সৃষ্টি করে। অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে জনগণের মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, দুজন ব্যক্তির 'নির্দোষ' সাব্যস্ত হওয়াটা অন্য দুই ব্যক্তির দোষটাকেই যেন আরো নিশ্চিত করে তুললো। সরকার যখন ঘোষণা করলো যে, মোহম্মদ আফজাল গুরু– যে এ মামলার এক নম্বর আসামী– তাকে ২০০৬-এর ২০ অক্টোবর ফাঁসি দেওয়া হবে, এ ঘোষণায় মনে হলো, বেশির ভাগ মানুষই যেন এটাকে স্বাগত জানালো। এবং এ স্বাগত মনোভাব প্রকাশ করলো এক ধরনের অসুস্থ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু তারপরও কিছু প্রশ্ন পুনরায় সামনে চলে এলো। গিলানির বিরুদ্ধে মামলার যে বিবরণী– সেটা অনুধাবন করা মোটামুটিভাবে সহজ। তাকে হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়াই তুলে আনা হয়। এবং এই 'ষড়যন্ত্রের' মূলবেদীতে হঠাৎ করেই তাকে সংস্থাপিত করা হয়। আফজালের ব্যাপারটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। আজকের দিনে কাশ্মীর যেমনটা হয়েছে, সেরকম একটি নরকের পয়ঃনিষ্কাষণ প্রক্রিয়ার ভেতর থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার আবির্ভাব ঘটেছিল একটি ম্যানহোলের ভেতর দিয়ে, যার সমগ্র শরীর ছিল মলমূত্র-আবর্জনায় ঢাকা। (এবং যখন সে আবির্ভূত হলো স্পেশাল সেলের পুলিশরা তার ওপর 'মূত্রত্যাগ' করলো।[১]) প্রথম যে জিনিসটা তারা তাকে করতে বাধ্য করলো, তা হলো– সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকারোক্তি দেওয়া– যাতে এ হামলার ঘটনায় সে নিজেকে পুরোটা জড়িয়ে বক্তব্য দেয়।[২]

যে গতিতে এসব ঘটনা ঘটলো সেটা আমাদের অনেককেই এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে, সে যেভাবে অভিযুক্ত হয়েছে প্রকৃতই সে তেমনই অপরাধী। একমাত্র বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম, কোন ঘটনাচক্রে বা কোন পরিস্থিতিতে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল। এমন কি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এ কথা বলে তার এই স্বীকারোক্তিকে

বাতিল করতে বাধ্য হলো যে, পুলিশ এ ক্ষেত্রে আইনগত রক্ষাকবচের মূলনীতিগুলোকে লঙ্ঘন করেছে।[১]

প্রথম পর্যায় থেকেই আফজালের ঘটনাতে কোনো কিছুই খুব পরিষ্কার ছিল না। এমন কি আজকের দিনেও আফজাল কখনই দাবি করে না যে, সে পুরোপুরি নির্দোষ। এখানে মূলত পরীক্ষা করার বিষয় হলো, কোন 'মাত্রা'য় তার সম্পৃক্ততা ছিল। উদাহরণ হিসেব বলা যায়, তাকে কি বলপ্রয়োগ করে কাজটি করতে বাধ্য করা হয়েছিল? তাকে কি অত্যাচার করা হয়েছিল? এই মূল ঘটনার পারিপার্শ্বিক কিছু ঘটনাতে ভূমিকা রাখার জন্য তাকে কি ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছিল? তার কোনো আইনজীবী ছিল না, যার মাধ্যমে সে তার নিজস্ব বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করতে পারতো; কিংবা কারো সাহায্য নিতে পারতো, যেন এসব মিথ্যা বা বানোয়াট জালের সূত্র ছিন্ন করে তাকে বের করে আনতে পারে। বেশ কিছু স্বতন্ত্র মানুষ এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এই কাহিনি, যেটা একদল আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, লেখকরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন– তা এই '১৩ ডিসেম্বর – এ রিডার : দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব দ্য অ্যাটাক অন দ্য পার্লামেন্ট' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে ধারণ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলোকে জাতীয় মতৈক্য বলে মনে হচ্ছিল, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গণউন্মাদনা– সাম্প্রতিক সময়ে এই দুটো আবেগকে ভেদ করা সম্ভব হয়েছে। যদিও সেই বাধার পর্বত টপকে যেতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত আমরা সেই প্রতিবন্ধকতার কাছে পৌঁছতে পেরেছি অন্তত।

বেশির ভাগ মানুষের কাছে যখন সত্য ঘটনা প্রতিভাত হয়, অথবা একটি যুক্তিনির্ভর তর্কবিতর্কের মুখোমুখি হয়, তখন তাদের ভেতর থেকে যথাযথ প্রশ্নগুলো বের হতে শুরু করে। এবং এই পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের মামলার ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে সে ধরনের একটি ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। এ প্রশ্নগুলোর ওপর জনমতের প্রভাব ও চাপ পড়েছে। এই চাপ থেকেই শুরু হয়েছে গুজব। এই গুজবের মধ্য দিয়েই কিছু কিছু লোক, যারা নাকি মানুষের পর্যবেক্ষণের তালিকায় চলে এসেছে– এসব ধোঁয়াটে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রয়েছে কাউন্টার-ইন্টিলিজেন্সি, সিকিউরিটি এজেন্সি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। তারা পতাকা উড়িয়ে চলেন, অসদাচরণের নিন্দা জানান, ক্ষমতার অপব্যবহারে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের পূর্বকৃত অপকর্মকে আরো বেশি করে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এবং এর মাধ্যমেই তারা তাদের কর্মকাণ্ডের স্বরূপ আরো বেশি করে উন্মোচিত করে দেন।

জনগণের উদ্বেগ-অস্বস্তি দিনে দিনেই বাড়তে লাগলো। একদল মানুষ

একত্রিত হয়ে একটি কমিটি গঠন করলো (যার সভাপতি হলেন নির্মলা দেশপাণ্ডে)। তারা খোলাখুলিভাবে এই দাবি উচ্চারণ করলেন যে, এই পুরো কাহিনি তদন্তে একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হোক।[৪] এই একই বিষয়ে একটি অনলাইন আবেদন আহ্বান করা হলো।[৫] হাজার হাজার লোক এটাতে স্বাক্ষর করলেন। প্রতিদিনই সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা ইন্টারনেটে নতুন নতুন কলাম প্রকাশ পেতে লাগলো। পুরো ঘটনা কোন দিকে গড়ায়, কম করে হলেও ছয়টার মতো ওয়েবসাইট সেদিকে অনুসরণ করতে শুরু করলো । তারা প্রশ্ন তুললেন কীভাবে মোহাম্মদ আফজাল, যার কখনই যথাযথ আইনানুগ প্রতিনিধি ছিল না, তাকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হলো। কোনো ধরনের নিরপেক্ষ বিচার ছাড়াই যার বক্তব্য শোনার কোনো সুযোগ ঘটেনি কখনো। সেই সব বানোয়াট আলামতের দিকে তারা প্রশ্ন তুললেন। এ ছাড়াও কার্যবিধির ত্রুটি বিচ্যুতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদালতের সামনে উপস্থাপন করা ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা ডাহা মিথ্যাচারের বিরুদ্ধেও তারা প্রশ্ন তুললেন। তারা দেখালেন, উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে একটা আলামতও ধোপে টিকবে না।

এবং তারপরই এর থেকেও বেশি বিব্রতকর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে লাগলো, যেগুলো– মোহাম্মদ আফজালের পরিণতি কী হবে, সেটা ছাড়িয়েও যার পরিধি আরো বহুদূর বিস্তৃত। এখানে ১৩ ডিসেম্বরের ওপর তোরোটা প্রশ্ন রাখা গেল :

প্রশ্ন ১ : পার্লামেন্টে হামলার প্রায় এক মাস আগে সরকার এবং পুলিশ, উভয়ই বলে যাচ্ছিল যে, যেকোনো সময় পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণ হতে পারে। ১২ ডিসেম্বরও একটি অনানুষ্ঠানিক সভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী পার্লামেন্টে আসন্ন হামলার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।[৬] ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্টের ওপর হামলা হয়ে গেল। যেহেতু এ হামলারা কথা জানা আছে এবং এ জন্য অধিকতর উন্নত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল, তারপরও কীভাবে একটি বিপুল বিস্ফোরকভরা গাড়িবোমা পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করতে পারলো?

প্রশ্ন ২ : হামলার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল বললো যে, এটা ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় করা একটি যৌথ অপারেশন, যা চালিয়েছিল লস্কর-এ-তৈয়বা এবং জইশ-এ-মহম্মদ। স্পেশাল সেল জানালো, এ হামলার নেতৃত্বে ছিল মোহাম্মদ নামের একটি ব্যক্তি, যিনি ১৯৯৮ সালে আইসি-৮১৪ ছিনতাই করার ঘটনাতেও জড়িত ছিলেন (পরবর্তীতে অবশ্য সিবিআই এ দাবিকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করে।[৭]) এর কোনোটাই আদালতে কখনই প্রমাণিত হয়নি। তা হলে এ দাবির পেছনে স্পেশাল সেলের কী প্রমাণ ছিল?

প্রশ্ন ৩ : সমগ্র হামলার ঘটনাটি নিরাপত্তা ক্যামেরায় (সিসিটিভি) রেকর্ড করা

হয়েছিল। কংগ্রেস পার্টির সংসদ সদস্য কপিল শিবাল পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই সিসিটিভিতে রেকর্ডকৃত দৃশ্য পার্লামেন্টে দেখানোর দাবি তুললেন। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নাজমা হেপতুল্লাহ তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে মানুষের মনে দ্বিধা তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস পার্টির চিফ হুইপ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বলেন, 'আমি গুণে দেখেছি গাড়ি থেকে ছয় জন লোক বের হচ্ছে। কিন্তু মাত্র পাঁচ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। সিসিটিভি ক্যামেরা রেকর্ডিংয়ে খুব পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ছয় ব্যক্তি সেখানে।'[৮] যদি দাশমুন্সি ঠিক হয়ে থাকেন তবে পুলিশ কেন বললো, সেই গাড়িতে পাঁচজন লোক ছিল? তা হলে ৬ নম্বর ব্যক্তিটি কে? সে এখন কোথায়? কেন সিসিটিভি-তে ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজটি বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য আদালতে আলামত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি? কেন এটা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়নি?

প্রশ্ন ৪ : যখন এ ধরনের কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো, তখন কেন সংসদের অধিবেশন মুলতবী করে দেওয়া হলো?

প্রশ্ন ৫ : ১৩ ডিসেম্বরের কিছু দিন পরেই সরকার ঘোষণা করলো যে, এ হামলায় পাকিস্তানের যোগসাজশের অপরিবর্তনীয় প্রমাণ রয়েছে তাদের কাছে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সরকার প্রায় পাঁচ লাখ সেনাসদস্যকে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েনের ঘোষণা করলো। উপমহাদেশকে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেওয়া হলো। আফজালের স্বীকারোক্তি ছাড়া, যেটা নির্যাতনের মাধ্যমে তার কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল (পরবর্তীতে যেটা সুপ্রিম কোর্ট 'অগ্রহণযোগ্য' বলে রায় দিয়েছিল), কী তা হলে সেই অপরিবর্তনীয় প্রমাণ?

প্রশ্ন ৬ : এটা কি সত্য যে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সেনামোতায়েনের এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৩ ডিসেম্বর এ হামলার বহু পূর্বেই?

প্রশ্ন ৭ : এই যে এক বছর ধরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সেনামোতায়েনের প্রক্রিয়া চলেছিল– এতে কত টাকা খরচ হয়েছিল? কত সৈন্য এ প্রক্রিয়াতে নিহত হয়েছিল? শুধুমাত্র স্থলমাইনগুলো কোনোরকমে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কত সৈন্য এবং সাধারণ জনগণের মৃত্যু হয়েছিল? সেনাবাহিনীর ট্রাক ও ট্যাঙ্ক গ্রামের ওপর দিয়ে চলাফেরা করার জন্য এবং যেখানে সেখানে স্থলমাইন পুতে রাখার জন্য কত কৃষকের বাড়ি ও জমি নষ্ট হয়েছিল?

প্রশ্ন ৮ : ফৌজদারি তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশের কার্যধারায় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কীভাবে তারা ঘটনাস্থল থেকে আলামতের মাধ্যমে অভিযুক্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মোহাম্মদ আফজাল পর্যন্ত পুলিশ কীভাবে পৌঁছেছিল? স্পেশাল সেল

বলে, এসএআর গিলানির মাধ্যমে তারা আফজাল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।" কিন্তু আফজালকে খোঁজার জন্য যে বার্তাটি পাঠানো হয়, সেটা প্রকৃতপক্ষে শ্রীনগর পুলিশকে পাঠানো হয়েছিল, গিলানিকে গ্রেফতার করার আগেই। সুতরাং স্পেশাল সেল কীভাবে আফজাল এবং ১৩ ডিসেম্বর হামলার ঘটনাকে একসূত্রে বাঁধে?

প্রশ্ন ৯ : আদালত স্বীকৃতি দান করে যে, আফজাল ছিলেন একজন আত্মসমর্পণকৃত সশস্ত্র যোদ্ধা, যিনি নিয়মিতভাবেই নিরাপত্তা বাহিনীর সংস্পর্শে ছিলেন, বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। সেই নিরাপত্তা সংস্থা এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে যে, তাদের পর্যবেক্ষণের আওতাধীন একজন ব্যক্তি এমন বিশাল আকারের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের ষড়যন্ত্র করতে সক্ষম হলেন?

প্রশ্ন ১০ : এটা কি আপাতভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, লস্কর-এ-তৈয়বা এবং জইশ-এ-মহম্মদের মতো সংগঠন এমন একটি লোকের ওপর নির্ভর করলেন– যাকে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের নির্যাতন কেন্দ্রে প্রায়ই আনা নেওয়া করা হতো এবং যিনি প্রতিনিয়তই গোয়েন্দা নজরদারির ভেতরে থাকতেন?

প্রশ্ন ১১ : আদালতে আফজাল তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, মোহাম্মদ নামে একজন লোকের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এবং তারিক নামের একজন তাকে এই নির্দেশ দেয় যে, মোহাম্মদকে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। এই তারিক স্পেশাল ফোর্সের সঙ্গেই কাজ করতেন। তারিকের নাম পুলিশের চার্জশীটে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলে তারিক কে? এবং সে এখন কোথায়?

প্রশ্ন ১২ : ২০০১ সালের ১৯ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট হামলার ছয় দিন পর পুলিশ কমিশনার 'থেন' (মহারাষ্ট্রের), এস.এম. শাংগারি এই পার্লামেন্ট হামলায় নিহত আক্রমণকারীদের একজনকে লস্কর-এ-তৈয়বার সদস্য মোহাম্মদ ইয়াসিন ফতেহ্ (ওরফে আবু হামজা)-হিসেবে শনাক্ত করেন। একে ২০০০ সালের নভেম্বরে মুম্বাই হামলার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। এবং তাৎক্ষণিতভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তার এই বিবৃতির সপক্ষে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন। পুলিশ কমিশনার শাংগারির কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে কীভাবে মোহাম্মদ ইয়াসিন, যিনি নাকি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের হেফাজতে ছিলেন, তিনি কীভাবে পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের ঘটনায় সম্পৃক্ত হতে পারেন। যদি তিনি ভুল বলে থাকেন, তা হলে মোহাম্মদ ইয়াসিন এখন কোথায় আছেন?

প্রশ্ন ১৩ : সেই পাঁচজন আক্রমণকারী নিহত 'সন্ত্রাসী' কারা ছিলেন– কেন আমরা এখনো তা জানতে পারি না?

এই প্রশ্নগুলো যদি সম্মিলিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, তবে তা একটি নির্দিষ্ট দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যেটা অদক্ষতা থেকেও অনেক বেশি গুরুতর কিছু। যে শব্দগুলো আমাদের চিন্তার ভেতরে আসে তা হলো– 'জটিলতা', 'ষড়যন্ত্র' এবং 'সংশ্লিষ্টতা'। এর কোনো দরকার নেই যে, আমরা হতবুদ্ধি হওয়ার ভাব করবো, এমন কোনো চিন্তা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলবো, কিংবা এরকম উচ্চস্বরে কোনো কিছু বলা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবো। এ ধরনের কৌশলগুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সরকার এবং তার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অত্যন্ত ভয়াবহ প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েই গেছে। (খুঁজে দেখুন 'রাইখস্ট্যাগ' জ্বালিয়ে দেওয়ার কাহিনি কিংবা জার্মানিতে ১৯৩৩ সালে নাৎসী শক্তির উত্থানের কাহিনী, অথবা 'অপারেশন গ্লাডিও'-এর কাহিনী– যার মাধ্যমে ইউরোপের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 'সৃষ্টি' করেছিল, বিশেষ করে ইতালিতে– যাতে 'রেড ব্রিগেড' নামের সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে নির্মূল করা যায়।[১০])

এই সবগুলোর প্রশ্নের উত্তরে এ পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ঘটনা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে রাষ্ট্রপতি আফজালের মৃত্যুদণ্ড মার্জনার আবেদন বিবেচনার কারণে এটি আপাতত স্থগিত রয়েছে। ইতিমধ্যে বিজেপি ঘোষণা করেছে যে, 'আফজালকে ফাঁসিতে ঝোলাও' আন্দোলনকে জাতীয় প্রচারণায় পরিণত করবে।[১১] এ প্রচারণায় তারা তাদের উৎকট স্বদেশিবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সেই কৌশলগত মিথ্যাচারিতার মিশ্রণে এক উন্মাদনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। কিন্তু দেখে মনে হয় না, এটা এখানেই শেষ হবে। অন্যান্য পন্থাগুলোও এখানে বিবেচনা করা হচ্ছে। 'সর্বভারতীয় সন্ত্রাস-বিরোধী ফ্রন্ট'-এর একজন কর্মী এম.এস. বিটা পার্লামেন্ট হামলায় নিহত নিরাপত্তা কর্মীদের পরিবারবর্গের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরিবারগুলো এই হুমকি দিয়েছে যে, আফজালকে যদি ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ফাঁসিতে ঝোলানো না হয় তা হলে সাহসীকতার মরণোত্তর যে পদকগুলো সরকার তাদের দিয়েছিল, সেটা তারা ফেরত দেবেন। (ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে বলা যায়, আক্রমণকারীরা প্রকৃতই কার পক্ষে কাজ করেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা জানতে না পারা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পদকগুলো তারা সত্যিই ফেরত দিলে এটা সম্ভবত তাদের জন্য খুব একটা খারাপ চিন্তা হবে না।)

মূল কৌশল দেখে মনে হচ্ছে, বিজেপি সম্ভবত সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, এবং এই বির্তককে তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজননীতি প্রয়োগ করে মেরুকরণ করতে চাচ্ছে। 'দ্য পাইওনিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক তার নিজের কলামে লিখেছেন যে, মোহাম্মদ আফজাল সত্যিকার অর্থে পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণকারীদেরই একজন

ছিলেন এবং তিনি প্রথম গুলিবর্ষণ শুরু করেন এবং কম করে তিন জন নিরাপত্তা রক্ষীকে হত্যা করেছেন।*[১২]

* 'দ্য পাইওনিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক চন্দন মিত্র '১৩ ডিসেম্বর : আ রিডার' নামে একটি বই 'ইন্ডিয়া টুডে' সাময়িকীপত্রে ২২ জানুয়ারি ২০০৭ সংখ্যায় 'ট্র্যাপ্‌ড ইন হাফ-ট্রুথস' (অর্ধসত্যের জালে) নামে পর্যালোচনা করেছিলেন। এর প্রতিউত্তরে 'ইন্ডিয়া টুডে'র চিঠিপত্র পাতায় আমার একটা চিঠি সম্পাদনা করে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এ ছাপানো হয়েছিল। এখানে সেই চিঠির অসম্পাদিত মূল পাঠ প্রকাশ করা হলো :

মহাত্মন, '১৩ ডিসেম্বর : আ রিডার' নামক বইয়ের ওপর চন্দন মিত্রের লেখা একটি পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি লিখছি। পর্যালোচকের বেশ আশ্চর্যজনক একটি পছন্দ বলতে হবে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি এর আগে বেশ নগ্নভাবেই পার্লামেন্ট ভবনের হামলার অনেক সত্যকেই মিথ্যার চাদরে আড়াল করেছিলেন। এবং তিন একই কাজ করেছেন এই বই রিভিউ বা পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে। তিনি আমার বিবৃতির 'উৎস' জানতে চেয়েছেন। আমার বিবৃতিটির উৎস হলো : '১২ ডিসেম্বর ২০০১-এ একটি অনানুষ্ঠানিক সভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী পার্লামেন্টে আসন্ন হামলার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।'

আমি উৎসটি আপনার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনি দয়া করে তা লক্ষ্য করুন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (যিনি পার্লামেন্ট হামলার তৎকালীন সময়ে বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন) ১৮ ডিসেম্বর ২০০১-এ রাজ্যসভায় একটি বিবৃতি দেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্য যে, পার্লামেন্টের ওপর আক্রমণটি যথেষ্টই পূর্বধারণাকৃত ছিল।... বাস্তবিকপক্ষে, এই হামলার এক দিন আগে, অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর মুম্বাইতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ ধরনের হুমকির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন।'

'দ্য পাইওনিয়ার'-এ তার নিজের কলাম 'সেলিব্রেটিং ট্রিজন' বা 'বিশ্বাসঘাতকতার বর্ষযাপন'-এ (৭ অক্টোবর ২০০৬) চন্দন মিত্র বলেন, ' ১৩ ডিসেম্বর ২০০১-এর পালামেন্ট হামলার সন্ত্রাসীদের একজন এই আফজাল গুরু, যে প্রথম নিরাপত্তা কর্মীদের ওপর গুলিবর্ষন শুরু করেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়, সেই সকালে গণতন্ত্রের রাজপ্রাসাদ রক্ষাকারী ছয় জনের মধ্যে তিন জন তার গুলিতেই নিহত হয়।'

যে তিনটি আদালত আফজালকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, তাদের মধ্যে কোনো আদালতই তাকে এ বিষয়ে অভিযুক্ত করেননি (তাকে দোষী প্রতিপন্ন করা তো দূরে থাক।)। তাকে এই অভিযোগেও অভিযুক্ত করেননি যে– তিনি কাউকে

হত্যা করেছিলেন অথবা প্রত্যক্ষভাবে এ হামলায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অথবা সত্যিকার অর্থেই তিনি ১৩ ডিসেম্বর '০১ পার্লামেন্ট ভবনের আশেপাশে কোথাও ছিলেন। এমন কি পুলিশের যে চার্জশীট, তাতেও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আক্রমণের সময় আফজাল অন্য কোথাও ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়েও একদম পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে এ হামলায় সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই। এমন কোনো আলামতও নেই যে, সে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য। চন্দন মিত্র কি তা হলে বলতে পারেন তার এই দৃঢ় উক্তির উৎসটি কোথায়? অথবা, আমাদেরকে জানাবেন কি, কীভাবে তিনি এমন একটি বিষয় জানতে পারলেন যা পুলিশ বা আদালত কেউই জানতে পারেননি? এবং কেনই বা তিনি এই সব আলামত এত বছর ধরে চেপে রেখেছেন?

আরেক জন কলাম লেখক স্বপন দাশগুপ্ত তার একটি কলাম 'ইউ ক্যান্ট বি গুড টু ইভিল' (দুষ্টলোকের প্রতি আপনি সদয় হতে পারেন না।)। তাতে তিনি মতামত দেন যে, যদি আফজালকে ফাঁসিতে ঝোলানো না হয়, তা হলে এই দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অশুভ'র বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয় উদ্‌যাপনের কোনো মানেই হয় না।[১৩] এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, এই ধরনের মিথ্যাচারিতা শুধুমাত্র সত্য ঘটনার দুর্বল অনুধাবন থেকেই উদ্ভূত হয়। তাদের এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার যে কর্মযজ্ঞ, বিশেষ করে টেলিভিশন সাংবাদিকদের, তাদেরকে আমরা সরকারের খুব নিখুঁত সহযোগী হিসেবে গণ্য করতে পারি। টেলিভিশনের যেকোনো আলোচনা অনুষ্ঠান বা বিশেষ প্রতিবেদন, যেগুলোতে আমরা দেখতে পাই উপস্থাপকরা কীভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোর ওপর নিজেদের চাতুর্য প্রয়োগ করেন– যেমনটা একটা বালকবেলায় শিশুরা ইচ্ছেমতো খেলাধূলা করে থাকে। নির্যাতনকারীরা, বিভেদকামী ভাইয়েরা, সিনিয়র পুলিশ অফিসার এবং রাজনীতিবিদরা হঠাৎ করেই যেন একেক জন মঞ্চে উঠে আসতে লাগলেন এবং কথা বলতে থাকলেন। যতই তারা বলেন ততই যেন সব কিছু আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

২০০৬-এর নভেম্বর মাসের শেষে দিকে আফজালের বড় ভাই আইজাজ একটি ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলে (সিএনএন-আইবিএন) জিনিসটাকে সামনে নিয়ে আসেন।[১৪] তাকে একটি গোপন ক্যামেরায় দেখানো হচ্ছিল, যা দেখে মনে হচ্ছিল, অত্যন্ত গোপনে কোনো একটি অপারেশন চালানো হচ্ছে, এবং আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছিল যে, এর মাধ্যমে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিসের আবিষ্কার ঘটছে। আইজাজের বক্তব্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সাংবাদিকদের মাধ্যমে দিল্লির রাজপথে সপ্তাহ ধরেই প্রচারিত হচ্ছিল। জনগণ তার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল। কেননা, তার ভাইয়ের স্ত্রী সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বা ভাঙা সম্পর্ক নিয়ে জনগণ

ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, কাশ্মীরে এস.টি.এফ. (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স)-এর সঙ্গে তার বিশেষ সুসম্পর্কের ব্যাপারটি সর্বজনবিদিতি। তার সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তি পরামর্শ দিয়েছেন যে, সাম্প্রতিককালে তিনি যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন– সে বিষয়ে একটি অডিট পরিচালিত হোক।

কিন্তু তিনি এখন একটি জাতীয় সংবাদ চ্যানেলে যেখানে তিনি তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমের কোর্টের ফাঁসির রায় সম্পূর্ণ সমর্থন করছিলেন, তখন তিনি এ কথা বলছিলেন, আফজাল আসলে কখনই আত্মসমর্পন করেনি। এবং তিনিই (আইজাজ) তার ভাইয়ের অস্ত্র বিএসএফ-এর কাছে সমর্পন করেছিলেন। এবং যখন থেকে তিনি এটা সমর্পন করেছিলেন তখন থেকেই তিনি এটা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আফজাল ছিলেন জইশ-এ-মহম্মদ সংগঠনের একজন অত্যন্ত সক্রিয় সশস্ত্র কর্মী। জইশ-এ-মহম্মদ এর প্রধান অপারেশন কর্মকর্তা গাজী বাবা প্রায়শই তাদের বাড়িতে এসে মিটিং করতেন (আইজাজ দাবি করেছিলেন যে, গাজী বাবাকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে দিয়ে পুলিশ লাশটি শনাক্ত করিয়েছিল।) সামগ্রিকভাবে শুনে মনে হচ্ছিল, এটা একটি 'পরিচয়' বিভ্রান্তির ঘটনা– এবং যতটুকু তিনি জানতেন, এবং সেখানে তিনি সবকিছু যেভাবে স্বীকার করছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল পুলিশের কারাগারে আফজাল নয়, তার পরিবর্তে বরং আইজাজেরই থাকার কথা ছিল!

আমাদের অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে, আফজাল এবং আইজাজ– উভয়েরই সংবাদমাধ্যমে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী– যে দুটির সময়ের ব্যবধান পাঁচ বছর, এর পেছনে এস.টি.এফ.-এর অদৃশ্য হাত রয়েছে। এই এস.টি.এফ. কাশ্মীরের সবচেয়ে ভয়াবহ একটি অবৈধ অনুপ্রবেশবিরোধী সংস্থা। তারা যেকোনো সময় যে কাউকে দিয়ে যেকোনো কিছুই বলানোর ক্ষমতা রাখে (শাস্তিমূলক এবং পুরস্কারমূলক– দুটোই)। তাদের কর্মপন্থা কাশ্মীর উপত্যকার প্রতিটি নারী-পুরুষ এবং শিশুদের বহুল পরিচিত। এরকম একটি সময়, একটি দায়িত্বশীল সংবাদ চ্যানেলের পক্ষে এ ঘোষণা করা হয়, তারা তদন্ত করে জানতে পেরেছে যে, 'আফজাল জইশ-এ-মহম্মদ সংগঠনের একজন অত্যন্ত সক্রিয় সশস্ত্র কর্মী'– যেটা সম্পূর্ণই অনির্ভরযোগ্য একটি সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল খুবই বিপজ্জনক একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। (ঠিক কখন থেকে আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সম্পর্কে যা বলে– সেটা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হওয়া শুরু করলো? আমি উদাহরণ হিসেবে আমার ভাই সম্পর্কেই বলতে পারি, সে অবশ্যই এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, এই মহাবিশ্বে আমি ঈশ্বরপ্রদত্ত এক

উপহার। এবং আমি চাইলে আমার কয়েকজন চাচি-মাসিকেও জোগাড় করতে পারি যারা বলবে, আমি আসলে কিছু অর্থের বিনিময়ে জইশ-এ-মহম্মদ-এর সশস্ত্র কর্মী।) এটা কীভাবে সম্ভব, একটি পারিবারিক কলহকে 'ব্রেকিং নিউজ' বা তাজা খবরের তকমা জুড়ে দেওয়া হলো।

অন্য যে চরিত্র, যে কিনা খুব দ্রুততার সঙ্গেই ছায়াচ্ছন্ন অন্তরাল থেকে হঠাৎ করেই আবির্ভূত হলেন এবং ক্রমান্বয়েই মূল মঞ্চ দখল করে নিলেন, তিনি হচ্ছেন এস.টি.এফ.-এর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট দ্রাবিন্দ্র সিং। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের মাত্র কয়েক মাস আগে শ্রীনগরের হামহামার এস.টি.এফ. ক্যাম্পে আফজালকে অবৈধভাবে আটকে রেখে নির্যাতন চালিয়ে ছিলেন। আফজাল তার আইনজীবী সুশীল কুমারের কাছে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন যে, তার ও মোহাম্মদের (পার্লামেন্ট হামলায় নিহত জঙ্গি) কাছে করা বেশ কয়েকটি ফোন কলকে আপনি যদি অনুসরণ করেন তবে সেগুলো দ্রাবিন্দ্র সিং পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। নিশ্চিতভাবেই এই ফোন কলগুলোকে অনুসন্ধানের কোনো চেষ্টা করা হয়নি।

সিএনএন-আইবিএন-এর অনুষ্ঠানেও দ্রাবিন্দ্র সিং-কে দেখানো হয়। তাকে দেখানো হয় হাল আমলের চলতি ফ্যাশনে ক্যামেরাকে নিচু কোণ থেকে ধরে, নানা ধরনের ঝাঁকুনিসহ আরো কিছু নাটকীয় বৈশিষ্ট্য যোগ করার কৌশলের অবয়বে।[১৫] দেখে মনে হয়, এটা যথেষ্ট অপ্রয়োজনীয় ছিল, কারণ দ্রাবিন্দ্র সিং সাম্প্রতিক সময়ে যথেষ্ট পরিমাণেই কথা বলছিলেন। তিনি ধারণকৃত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, ফোনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, এমনকি সামনাসামনিও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এবং সব জায়গাতেই তিনি একই ধরনের অভিঘাতমূলক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে একটি ধারণকৃত সাক্ষাৎকারে দ্রাবিন্দ্র সিং শ্রীনগর ভিত্তিক এক ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক পারভেজ বুখারির কাছে বলেছিলেন :

> আমার ক্যাম্পে বেশ কিছুদিন ধরে আমি প্রকৃতই তাকে (আফজালকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম এবং তার ওপর অত্যাচার করেছিলাম। এবং আমরা কখনই আমাদের খাতাপত্রে তাকে গ্রেফতারকৃত হিসেবে নাম উঠাইনি। আমাদের ক্যাম্পে সে অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়েছে সেগুলো সত্য। সেই সময়ের দিনগুলোতে ওটাই আমাদের কর্মপন্থা ছিল, এবং আমরা আসলেই তার পায়ুপথে পেট্রল ঢেলে দিতাম এবং বৈদ্যুতিক শক দিতাম। কিন্তু তারপরও আমি তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারিনি। আমাদের সম্ভাব্য সব রকমের কঠোরতম জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সে কিছুই প্রকাশ করেনি। গাজী বাবার ব্যাপারে আমরা তাকে যথেষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ

করেছি, কিন্তু তারপরও সে কিছু বলেনি। আমার তো সে সময় একটা সুনাম ছিল অত্যাচার, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে কারো মুখ থেকে কথা আদায়ের ব্যাপারে। যদি আমার জিজ্ঞাসাবাদের পরও কোনো ব্যক্তি নির্দোষ হয়ে বেরিয়ে আসতেন, এর পর তাকে আর কেউ নাড়াচাড়া করতো না। আমাদের সমগ্র বিভাগ থেকে চিরকালের জন্য তাকে নিষ্কণ্টক ধরা হতো।'[১৮]

টিভিতে তার এই দম্ভোক্তি আলোচনা নীতিপ্রণয়ণ পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'নির্যাতনই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র দাওয়াই। আমি এটা জাতির জন্যই করে থাকি।' তিনি এই ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি যে, কেন অথবা কীভাবে 'আফজাল', যার ওপর তিনি নির্যাতন চালিয়েছিলেন এবং যাকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, পার্লামেন্ট হামলার নারকীয় মূল পরিকল্পনাকারীতে পরিণত হলো। দ্রাবিন্দ্র সিং তারপর বলেছিলেন যে, আফজাল একজন জইশ-জঙ্গি। যদি এটা সত্য হয়, তবে এ সংক্রান্ত প্রমাণাদি কেন আদালতে উপস্থাপন করা হলো না? এবং কেন আফজালকে ওই সময় ছেড়ে দেওয়া হলো? কেন তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হলো না? এখানে এক্ষেত্রে পুরো ঘটনাটিকে একটি অদক্ষতা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলবে। কিন্তু আমাদের কাছে এই সবকিছু প্রকাশ পাবার পর সম্ভবত দ্রাবিন্দ্র সিং তার পেশাগত জীবনের সকল সংবেদনশীল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের মতো খুব কম সংখ্যক লোককেই সেটা বিশ্বাস করাতে পারবে।

এর ভেতরে ডানপন্থী সাংবাদিক, ধারাভাষ্যকাররা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আফজালকে জইশ-এ-মহম্মদ সংগঠনের সশস্ত্র কর্মী হিসেবে অভিহিত করতে লাগলেন। দেখে মনে হয় যেন, তাদের প্রতি নির্দেশনা আছে যে, 'এটাই হচ্ছে আমাদের দলীয় অবস্থান, তোমরা এই লাইনেই কথা বলবে।' তাদের হাতে এ বিষয়ে কোনো অকাট্য প্রমাণাদি ছিল না। কিন্তু তারা এটা জানতো কোনো কিছুকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বারংবার উচ্চারণ করা হয় তবে সেটা নিজেই তথাকথিত সত্যে পরিণত হয়। আফজালকে একজন সক্রিয় সশস্ত্র কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যে প্রক্রিয়া চলছিল, এবং সে যে একজন আত্মসমর্পনকৃত সশস্ত্র কর্মী ছিল না– সেটা প্রমাণ করার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল এস.এম. সাহাই টিভিতে একদিন জানালেন যে, তিনি তার সমস্ত নথিপত্র ঘেটে কোথাও খুঁজে পাননি যে, আফজাল কখনো আত্মসমর্পণ করেছিল। তিনি কিছু সেরকম খুঁজে পেলে সেটাই বরং অবাক করা ব্যাপার হতো। কেননা, '৯৩ সালে আফজাল আত্মসমর্পণ করেছিলেন জম্মু কাশ্মীরের পুলিশের কাছে নয়, বর্ডার

সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর কাছে। তা হলে কেন একজন টিভি সাংবাদিক এভাবে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অগ্রসর হলেন? আর কেনই বা একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার এ ধরনের একটি ধোঁয়াটেপূর্ণ খেলায় অংশ নিলেন?

পার্লামেন্ট হামলার সরকারী তথ্যবিবরণী প্রথম আক্রমণের আঘাতেই খুব দ্রুতই ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যেতে লাগল।

এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রায়েও, যতোই যুক্তি এবং বিশ্বাসগত ভুল উপস্থাপনা থাকুক, কখনই আফজালকে পার্লামেন্ট আক্রমণের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেনি। সুতরাং মূল পরিকল্পনাকারী তা হলে কে? আফজালকে যদি ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, তবে তা আমরা কখনই জানতে পারবো না। কিন্তু বর্তমান বিরোধীদলের নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি তাকে এখনই ফাঁসিতে ঝোলাতে চান। তার মতে, এমনকি এ কাজে একটি দিন বিলম্ব করলেও তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।[১] কেন? কীসের এত তাড়া? লোকটাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে অত্যন্ত উচ্চ নিরাপত্তা বিশিষ্ট নিরাপত্তা কক্ষে– ফাঁসির আসামীদের জন্যই যেটা নির্ধারিত। এবং সে তার কারা কক্ষ থেকে পাঁচ মিনিটের জন্যও বাইরে বেরোনোর অনুমতি পায় না। কী ধরনের ক্ষতি সে করতে পারে? কথাবার্তা বলা? নাকি লেখালেখি করা, সম্ভবত? নিশ্চিতভাবেই (এমন কি লালকৃষ্ণ আদভানির নিজস্ব সংকীর্ণ অর্থেও), এটা হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ যে তাকে যেন এখনই ফাঁসিতে ঝোলানো 'না' হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত না, যতক্ষণ না একটি তদন্ত কার্য সম্পন্ন হয়– যেটা উন্মোচিত করবে প্রকৃত ঘটনাটি আসলে কী, এবং কারা আসলে পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণ করেছিল?

মোহাম্মদ আফজালের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যারা আপীল করেছেন তাদের মধ্যে সেই সব ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, যারা মূলত দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ডকে একটি শাস্তির দণ্ড হিসেবে মেনে নিতে পারে না। তারা অনুরোধ করেছেন, আফজালের মৃত্যুদণ্ড যেন পরিবর্তিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, যিনি একটি ন্যায়সম্মত বিচারপ্রক্রিয়া পাননি, এবং যার নিজের বক্তব্য শোনানোর মতো সুযোগ ঘটেনি, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান অবশ্যই কম নিষ্ঠুরতার। তবে সেটাও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মতোই একটি স্বেচ্ছাচারি কর্মকাণ্ড। বরং সঠিক কর্মপন্থা হবে এটাই যে, আফজালের এই মামলার পুনঃতদন্ত এবং বিচারের আদেশ দেওয়া হোক। এবং ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ভবন হামলার ব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ স্বচ্ছ তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। এটা ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য অত্যন্ত শয়তানীমূলক কর্মকাণ্ড হবে যদি একটা লোককে কারাগারের কক্ষে দিনের পর দিন ফেলে রাখা হয়, এবং তার ও

তার পরিবারকে এই ধোঁয়াশার মধ্যে ফেলে রাখা হয় যে, কখন হবে তার শেষ দিন।

একটি রাজনৈতিক ডাইনী বুড়ি অনুসন্ধানের চেয়েও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হবে একটি সত্যিকারের আন্তরিক তদন্তকাজ। এদেরকে সেই সব অংশও পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যেখানে গোয়েন্দা বাহিনী, অনুপ্রবেশ-প্রতিরোধ বাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা– যা তারা এ মামলার ক্ষেত্রে রেখেছিল। অপরাধসমূহ; যেমন– আলামতের বিকৃতিসাধন বা বানোয়াট আলামত, বা আলামত প্রস্তুত করা, অথবা নগ্নভাবে স্বাভাবিক কার্যবিধি লঙ্ঘন– যেগুলি ইতিমধ্যেই আদালত কক্ষে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দেখে মনে হয় এগুলো একটি হিমশৈলের দৃশ্যমান চূড়া মাত্র।[১৮]

এখন আমাদের রেকর্ডে একজন পুলিশ অফিসার আছেন, যিনি গর্বের সঙ্গে সব স্বীকার করছেন যে, তিনি একজন নাগরিকের অবৈধ আটকাদেশ এবং নির্যাতন করার মতো ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। টিভি ক্যামেরায় সেটার প্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তি রেকর্ডবন্দী আছে। এর সব কিছুই কি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য, সরকারের কাছে কিংবা এদেশের আদালতের কাছে?

ভারত সরকারের (অতীত, বর্তমান, ডানপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী) অতীত রেকর্ড যদি আমরা দেখি তা হলে এটা খুব সরল হবে– হয়তোবা খুব আকাশকুসুম শব্দটা এক্ষেত্রে তুলনামূলক ভালো শব্দ– এটা আশা করা যে, এই ব্যাপারে একটি তদন্তকমিটি গঠন করার জন্য এই সরকারের এই সৎসাহসটা হবে যেটা সকলের কাছেই মূল ঘটনাটি উদঘাটিত করবে। কিন্তু মনে হয় যেন সব সরকারের মধ্যেই এটার বিপরীতে দুর্বলতা রয়ে গেছে। তবে আশা আর যুক্তির মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই যোগসূত্র থাকে।

সুতরাং, এই বইটা আশা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলো।

পুলিশ হেফাজতে
স্বীকারোক্তি, সংবাদমাধ্যম
এবং আইনকানুন

ভারতের 'দ্য হিন্দুস্তান টাইমস' দৈনিক পত্রিকায় ২২ ডিসেম্বর ২০০৬-এ এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়।

পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের এক নম্বর আসামী মোহাম্মদ আফজালকে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণাদি রয়েছে, সেগুলো প্রত্যক্ষ নয়, বরং ঘটনাক্রমে কিছু প্রমাণের ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু এখন এটি সুপরিচিত একটি বিতর্কিত বক্তব্য, যেখানে বলা হয়েছে– 'ঘটনাটি, যেটা শেষ অব্দি রক্তক্ষয় এবং জীবনহানির অবস্থা সৃষ্টি করে, সেটা সমগ্র জাতির সত্তাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এবং, আমাদের 'সমাজের সম্মিলিত নীতিবোধ'– তাকে শুধুমাত্র তখনই সন্তুষ্ট করা যাবে যদি এ ধরনের অপরাধীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়।'[১]

'সমাজের সম্মিলিত নীতিবোধ'– এই ব্যাপারটা কি আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত নয়? এটা বলা কি ঠিক হলো যে, আমরা যে তথ্য পেয়েছি তার ওপর ভিত্তি করে এই মতামত নির্ধারিত হয়েছে? এবং সে কারণে এই মামলার ক্ষেত্রে আমাদের যে গণমাধ্যম রয়েছে, তারা, এই মামলার চূড়ান্ত রায় কি হবে সেটা নির্ধারণ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করেছে? যদি তাই হয়, তা হলে কি সেটা ন্যায়ানুগ ছিল?

এখন, পাঁচ বছর পর, যখন পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের ওপরে বিব্রতকর প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা হচ্ছে, তখন স্পেশাল সেল কি পুনরায় খুব চৌকষভাবে 'ব্রেকিং নিউজের' সুযোগটাকে নিজেদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে? হঠাৎ করেই টেলিভিশনের একেবারে প্রাইম টাইমে এ ধরনের ঘটনাগুলোর প্রচার শুরু হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ভারতের সবচেয়ে দায়িত্বশীল কিছু নিউজ চ্যানেল এই খেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এই দায়িত্বহীনতা ও অনুধাবনের ব্যর্থতা যতোটা ভয়াবহভাবে ক্ষতিকর, ততোটাই বিদ্বেষপূর্ণ। (মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে 'সিএনএন-আইবিএন'-এ এ ধরনের একটি যোগসাজশপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল।) মোহাম্মদ আফজাল পুলিশ হেফাজতে থাকার সময় যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল তার একটি এক্সক্লুসিভ ৯০ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র গত সপ্তাহে (১৬ ডিসেম্বর) এনডিটিভি প্রাইম টাইমে প্রচার করে। পুলিশের হাতে আটকের পর পরই মোহাম্মদ আফজালের কাছ থেকে এটা আদায় করা হয়েছিল। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটির পুরো সময়ের কোনো

অংশেই এটি পরিষ্কার করা হয়নি যে, স্বীকারোক্তির এই ভিডিও ফুটেজটি পাঁচ বছরের পুরনো।[২]

পুলিশি হেফাজতে স্বীকারোক্তি আদায় করার আইনগত বৈধতা, নির্ভরযোগ্যতা ও তার যথার্থতা নিয়ে ইতিপূর্বেই অনেক কিছু বলা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এই নির্দিষ্ট স্বীকারোক্তিটি কী অবস্থায় আফজালের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করার যে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত একটি আশঙ্কা রয়ে যায়, যা প্রকৃত তদন্ত কর্মকাণ্ডকে আড়াল করতে পারে, এই আশঙ্কার জন্যই পুলিশের হেফাজতে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীকে ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধিতে আইনগত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। 'পোটা' সরাসরি একটি নাগরিক অধিকারবিরুদ্ধ আইন। এটি ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত এটিকে সাময়িকভাবে তুলে নেওয়া হয়। কেননা, এই আইন হেফাজতে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীকে আইনগত সাক্ষ্যের মর্যাদা দিয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, আফজালের প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট বলেই ছিল যে, 'পোটা'র ক্ষেত্রে যেসব ছোটখাট প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল, স্পেশাল সেল সেটা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করেছে। এবং আইনবহির্ভূত ও অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করে এটাকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে পাশে সরিয়ে রেখেছে। ইতিপূর্বে স্পেশাল সেলকে হাইকোর্ট অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিল। কেননা, নিজেকে জড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেওয়া ব্যাপারে তারা আফজালের ওপর বলপ্রয়োগ করেছিল।[৩]

সুতরাং সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য সেই বাসি স্বীকারোক্তিমূলক ভিডিও ফুটেজটিকে পুনরায় এনডিটিভিতে প্রচারের ব্যাপারে কোন বিষয়টি প্রভাব বিস্তার করলো? এখন কেন? স্পেশাল সেলের এই ভিডিও ফুটেজটি কীভাবে এনডিটিভি-র হাতে এলো? এই মুহূর্তে আফজালের অপরাধ-মার্জনার আবেদন ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনাধীন রয়েছে এবং সমগ্র বিচার প্রক্রিয়াটি পুনরায় পুনর্বিচারের জন্য আবেদন সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন আছে। এই বিশেষ সময়ের সঙ্গে কি এনডিটিভি-র এই প্রচারের কোনো সম্পর্ক আছে? এনডিটিভি-র ম্যানেজিং এডিটর বরখা দত্ত হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকায় তার একটি কলামে বলেছেন, এই ভিডিও ফুটেজটি কীভাবে সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠভাবে প্রদর্শন করা যায়– তার উপায় নির্ধারণ করতে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছেন।[৪] পরিষ্কারভাবেই এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত এবং এটি গুরুতরভাবে আলোচনা করার দাবি রাখে।

অনুষ্ঠানটির শুরুতেই বেশ কয়েক মিনিট ধরে, আফজাল স্বীকারোক্তি প্রদান

করছে– এমন একটি স্থির চিত্র দেখানো হয় এবং ইনসেটে একটি টেক্স থাকে যেখানে লেখা ছিল– 'আফজাল আদালতে তার সব দোষ স্বীকার করে।' এটা একেবারে নির্লজ্জ মিথ্যাচার। এরপর টানা ১৫ মিনিট কোনো ধরনের বিবৃতি ছাড়াই স্বীকারোক্তির ভিডিও ফুটেজটি প্রচার করা হয়। এরপর একজন উপস্থাপক আবির্ভূত হন এবং বলেন, 'আপনারা দেখছেন আফজালের নিজের ভাষায় পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের কাহিনী'। এটাও সত্যের অপলাপ মাত্র। এই অনুষ্ঠানের ভেতরে একজন রিপোর্টার আমাদেরকে জানান যে, আফজাল এই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং দাবি করেছে যে, এটা তার কাছ থেকে নির্যাতনের মাধ্যমে আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। সেই নির্বোধ আত্মতৃপ্ত উপস্থাপক তারপর তাদের প্যানেলভুক্ত কয়েক আলোচকের মধ্যে এস.এ.আর. গিলানি (যিনি এ মামলার একজন অভিযুক্ত ছিলেন এবং স্পেশাল সেলের নির্যাতনের ব্যাপারে তার বেশ কিছু ঘটনা জানা ছিল) নামে একজনের দিকে এগিয়ে যান এবং তিনি এই মন্তব্য করেন যে, 'যদি এই স্বীকারোক্তি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আদায় করা হয় তবে আফজাল সত্যিকার অর্থে একজন ভালো অভিনেতা।'

(পরিষ্কারভাবেই উপস্থাপকের কখনো নির্যাতন সেলে অত্যাচারের অভিজ্ঞতা হয়নি, কিংবা কখনো হয়তো পড়েনওনি উরুগুয়ের একজন লেখক, এডুয়ার্ডো গ্যালেনো'র একটি অসাধারণ বিবৃতি– যাতে তিনি বলেছিলেন, 'গরু ছাগল তাড়ানোর যে বৈদ্যুতিক লাঠি থাকে সেটি যে কাউকেই অত্যন্ত চমৎকার একজন গল্পকারে পরিণত করতে পারে।' তিনি এটাও জানতেন না যে, আফজাল যখন দিল্লি পুলিশের হেফাজতে, তখন তার পরিবারের লোকজন জিম্মি আছে কাশ্মীরের মতো একটি যুদ্ধাঞ্চলে।)

পরবর্তীতে, এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিডিও ফুটেজটি পাশাপাশি মিলিয়ে দেখানো হয় যেটাকে ওই চ্যানেল আদালতে প্রদত্ত বিবৃতি বলে অভিহিত করেছিল। অথচ এটা মূলত ছিল তার আইনজীবীর কাছে লেখা একটি চিঠির ভাষ্য, যেখানে তিনি কাশ্মীরের 'স্টেট টাস্ক ফোর্স' (এসটিএফ)-কে জড়িয়ে কিছু ঘটনার কথা জানান। যেখানে তিনি বর্ণনা করেন যে, পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের মাত্র মাসখানেক আগে কীভাবে তাকে আইন বহির্ভুতভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এসটিএফ-এর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে, আসলেই তিনি আফজালকে আইন বহির্ভুতভাবে বন্দি করে রেখেছিলেন এবং নির্যাতন করেছিলেন– সে বিষয়ে এনডিটিভি আমাদেরকে কোনো কিছুই জানায়নি। বরং আফজালের সেই চিঠি তারা ব্যবহার করেছে তার বক্তব্যকে অবান্তর প্রমাণ

করতে। এবং পুরো অনুষ্ঠানটির ফ্রেমের নিচে এরকম একটি বোল্ড ক্যাপশন লেখা ছিল– 'আফজালের পরিবর্তিত জবানবন্দি'।

এখানে আরেকটি গুরুতর নৈতিক ইস্যু রয়ে গেছে। ২০০১-এর ডিসেম্বর স্পেশাল সেলের কাছে আফজাল যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন (গণমাধ্যমে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি থেকে ভিন্ন ভাবে), সেখানে তিনি পার্লামেন্ট হামলার সঙ্গে এস.এ.আর. গিলানিকে জড়িত করেন। এবং এটাও বলেন, গিলানি ছিলেন পুরো ষড়যন্ত্রটির প্রধান পরিকল্পনাকারী। একদিকে যেমন স্পেশাল সেলের প্রদত্ত চার্জশীটের সঙ্গে এটি ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে পরবর্তীতে এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং গিলানিকে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। কেন তা হলে আফজালের স্বীকারোক্তির এ অংশকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়? এটা কি এই কারণে যে, এই স্বীকারোক্তিটাকে তুলনামূলক কম বানোয়াট বলে মনে হয়? এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়? কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এই অংশটুকু বাদ দিতে হবে? সেটা কি এনডিটিভি চ্যানেল নিজেই? নাকি স্পেশাল সেল?

এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের যাবতীয় দিকগুলো প্রমাণ করে যে, এটি ছিল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট মতাদর্শী একটি কর্ম? এটা এ জন্যই বিস্ময়কর ছিল না যে, এই সম্প্রচার যখন এগিয়ে যাচ্ছিল সেটা সমগ্র সমাজের মাঝে একটি শক্তিশালী 'বিশ্বাস' তৈরি করছিল– যেটাকে আমরা 'সম্মিলিত নীতিবোধ' হিসেবে দেখতে পাই। অনুষ্ঠানটির নিচের ক্যাপশনে এসএমএস-এর মাধ্যমে দর্শকের দেওয়া মতামত হিন্দিতে ভেসে উঠছিল। যেমন:

> 'আফজালকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিত।'
>
> 'তার হাত পা কেটে ফেলা হোক, যাতে রাস্তায় রাস্তায় তাকে ভিক্ষা করে খেতে হয়।'

এরপর ইংরেজিতে একটি মন্তব্য দেখা গেল : 'লাল চকে তাকে অগুকোষের মাধ্যমে ঝুলিয়ে দাও। তাকে ঝুলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তাদেরকেও ফাঁসিতে ঝোলাও যারা নাকি তাকে সমর্থন জানাচ্ছে।'

শরিয়া আদালত ছাড়াই আমরা একই কাজ বেশ সুন্দরভাবে করে যাচ্ছি। লেখ্যপ্রমাণ হিসেবে বলছি, এই ভিডিও ফুটেজটি জোগাড় করার জন্য বেশ কয়েকবার নীতা শর্মা নামে একজন রিপোর্টারের প্রশংসা করা হয়। ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার সে মিথ্যাচারমূলক রিপোর্ট প্রকাশনার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। যেমন: আনসাল প্লাজাতে 'এনকাউন্টারের' ওপর মিথ্যা তথ্য প্রকাশের জন্য;[৫]

ইফতিখার গিলানির মামলায় মিথ্যাচারিতার জন্য;[৬] এস.এ.আর. গিলানির মামলার ক্ষেত্রে এবং এখন এই ঘটনার ক্ষেত্রেও। নীতা শর্মা এর আগে হিন্দুস্তান টাইমস্-এর একজন প্রতিবেদক ছিলেন। মনে হচ্ছে স্পেশাল সেলের নিজস্ব প্রপাগাণ্ডা প্রকাশের বিনিময়ে তিনি প্রিন্ট মিডিয়া থেকে টিভি সাংবাদিকতায় তার পদোন্নতি আদায় করে নিয়েছিলেন।

> এই ধরনের ঘটনা হয়তো আপনাকে বিস্মিত করে তুলতে পারে যে, গণমাধ্যমগুলোর ভেতরে আসলেই পুলিশ বা গোয়েন্দা বাহিনীর লোক রয়ে গেছে কিনা। নাকি ব্যাপারটা আসলে উল্টো।

এই অনুষ্ঠানের আলোচকদের মধ্যে সবচেয়ে নীরব অতিথি ছিলেন এম.কে. ধর নামে গোয়েন্দা ব্যুরোর একজন সাবেক যুগ্ম মহাপরিচালক। তার ভেতরে যথেষ্ট পরিমাণে হেঁয়ালি ছিল। তিনি সুনির্দিষ্টভাবেই কোনো কিছু পুনরাবৃত্ত করেননি। তার 'ওপেন সিক্রেট : ইন্ডিয়া'স ইন্টিলিজেন্স আনভেইল্ড' নামে বিস্ময়করভাবে সরাসরি প্রকাশ করা একটি গ্রন্থ আছে। সেখানে তিনি লিখেছেন– 'এক দিন না এক দিন আমাদের গণতন্ত্রের ক্রমক্ষয়িষ্ণু উপকরণগুলোর সুবিধা গ্রহণ করে গোয়েন্দা বাহিনীর কোনো কোনো সদস্য উচ্চাভিলাষী সামরিক স্বার্থ আদায়ের জন্য নিজেরা একজোট হয়ে এই জাতির রাজনৈতিক বুনটকেই পরিবর্তন করে দিতে পারে।'[৭]

> 'ক্রমক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্রের উপকরণ।'– সম্ভবত এর চেয়ে ভালোভাবে আমিও বলতে পারতাম না।

বুশ

খোকা,

বাড়ি যাও

প্রবন্ধটি ২০০৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রে এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি 'দ্য নেশন'-এর ওয়েবসাইটে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ভারত এবং পাকিস্তানে বুশের অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সফরের সময় তিনি আশা করেছিলেন যে, তিনি হয়তোবা জনগণের দিকে প্রভুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারবেন। কেননা, এদেরকে তিনি তার সম্ভাব্য প্রজা মনে করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট বুশের ভ্রমণসূচি দিনে দিনেই বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠছে।

২০০৫-এর ২ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের নির্ধারিত দিল্লি সফরে ভারত সরকার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে লোকসভায় বুশকে দিয়ে একটা ভাষণ দেওয়াতে। তবে বেশ উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক সংসদ সদস্য বুশকে দিয়ে এ ধরনের কাজ প্রতিহত করার হুমকি দিয়েছে। সে কারণে প্রথম পরিকল্পনাটি খুব তাড়াতাড়ি হিম ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিকল্প চিন্তা ছিল, দিল্লির রাজসিক রেড ফোর্ট প্রাসাদ থেকে বুশ জনগণের সামনে ভাষণ দেবেন, যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা ভারতের স্বাধীনতা দিবসে ভাষণ দিয়ে থাকেন। সমস্যা হলো, এই রেড ফোর্টের অবস্থান পুরনো দিল্লির একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়, যা নাকি বুশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুঃস্বপ্নের মতো। এর পর আমরা এসে পৌঁছুলাম পরিকল্পনা নম্বর তিন-এ। প্রেসিডেন্ট বুশ ভাষণ দেবেন পুরানা কেল্লায়!

ব্যাপারটা বেশ শ্লেষপূর্ণ, তাই না? যে নাকি ভারতের সাম্প্রতিক আধুনিকতা নিয়ে এত বেশি আগ্রহী, তার জন্য একমাত্র নিরাপদ পাবলিক প্লেস হচ্ছে ভগ্নদশাপ্রায় মধ্যযুগীয় একটি কেল্লা?

যেহেতু পুরানা কেল্লাটি দিল্লির চিড়িয়াখানার সঙ্গেই অবস্থিত, সুতরাং শ্রোতাদের মধ্যে বেশ কিছু খাঁচাবন্দী প্রাণীও থাকবে। আর বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত খাঁচাবন্দী কিছু মানুষও থাকবে–যারা ভারতে 'খ্যাতনামা ব্যক্তি' হিসেবেই পরিচিত। আমাদের এই গরিব দেশের ধনীগোষ্ঠীর মানুষেরা মূলত একটি খাঁচাবন্দী প্রাণীর মতোই, যারা সম্পদ নামের সোনার খাঁচায় নিজেরাই নিজেদের কারারুদ্ধ করে রেখেছে। এভাবে নিজেদের অবরুদ্ধ রেখে সুরক্ষা করে চলেছে সেই সব লোকদের হুমকি থেকে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিয়মের যাঁতাকলে আটকে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের সব কিছু এবং পরিণতিতে হয়ে উঠেছে ইতর এবং আইনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অধম মানুষ।

সুতরাং জর্জ বুশের জন্য কি ঘটতে যাচ্ছে? গরিলারা কি তার ভাষণে হর্ষধ্বনি দেবে? গিবন নামের বানরগুলো তাদের ঠোঁট বাঁকাবে? বক্রচক্ষুর হরিণগুলো নাক সিঁটকাবে? শিম্পাঞ্জিরা কি বিরক্ত হয়ে গোলমাল সৃষ্টি করবে? প্যাঁচারা কি বিরাগসূচক ঘুৎকার ধ্বনি দেবে? সিংহগুলো কি হাই তুলবে আর জিরাফগুলো কি তাদের শূন্য সুন্দর চোখগুলোর অক্ষিপল্লব কি পিট পিট করবে? এখানে যে একটি বিদীর্ণ আত্মা রয়েছে কুমিরগুলো কি সেটা শনাক্ত করতে পারবে? ডিক চিনি, যে বুশের মৃগয়া সঙ্গী হতো এবং যার হাতের নিশানা কুখ্যাতভাবেই খারাপ, এই সফরে সঙ্গে না নেওয়ার জন্য তিতির পাখিরা কি বুশকে ধন্যবাদ জানাবে? প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তারা কি এ বিষয়ে একমত হবেন?

ওহ! ২ মার্চ বুশকে তো রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবেদী পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হবে। যদিও বুশ কোনোক্রমেই একমাত্র যুদ্ধাপরাধী ব্যক্তি নয়, যাকে ভারত সরকার রাজঘাটের বেদী পুষ্পাঞ্জলির জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। (মাত্র কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম মায়ানমারের স্বৈরশাসক জেনারেল থান শুয়ে কে সেখানে দেখা গেল, তার প্রতি কোনো রকম অশ্রদ্ধা না রেখেই এটা বলছি।) কিন্তু যখন জর্জ বুশ সেই অত্যন্ত মসৃন পাথরের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন, কোটি কোটি ভারতীয় সেটা প্রত্যক্ষ করবে এবং শিউরে উঠবে। ব্যাপারটা এমন যেন, গান্ধীর স্মরণে তিনি যেন সেই বেদীতে এক অঞ্জলিভরা রক্ত দান করলেন।

সে এটা না করলে আমরা প্রকৃতই খুশি হবো।

বুশের এ পরিদর্শনকে বাধা দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। তবে আমাদের প্রতিবাদ করার শক্তি আছে, এবং আমরা তা করবো। সরকার, পুলিশ, কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম তো তাদের পক্ষে যা কিছু সম্ভব করার চেষ্টা করবে, যাতে আমাদের এই বিক্ষোভ যতটুকু সম্ভব অবদমিত রাখা যায়। সুখী-সংবাদপত্রগুলো হয়তো এ ব্যাপারে কিছুই বলবে না, আর তাতে এই বাস্তবতাটাও ঘুরে যাবে না যে, সমগ্র ভারতে আমাদের মতো কোটি কোটি মানুষের কাছে বিশ্বের মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ আমাদের কাছে কিছুতেই স্বাগত নয়।

এনিমেল ফার্ম– ২

জর্জ বুশ যেখানে তার মনের কথাটি বলেছেন

২০০৬-এর মার্চে জর্জ বুশ রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে আসেন। সে সময় তিনি ব্যাপকভাবে জনরোষের সম্মুখিন হন। তার সফরের মাত্র কয়েক দিন আগে একটি ভাষণের পরিবর্তে 'এনিমেল ফার্ম টু' (প্রাণীদের দ্বিতীয় আবাসস্থল) শীর্ষক এই ব্যঙ্গাত্মক নাটিকাটি লেখা হয় এবং ২০০৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লি-র জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভার খোলা মঞ্চে গভীর রাতে এটি মঞ্চস্থ হয়।

ঘটনার দিন। পুরানা কেল্লা। দিল্লি-র চিড়িয়াখানা

এখন বসন্তকাল। নিম গাছে গাছে নুতন পাতা ভরে উঠেছে। রেশমী সুতো এবং তুতগাছ পত্রপল্লবে পুরোপুরি বিকশিত হয়ে উঠেছে। গাড়ির রাখার স্থান মার্সিডিস গাড়িতে পূর্ণ হয়ে আছে, যাদের ইঞ্জিনগুলো সচল, ভেতরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাও। উর্দিপরা শোফার (ব্যক্তিগত গাড়ির বেতনভুক্ত চালক) অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে উচ্চগ্রামে গাড়ির স্টেরিও থেকে হিন্দি ছবির গান শুনছে।

চিড়িয়াখানার ভেতরে পশুদের খাঁচা কয়েকদিন আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে, এবং সেখান থেকে ফিনাইলের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। খাঁচার শিকের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া ছোট ছোট আমেরিকান ও ভারতীয় পতাকাগুলো নানা জায়গায় পতপত করে উড়ছে। এবং প্রতিটি খাঁচার ওপরেই ভারি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত যুক্তরাষ্ট্রের সুঠাম পেশীর নিরাপত্তাকর্মীরা সানগ-াস পরে অবস্থান নিয়েছে। তারা খাঁচা এবং ভিড়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে যাতে বিন্দুমাত্র কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়। দেখে মনে হচ্ছে তারা নির্দিষ্টভাবে প্যাঙ্গোলিন নিয়ে তাদের একটু অস্বস্তি রয়েছে।

জর্জ বুশ নিজেও একটি বুলেট প্রুফ খাঁচার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। ধনী শিল্পপতি, সাংসদ এবং কিছু চলচ্চিত্র তারকাদের সামনে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন। তাদের সকলেই অসংখ্য আংটি পরে আছেন এবং তাদের অনেকেরই কব্জিতে জড়ানো রয়েছে বিবর্ণ-লাল সুতো।

জর্জ বুশ : হ্যালো সমবেত সৌভাগ্যবান অতিথিবৃন্দ! যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনতে ব্যস্ত কর্মসূচীর ভেতর থেকে কিছুটা সময় বের করে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

(হুলক গিবন কথাটা শুনে একটি হুটোপুটি খেল। ওরাংওটাং তার মক্ষিকা-তাড়ানোর কাজ ছেড়ে এদিকে একটু ফিরেও তাকাল না। আর, এক জায়গায় গুচ্ছবদ্ধ কতগুলো চিতাবাঘ মৃদুমন্দভাবে হেঁটে বেড়াল। এবং ধীরস্থির লরিস যেন একটু বিস্মিতই হয়েছে।)

আমি আজকে এখানে এশিয়ার দুটি মহান গণতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে কথা বলার

জন্য এসেছি। এই দুই দেশকে আমি আমার হারেমে আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইন্নিয়া ('ইন্ডিয়া'র উচ্চারণগত অপভ্রংশ) ... এবং আফগানিস্তান– সরি– পাকিস্তান। ধ্যাৎ! আমি জানতাম এটা কোথাও না কোথাও খালি খোঁচায়– তবে আফগানিস্তান ইতিমধ্যেই আমার হারেমে জায়গা পেয়েছে। তাই, ও-দেশকে আর আমার কব্জার ভেতরে আনবার দরকার নেই। হে! হে! ইন্নিয়ার (ভারতের) গণতন্ত্রটা মহান, কারণ, এখানে জনগণ এমন একটি সরকারের জন্য ভোট প্রদান করে– যে সরকার নাকি আমাকে মান্য করে চলে। আর আমি পাকিস্তানের গণতন্ত্রও পছন্দ করি, কেননা– ওখানে আছেন জেনারেল মোশাররফ, যাকে আমিই ভোট দিতে পারি। এবং একই কারণে আমি পছন্দ করি মধ্যপ্রাচ্য এবং সৌদি আরবের উন্নাসিক নেতাদেরকেও। ফিলিস্তিন কোনো ভালো গণতান্ত্রিক দেশ না, কারণ সেখানকার জনগণ এমন একটা লোককে ভোট দেয় যাকে আমি পছন্দ করি না। তবে যাই হোক, ইন্নিয়ার (ভারতের) গণতন্ত্রটাই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের।

পাঁচ শতাব্দীরও আগে, আমাদের অত্যন্ত নামকরা গণহত্যাকারী এবং আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস' ইন্নিয়া আবিষ্কার করতে বের হয়েছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, পৃথিবীটা গোলাকার। আর এখন আমার বন্ধু টম ফ্রিডম্যান বলেন– এটা নাকি সমতল। সত্যিকার বলতে কি, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আমার নিয়ন্ত্রণে আছে আর আমি এটা নিয়ে খেলাধূলা করতে পারি ততক্ষণ এই 'আকার' নিয়ে আমার আসলে খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। তবে তোমরা তো জানোই, 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস' ইন্নিয়ার পরিবর্তে আমেরিকা আবিষ্কার করে বসেছিল। আমাদের সৌভাগ্য যে ওখানেই অসংখ্য 'ইন্নিয়ান' (রেড ইন্ডিয়ান) ছিল। ঈশ্বরের সমর্থন পেয়ে আমরা তাদের সবাইকেই মেরে ফেলেছি– প্রায় চার থেকে ছয় কোটির মতো। আমি একদম সঠিক সংখ্যাটা মনে করতে পারছি না। আমার অফিস থেকে পরে এ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি পাঠিয়ে দেব। তবে এ বিষয়ে আমরা যেন আটকে না থাকি। বন্ধুদের মধ্যে একটা ছোটখাট গণহত্যা করলে কিই-বা হয়? মূল কথা হলো, আমরা এখন নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্র পেয়ে গেছি। এটা এমন একটা ভূমি যেটা মুক্তমানুষদের জন্য এবং সাহসী লোকদের যেটা একটি সূতিকাগার। আমাদের এখন অনেক বেশি নিউকুলার (নিউক্লিয়ার-এর উচ্চারণগত অপভ্রংশ 'নিউকুলার', অর্থাৎ বিশ্বকে আতঙ্কে হিমশীতল করে দেওয়ার মতো পারমাণবিক অস্ত্র) অস্ত্র আছে– যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আমি চাইলে, যদি আমার মন খারাপ থাকে তবে পুরো বিশ্বটাকেই এক মিনিটের ভেতরে ধ্বংস করে দিতে পারি। হে! হে! দুষ্টুমি করলাম। আমি আসলে অতো বেশি

খামখেয়ালি লোক নই। তা ছাড়া... আমি তো এখনকার মতো তোমাদের পক্ষে। ওহ্, মানে হলো– আমি এখন তোমাদের পক্ষে। আমি তো তোমাদের শত্রু নই, তাই না? আমাকে দেখে কি সে রকম লোক বলে মনে হয়? তোমরা কি 'স্লিপিং উইথ দ্য এনিমি' (শত্রুর সঙ্গে সহবাস) সিনেমাটা দেখেছো? আমি দেখেছি, এবং আমার স্ত্রী লরাকে বলেছি, সিনেমাটা ঠিকই আছে, শুধু প্রশ্ন হলো– কে কাকে সঙ্গমের জন্য আহ্বান করবে? হা! হা!

এরপর তিনি তার আশেপাশে উন্নাসিক, বিজয়োন্মত্ত চাহনি দিলেন, যাতে সবাই জানতে পারে সে কে এবং তাকে ভালবেসে সমীহ করতে পারে।

আমি দুঃখিত যে, আজ এখানে লরা আসতে পারেনি। মাদার ত্রেজা (তেরেসা)-র একটি এতিমখানায় সে এতিমদের নিয়ে ফটো-সেশন করতে গেছে। আমি সত্যিকার অর্থেই তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গ উপভোগ করেছি। তিনি এমন একটা লোক যার মাথায় একটি পাগড়ি রয়েছে এবং হাস্যকর উচ্চৈস্বরে যিনি কথা বলেন। তোমাদের বাড়ির কাপবোর্ডের ভেতরে যেসব ছোট ছোট কিছু নিউকুলার বোমা রয়েছে, আমি চেষ্টা করেছি তিনি সেগুলো যেন আমার হাতে তুলে দেন, যাতে আপনাদের হয়ে আমি নিজেই এগুলো দেখাশোনা করে রাখতে পারি। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী একজন ভালো মানুষ– সে তো অক্সফোর্ড ফেরত, তাই না? কিন্তু তারপরও সে কীরকম একটি হাস্যকর পাগড়ি পরে থাকে। আর যখন আমি আশেপাশে তাকাচ্ছিলাম, দেখতে পাচ্ছিলাম হাস্যকর রকমের পোশাক পরিহিতি সব লোকজন। কারো কারোর এমন কি দাড়ি পর্যন্ত আছে, দেখলে কেমন মুসলিম মুসলিম লাগে। এই গরমের দেশে যেসব লোকজন থাকে তাদের গায়ে কীরকম একটা গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু তারা কোনো সুগন্ধী ব্যবহার করে না। আমার প্রিয় সুগন্ধীর নাম হলো– 'ফ্রিডম'। এর ভেতরে চমৎকার লেবুর সুঘ্রাণ আছে। আমি মনে করি না যে, এরকম হাস্যকর রকমের পোশাক পরা লোকজনের হাতে এরকম 'নিউকুলার' অস্ত্র থাকা উচিত। সুতরাং তোমাদের কাপবোর্ডের ভেতরে যেসব ছোট বোমা রয়েছে, সেগুলো আমার কাছে দিয়ে দাও।

যুক্তরাষ্ট্রে আমরা কিন্তু বোমাগুলো কাপবোর্ডে রাখি না। আমরা সেখানে শুধু খোলসটাই রাখি। আমাদের সেসব খোলসের বেশ ভালো ভালো ডাকনাম আছে। তাদেরকে আমরা ডাকি 'পিস' (বিশ্বশান্তি) , 'ডেমোক্রেসি' (গণতন্ত্র) ও 'ফ্রি মার্কেট' (মুক্তবাজার) নামে। অবশ্য তাদের আসল নাম হলো– 'ক্রুস মিসাইল', 'ডেইসি কাটার' ও 'বাঙ্কার বাস্টার'। আমরা গুচ্ছ বোমাও পছন্দ করি। ওটাকে আমরা 'ক্লেয়ার' বলে ডাকি। এবং এটা আসলেই খুব সুন্দর। বাচ্চারা সেগুলোকে নিয়ে খেলতেও পছন্দ করে এবং সেটা তাদের মুখে অথবা ঘাড়ের ওপর বিস্ফোরিত

হয়। এতে তাদের অনেকে মারাও যায়। এটা সত্যিই একটা হুটোপুটির জিনিস। কিন্তু আমার মাকে আবার এই কথা বলে দিও না। তা হলে সে আমার জিহ্বা সাবান দিয়ে ধুতে বাধ্য করতে পারে।

আমি আজকে এখানে, কারণ এশিয়ায় খুব দ্রুতই পরিবর্তন আসছে। এবং আমি এইসব ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও পরিবেশ বিপর্যয়ের অংশ হতে চাই। এবং আমি ওই জিনিসগুলো বেশ পছন্দও করি, কিয়োটোর যেসব হাবা উন্মাদ আছে, যেটা নিয়ে নিঃসন্দেহে ওরা তোমাদের ওপর দোষারোপ করছে। আমি বিশ্বাস করি, ইন্নিয়াতে একটা নদীও খালি নেই যেখানে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। এবং পানীয় জলের স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু তার পরিবর্তে তোমরা কোকাকোলা খেতে পারো। এটা ঠাণ্ডা আবার স্বাদও বেশি। আর তোমাদের তো বিশাল বিশাল শপিং মল আছে। তোমাদের হাতে যদি টাকা থাকে, তবে সেখানে তোমরা যা খুশি তাই কিনতে পারো। এটা ভেবে আমি বেশ রোমাঞ্চিত হই যে, এখানকার ধনী ভারতীয়দের জীবনযাপন খুব দ্রুতই উন্নতি লাভ করছে। এবং ভারতীয় সিইও (কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা) খুব দ্রুতই আমাদের পশ্চিমাদের সমতুল্য হয়ে আসছে। এটা আসলেই চমৎকার। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের সিইও-দের আমরা ভতুর্কি দিই। আমরা তাদেরকে ভালবাসি বলে পচে গলে (দুর্নীতিগ্রস্ত) যেতে দেই। আমরা আমাদের কর্পোরেট কৃষদেরও ভালোবাসি। তাদেরকে আমরা কোটি কোটি ডলার ভতুর্কি দিই, কারণ তারা প্রকৃতই ভালো মানুষ। তারা তোমাদের কৃষকদের মতো শীর্ণদেহ, গরীব, আর আত্মহত্যাপ্রবণ নয়। তোমাদের কৃষক তো ভতুর্কি পাবার যোগ্যই নয়। কারণ তারা তো মানুষ ভালো না। তাদেরকে বরং প্রোজাকে (মাদক আস্তানায়) রাখা উচিত। তা হলে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগ কোম্পানিগুলোর আরেকটু বেশি আয় বাড়তো।

গত সপ্তাহে 'এশিয়া সোসাইটি'র ভাষণে আমি বলেছিলাম যে, এটা শুনে ভালো লাগল ভারতীয় ধনীরা যুক্তরাষ্ট্রের 'জেনারেল ইলেকট্রনিক', 'হোয়ার্লপুল' ও 'ওয়েস্টিংহাউজ' জাতীয় নানা কোম্পানির 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র', রান্নাঘরের বিশেষ যন্ত্রপাতি ও ওয়াশিং মেশিন কিনছে। তরুণ ভারতীয়দের খাদ্যরুচির উন্নতি লাভ করছে। তারা এখন ডমিনাস পিজা এবং হ্যামবার্গারই পছন্দ করে বেশি। এটা একটি জবর খবর, কেননা আমেরিকানরা এই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র স্থূলকায় জাতির উপাধি পেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। এই রান্নার পদ্ধতিও সত্যিকার অর্থে অতি বিরক্তিকর।

কিন্তু সব মন্দেরই একটি ভালো 'অ্যাপসিস' থাকে। বেশ ভালো 'অ্যাপসিস' থাকে। (একজন তার সহায়ক-কর্মী ছুটে এসে ফিসফিস করে বলল, মি.

প্রেসিডেন্ট, 'অ্যাপসিস' নয়, 'অ্যাসপেক্ট'।) আমি 'অ্যাসপেক্ট'ই বলেছি হেনরি।– এই বিরক্তিকর খাবারের ভালো 'অ্যাসপেক্ট' (দিকটা) হচ্ছে, এটা আমাদের প্রতিজ্ঞাকে আরো দৃঢ় করে, এবং মুজলিমদের (মুসলিম) বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা সেটাকে আরো জোরদার করে– ওহ্ ভুল বলেছি, আমাকে মাফ করবেন– মুজলিম নয়, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। আমি মুজলিমদের ভালবাসি। ভালোগুলোকে অবশ্য, ওই তাদেরকে যারা সন্ত্রাসী নয়, যারা কলসেন্টারগুলোতে কাজ করে। আমার বন্ধু টম ফ্রিডম্যান আমাকে বলেছেন– ইন্নিয়ার মুজলিম (ভারতীয় মুসলিম) নাকি সত্যিকারের ভালো মানুষ। সন্ত্রাসীদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী তোমাদের সবার ওপরেই সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারি রেখেছে। তোমাদের কোনো ধারণাই নেই তোমাদের সম্পর্কে আমরা কতোটা জানি। আমাদের আছে পর্যবেক্ষণের জন্য গোপন অনুসন্ধান ক্যামেরা। আছে তারবিহীন বিভিন্ন নজরদারি যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার– যেগুলো আমরা তোমাদের কম্পিউটারগুলোর সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি– যাতে আমরা সবসময়ের জন্য তোমাদের ওপর নজর রাখতে পারি। আমরা জানি তোমরা কোথায় যাচ্ছ, কী কিনছ এবং কার সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছ। আমি সন্ত্রাসীদের ঘৃণা করি, কারণ তারা মনে করে যে, একমাত্র তাদেরই মানুষ হত্যা করার অধিকার আছে। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার মা এবং গ্রান্ডমাদার– তোমরা হিন্দিতে যাকে নানি বলে থাকো, ঠিক?– বলতো, একমাত্র যে লোকটা মানুষকে হত্যা করার অধিকার রাখে এবং বিভিন্ন দেশকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে, অথবা সামরিক, রাসায়নিক কিংবা নিউকুলার (নিউক্লিয়ার) অস্ত্র ব্যবহার করার অধিকার রাখে– সেই অমোঘ ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তোমরা বলো তো দেখি সেই ব্যক্তিটা কে!

চিড়িয়াখানার সব প্রাণী আকস্মিক বিস্ময়ে ভয়ে বা চিৎকারে হুটোপুটি শুরু করলো। চিড়িয়াখানার পাগলাঘন্টি বিকটভাবে বাজতে আরম্ভ করলো।

আমি আজ এখানে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত, কারণ আমি পশুপাখি ভালোবাসি। আমি তাদেরকে শিকার করতে ভালোবাসি; বিশেষ করে তখন, যখন তারা খাঁচায় বন্দী অবস্থায় থাকে, এবং এ কারণে তারা আমাকে আর কামড়াতে পারে না। একবার একটা ছোট্ট মৌমাছি আমাকে কামড়ে দিয়েছিল। এবং যন্ত্রণায় খুব কান্নাকাটি করেছিলাম। আমি সে সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও ভালোবাসি যারা ইতিমধ্যেই অনাহারে ডুবে আছে এবং যাদেরকে আগেই বলপ্রয়োগে নিরস্ত্র করে দেওয়া হয়েছে। তোমরা তো জানোই যে, আই-রাকের (ইরাক) ব্যাপারে আমরা কতোটা ধূর্ত ছিলাম। আমি তো বোমা খুবই ভালোবাসি। কারণ তোমার

তাতে দেখতে হবে না যে তুমি কাকে মারলে। এ কারণে আমার মতো একটা ভিতুর ডিম মানুষের জন্য এটা খুবই উপযোগী। তবে তোমাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। আমি এখানে তোমাদের ওপর বোমা ফেলার জন্য আসিনি, অথবা তোমাদেরকে না-খাইয়ে রাখার জন্যও আসিনি। কারণ, তোমরা– ইন্নিয়ারা (ভারতীয়রা) তো এমনিতেই অনাহারে আছো। হা! হা!

এরপর তিনি তার সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ চাহনি দিয়ে আশেপাশে তাকালেন এবং দেখে মনে হলো তিনি একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেছেন যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তার আশেপাশের মানুষ ভয়ে বেশ খানিকটা কুকড়ে গেছে।

আহা! ... নানি আমাকে বলতো এই স্টুপিডের মতো ভুল বকাই আমার একটা সমস্যা। দুঃখিত। আসলে আমি যে কারণে এখানে, আমি ধনী ভারতীয়দের খুব পছন্দ করি। এ কারণে পছন্দ করি যে– তারা আসলে অনেক অনুগত হয়। তারা অনেক বুদ্ধিদীপ্তও হয়। যেটা নাকি সত্যিকার অর্থেই খুব বিরল একটা মনিকাঞ্চনযোগ। যুক্তরাষ্ট্রে আমরা তো এদের আদর্শ অভিবাসী মনে করি। আমি এ ধরনের অনুগত বুদ্ধিদীপ্ত ধনী ইন্নিয়াদের বেশ পছন্দ করি। কেননা, তারা আমাদের নানা সমস্যা সমাধানে অতিরিক্ত চিন্তাশক্তির জোগান দেয়, এবং বিদেশি রাষ্ট্রগুলোতে আমাদের যেসব ভোক্তা ও ক্রেতা আছে তাদের প্রয়োজনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জোগান দিয়ে আমাদের ব্যবসায়িক সিইও (নির্বাহী প্রধান)-দের বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ভোগ্যপণ্যের জন্য ইন্নিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার এবং সেটা খুব ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য এখানে প্রায় একশ কোটির ওপরে লোক আছে। ইন্নিয়া সরকারের সবচেয়ে ভালো দিক হলো, ইন্নিয়ার নিজের সম্পদগুলো আমাদেরকে নিয়ে যেতে দেয়। এই যেমন– কয়লা, বক্সাইট, বিভিন্ন খনিজ, এমন কি পানি ও বিদ্যুৎ। আমরা পরবর্তীতে সেগুলো বিপুল মুনাফায় তোমাদের কাছেই আবার বিক্রি করে দিই। সেটা আসলেই বেশ চমৎকার একটি ব্যাপার। এই জন্যই আমি ইন্নিয়ার সরকারকে ভালোবসি।

দুঃখজনকভাবে এই একশ কোটি লোকের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই খুব গরীব। আমি আবার গরীব লোকদের ঘৃণা করি, কারণ ওদের কোনো কিছু কেনার মতো টাকাপয়সাই নেই। আমার ইচ্ছে হয়, ওরা যদি হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। আমি তা হলে খুব খুশি হতাম। আমি শুনে বেশ আনন্দ পেয়েছি যে, হাজারে হাজারে ইন্নিয়ার কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। যুক্তরাষ্ট্রে আমরা এদেরকে বলে থাকি– দায়িত্বজ্ঞানহীন আত্মবিধ্বংসী আচরণ হিসেবে। তবে এখানে এই আচরণ

আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারতাম এবং এটাকে যদি খুব দ্রুতগতিশীল করা সম্ভব হতো, তা হলে কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা আরো বাড়াতে পারতাম। তবে এসব গরিবদের নিয়ে একটা সুবিধাও আছে। এরা বেশ ভালো গৃহপরিচারক-পরিচারিকা হয়। এবং কায়িক শ্রমে এরা বেশ পারঙ্গম। এসব কাজে আমাদের কিছু লোক দরকার আছে অবশ্য।

আমরা আশা করছি খুব শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেশনগুলো ইন্নিয়ার বীজ, গাছগাছালি, জীববৈচিত্র্য, গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামো, এমনকি তাদের নতুন নতুন আইডিয়ারও মালিক হয়ে যাবে। যেমনটা আমি বলেছিলাম, ইন্নিয়ানরা তো যথেষ্ট পরিমাণেই মেধাসম্পন্ন, আর কখনো কখনো তাদের মাথায় ভালো ভালো আইডিয়াও আসে। সুতরাং এসব নতুন আইডিয়া আমরা ইন্নিয়ার অধীনে রেখে দিতে পারি না। আমরা এসব কৃষকদেরকে নিজেদের শস্যবীজের মালিক হিসেবে রেখে দিতে পারি না। প্রত্যেকেরই তাদের প্রয়োজনে যেকোনো কিছু আমাদের কাছে চাওয়া উচিত। সবাই যখন আমার অনুমতি চাইতে আসে তখন এই আধিপত্য আমি বেশ পছন্দ করি। ডিক তো বলেই যে, জগতে আসল ব্যাপারটা হলো 'নিয়ন্ত্রণ'।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কর্পোরেশনের ব্যাপারে গর্ব বোধ করি যেটা বিল গেটস-এর মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল। সে তো প্রায়ই ইন্নিয়া সফরে আসে। সে তো খুবই চমৎকার এবং খুব উদার প্রকৃতির একজন লোক। সে তো এইচআইভি-এইডস-এর মোকাবিলা করতে ইন্নিয়া সরকারকে কয়েক কোটি ডলার দান করেছে। কিন্তু আমার ওইসব লোক পছন্দ না নয় এইচআইভি-এইডস-এ আক্রান্ত। কারণ তাদের বেশির ভাগই কৃষ্ণাঙ্গ ও সমকামী। আমি ওইসব কোম্পানিকে পছন্দ করি যারা এমন উচ্চমূল্যে এইচআইভি-এইডস-এর ওষুধ তৈরি করে, যা কেনার সাধ্য গরীবদের নেই। আমি ওই সব কুৎসিত বা নিম্নরুচির চাঁছাছোলা কৌতুক পছন্দ করি। ওহ্! আমি তো বিল-কে নিয়ে কথা বলছিলাম। বিল গেটস-এর কয়েক কোটি ডলার সাহায্যের বিনিময়ে ইন্নিয়ান সরকার কোটি কোটি ডলার কম্পিউটার টেকনোলোজি কিনে থাকে। সে এত ধনী যে আমার মাঝে মধ্যে ভয় হয়, কোন সময় আবার ফেটে না যায়। তার আশেপাশে থাকলে আমি সবসময় একটি অ্যাপ্রোন পরে থাকি।

আমি নিজেও যথেষ্ট ধনী। এবং আমার বন্ধুরাও ধনী, বন্ধুর বন্ধুরাও ধনী, এবং আমার বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুরাও ধনী। বিশেষ করে ডিক চিনি। আমরা আমাদের ন্যাক্কারজনক চুক্তিগুলো একসঙ্গেই করে থাকি। তেল, অস্ত্র– এই সব আর কি। তবে এনরনে যেটা হচ্ছিল সেটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার। কিন্তু যতক্ষণ এটা টিকে ছিল ততক্ষণ বেশ ভালো ছিল। ডিককে আমি এই কারণে বিশেষ পছন্দ করি যে,

সংবাদ সম্মেলনে কী বলতে হবে সেটা সেই আমাকে সবচেয়ে ভালো বলে দিতে পারে। আমি তাকে সত্যিই খুব মিস করি। তবে আমি কখনই তার সঙ্গে মৃগয়াতে যাবো না। কারণ সে তার বেআইনি অস্ত্রটা দিয়ে যেকোনো সময় আমাকে গুলি করে বসতে পারে। এবং আমি ঠিক জানি না, আমি মারা গেলে তখন ঠিক কী করবো।

আমি এখন আই-রানের (ইরান) ওপর বোমাবর্ষণের জন্য মুখিয়ে আছি। আমাদের নতুন কিছু অস্ত্রপাতি আছে যেগুলো একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার। আশা করি এটাও বেশ মজারই হবে। আমি আশা করি ইন্নিয়াও তাদের কিছু সৈন্য আমাদের এ কাজে সাহায্যের জন্য পাঠাবে। এখানে তো তোমরা কতো লোক, এদের মধ্যে কয়েকজন মারা গেলে এমন কিছু হবে না। তা ছাড়া, তোমরা তো দলে দলে এমনিতেই বেআইনিভাবে আত্মহত্যা করো। তা হলে তোমরা কেন আইনসম্মতভাবে আই-রান অথবা আই-রাকে গিয়ে নিহত হবে না? আমরা তোমাদের জন্য একটি মরণোত্তর গ্রীনকার্ডের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেটা আমরা লেমিনেট করে দেব। তবে তার খরচ তোমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে। ব্যাপারটা তোমরা একটু ভেবে দেখতে পারো।

সময় দেওয়ার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এখনকার মতো বিদায়। জয় হিন্দ। আবার দেখা হবে।

দায়মুক্তি : কপিরাইট, মেধাসত্ত্ব আইন, জালিয়াতি, চৌর্যবৃত্তি, অনুলিপিকরণ সংক্রান্ত আইনকানুনের এই যুগে আমি এখানে স্বীকৃতি প্রদান করতে চাই যে, এই নাটিকা সম্পূর্ণভাবেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে রচিত। এখানে যে সব ধারণা প্রকাশ পেয়েছে– তা আমাদের অত্যন্ত নামকরা কবি, শান্তিকর্মী, নির্দোষ শিশু, মুক্তমনা ব্যক্তি এবং সমাজকর্মী জর্জ ডব্লিউ বুশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং তার জনসম্মুখে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এই নাটিকার একটি বড় অংশ ওয়াশিংটন ডিসিতে 'এশিয়া সোসাইটি'তে প্রদত্ত তার সাম্প্রতিক ভাষণ থেকে নেওয়া হয়েছে।[১১]

সে কারণে নাটিকাটির প্রদর্শন থেকে টিকিট বিক্রির যাবতীয় অর্থ রয়্যালটি বাবদ তার নিকট সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রাসাদ-কেলেঙ্কারি

এই প্রবন্ধ আউটলুক ম্যাগাজিনে [ভারত] ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ প্রথম প্রকাশিত হয়।

কেলেঙ্কারি অনেক সময় হাস্যকৌতুকময় হতে পারে। বিশেষ করে সেগুলো, যেখানে সাধুসন্তদের স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যায়, এবং তাদের সাধুসুলভ মস্তক-বেষ্টিত বলয়ের ওপর ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। তবে কিছু কেলেঙ্কারি আছে, যা খুব ক্ষতিকর হতে পারে, এবং কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করা ব্যক্তির চেয়ে কেলেঙ্কারি প্রকাশ করা ব্যক্তি বেশি ক্ষতির শিকার হতে পারে। আমরা এখন এ ধরনের একটি ঘটনার ভেতরে প্রবেশ করছি।

এর মূল কেন্দ্রে আছেন ভারতের সাবেক প্রধান বিচারপতি ওয়াই. কে. সাভারওয়াল, যিনি সাম্প্রতিক সময়ে এদেশের ক্ষমতাশীল প্রতিষ্ঠান সুপ্রিম কোর্ট নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। যখন একজন সাবেক প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে তার দায়িত্বকালীন সময়ে সম্পাদিত কোনো কর্মকাণ্ডের কেলেঙ্কারি রটে যায়, তখন সেই প্রতিষ্ঠানটিকে অব্যাহতি দিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিকে বিচারের মুখোমুখি করা একটু কষ্টসাধ্যই বটে। তবে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বিরূপ কোনো মন্তব্য করার মাধ্যমে তোমাকে সরাসরি জেলখানায় যেতে হতে পারে, যেরকমটি করে আমাদের মধ্যে অনেককেই বেশ ভালো খেসারত দিতে হয়েছে। এটা অনেকটা যেন এরকম একটি উদাহরণের মতো যে, আমাকে একটি নেকড়ে বাঘ, একটি মুরগি, এবং এক বস্তা শস্য নিয়ে নদী পার হতে হবে। পার করতে হবে একটি একটি করে। নদীটি তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ। ভরা নদীর বাঁকে আমার নৌকাটির তলাও ফাটা। আমার জন্য আপনারা সবাই একটু প্রার্থনা করবেন।

উচ্চতর আদালত, বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্ট, সে শুধু আইনকে সমুন্নতই করে না, আমাদের জীবনযাত্রার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করে। ছোট বা বড়– যেকোনো ক্ষেত্রেই এর রায় সুবিস্তৃত। এটি নির্ধারণ করে, আমাদের পরিবেশের জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা ভালো নয়। যেমন– আমরা কি কোনো বাঁধ তৈরি করবো? কিংবা নদীগুলোকে কি পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত করবো? আমরা কি কোনো পর্বতকে সরিয়ে ফেলবো, কিংবা কোনো বনাঞ্চলকে ধ্বংস করে ফেলবো? এটি নির্ধারণ করে আমাদের শহরগুলো দেখতে কেমন হবে এবং কাদের সেখানে বসবাস করার অধিকার থাকবে। এটি নির্ধারণ করে ঘিঞ্জি বস্তিগুলোকে নির্মূল করে ফেলা হবে কিনা। রাস্তাগুলো প্রশস্ত করা হবে কিনা, দোকানগুলো বন্ধ করে দেওয়া

হবে কিনা, কিংবা কোনো ধর্মঘটকে অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, কোনো শিল্পকারখানাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা। কিংবা সরিয়ে ফেলা অথবা বেসরকারিকরণ করা হবে কিনা। এটি নির্ধারণ করে, আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কী থাকবে, এবং আমাদের গণপরিবহনগুলোতে কী ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে। কিংবা ট্রাফিক আইন অমান্য করার জন্য কী ধরনের জরিমানার ব্যবস্থা থাকবে। এটি নির্ধারণ করে, একজন বিচারকের গাড়ির মাথার ওপরে কোন রঙের লাইন থাকা উচিত (লাল রঙের) এবং এই লাইটটি আদৌ ফ্লাশ করা উচিত কি উচিত নয় (উচিত)। নিজেকে 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসেবে তুলে ধরা রাষ্ট্রের জনগণের জন্য এটি সবধরনের নীতিনির্ধারণের প্রধান ভাগ্যনিয়ন্তায় পরিণত হয়েছে।

শ্লেষপূর্ণভাবে বলা যায়, রাজনীতিবিদ এবং তাদের অবলম্বন করা হিংসাত্মক পদ্ধতির ব্যাপারে ব্যাপক অসন্তুষ্টির ফলে জনমতের জোয়ারের ওপর ভিত্তি করেই আর্বিভূত হয়েছে বিচারব্যবস্থার এই কর্মতৎপরতা। ১৯৮০ সালের দিকে প্রথমবারের মতো আদালতগুলোর দরজা সাধারণ জনগণ এবং প্রান্তিক জনগণ, বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সেই সব আন্দোলন, যা ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে, তাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এটাই ছিল প্রথমবারের মতো জনস্বার্থে মামলা রজ্জু করার সূচনাকাল– যা ছিল একটি ক্ষণস্থায়ী আশা এবং সত্যিকারের কিছু প্রত্যাশার একটি স্বল্পস্থায়ী সময়।'

একদিকে যেমন জনস্বার্থে মামলার অধিকার সাধারণ নাগরিককে আদালতে প্রবেশের অধিকার প্রদান করে, অন্যদিকে এটি আদালতকেও জনগণের ভেতরে যে কোনো বিষয়ে প্রবেশের অধিকার প্রদান করে– যা এর আগে বিচারব্যবস্থার প্রভাব বলয়ের বাইরে ছিল। সুতরাং, এটা নিয়ে তর্ক করাই যায় যে, জনস্বার্থের মামলার কারণেই আদালত এতোটা ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে। বিগত ১৫ বছরের ভেতরে বেশ কিছু ধারাবাহিক তাৎপর্যপূর্ণ রায়ের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাটি নাটকীয়ভাবে তার নিজের ক্ষমতাপরিধির বিস্তার ঘটিয়েছে।

আজকের দিনে একজন নব্যউদারবাদী ব্যক্তি আমাদের জীবন ও কল্পনার ভেতরে তার দাঁত গভীরভাবে বসিয়ে দিতে পারে। কেননা, লাখ লাখ মানুষকে কপর্দকশূন্য ও অধিকারচ্যুত করে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র ভারতের অদৃষ্টের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য (অহিন্দু প্রবৃদ্ধির হার হবে ১০ শতাংশ)। একটি ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাষ্ট্রকে একটি ব্যাপক কর্মপদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কয়েকটি কৌশলের মধ্যে একটি ছিল এই ধারণাকে জাগিয়ে তোলা– যাকে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্তরা আদর করে ডাকে 'রুল অব ল' বা 'আইনের

শাসন'। আইনের শাসন হচ্ছে সম্পূর্ণই স্বকীয় একটি ধারণা, এবং সেটা ন্যায়বিচারের মূলনীতি থেকে অনেক ক্ষেত্রেই দূরে সরিয়ে দেয়। আইনের শাসন হচ্ছে একটি বাগবিধি যেটা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ ধারণ করে। এটা নির্ভর করে আইনগুলো কী এবং এর মাধ্যমে কাদের জন্য সুরক্ষা প্রদান করতে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে, তার ওপর।

উদাহরণ হিসেব বলা যায়, ১৯৯০-এর সূচনাকালে আমরা দেখেছি পদ্ধতিগতভাবে সেই সব আইনকে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সুরক্ষা প্রদান করতো শ্রকিদের অধিকার এবং সাধারণ জনগণের কতগুলো মৌলিক অধিকারকে (বাসস্থান/স্বাস্থ্য/শিক্ষা/পানি)। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন– আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্ব ব্যাংক এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) যেকোনো প্রকার ঋণ প্রদান করার পূর্বে এটাকে শুধু একটি পূর্বশর্ত নয়, সবসময়ের জন্য একটি লিখিত শর্ত দিয়েছিল (ভদ্র ভাষায় এটাকে বলা হয় একটি 'কাঠামোগত সংস্কার' হিসেবে)। এসব ক্ষেত্রগুলোতে আইনের শাসন বলতে আসলে কী বোঝায়?

'আ পিপল্‌স হিস্টরি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেট্‌স' বইতে এর লেখক হাওয়ার্ড বিষয়টিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন: 'আইনের শাসন কখনই ক্ষমতা এবং সম্পদের অসম বণ্টনকে দূর করতে পারে না। বরং ক্ষমতার কর্তৃত্বের মাঝে বৈষম্যেরই শক্তিবৃদ্ধি করে। এটা দারিদ্র্য এবং সম্পদকে ভাগ করে দেয়... এমন জটিল এবং পরোক্ষ উপায়ে যে, এর ভুক্তভোগীরা হতভম্ব হয়ে যায়।'[২]

যেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের পক্ষে অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারটি একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে (সিদ্ধান্ত, যেমন– গ্রামগুলো থেকে লাখ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা, কিংবা শহর থেকে বিতাড়িত করা অথবা চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া), সে সব ক্ষেত্রে আইনের শাসনকে সমুন্নত করার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে আদালতের হাতে এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হচ্ছে। বিচারিক ক্ষমতার এই যে সম্প্রসারণ, এর সঙ্গে জবাবদিহিতা একইভাবে বৃদ্ধি পায়নি। বিচারব্যবস্থা যেকোনো ধরনের উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার মূল দর্শনগত উদ্যোগকেই ভণ্ডুল করতে সক্ষম, যেখানে অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো যার মাধ্যমে পরিচালনা করতে বাধ্য। 'কমিটি ফর জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টিবিলিটি'[৩] নামের একটি বিচারিক জবাবদিহিতা প্রদান কমিটি এই বিষয়ের বিরোধিতা করে এই মতামত দিয়েছে যে, একটি স্বাধীন শৃঙ্খলারক্ষকারী একটি সজ্ঞ তৈরি হোক– যারা বিচারিক প্রক্রিয়ার দুর্ব্যবস্থার বিষয়গুলি তদন্ত করতে পারবে। এটি অধ্যাদেশ জারি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির

অনুমতি ছাড়া (যে অনুমতি কখনই দেয়া হয়নি) দায়িত্বপালনরত কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে এফআইআর (ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট) নিবন্ধ করা যাবে না। 'রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট' বা তথ্য জানার অধিকার আইন থেকে এটা এখন পর্যন্ত নিজেকে সফলভাবেই রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এর অস্ত্রসম্ভারে সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্রটি হলো, আদালত অবমাননা আইন (কনটেম্পট অব কোর্ট)– যার অধীনে সেসব কর্মকাণ্ডকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে, যা করা বা বলার মাধ্যমে আদালতের অধিকার খর্ব হয় বা আদালত কেলেঙ্কারিতে পতিত হয়। যদিও আইনটি প্রণীত হয়েছিল মধ্যযুগোপযোগী রমনীসুলভ মাধুর্যময় প্রাচীন ভাষায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি বিচারবিভাগকে প্রদান করেছে অত্যন্ত শক্তিশালী যদৃচ্ছামূলক একটি ক্ষমতা– যার মাধ্যমে এটি এর সমালোচনাকারীদের নীরব করে দিতে পারে এবং যারা বিব্রতকর প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে, তাদের যে কাউকে কারাবন্দী করতে পারে। সুতরাং এটা সামান্যই বিস্ময়কর যে, বিচারব্যবস্থার দুর্নীতি-সংক্রান্ত বা নিত্যদিনের আদালত কক্ষকে নাড়িয়ে যাওয়া কেলেঙ্কারি উন্মোচনকারী প্রতিবেদন ছাপাতে সংবাদমাধ্যম কেন নিজেদের রাশ টেনে ধরে। খুব কম সাংবাদিকই আছেন যারা একটি সুদীর্ঘ ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার অথবা কারাদণ্ড ভোগ করার ঝুঁকি নিতে সাহসী হবেন। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত আদালত অবমাননার অধীনে এমন কি 'সত্যবাদিতা'ও একটি আত্মরক্ষার গ্রহণযোগ্য উপায় হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং, উদারহরণ হিসেবে ধরুন আমাদের সামনে একটি প্রমাণিত তথ্য আছে যে, একজন বিচারক কারো ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন কিংবা কাউকে ধর্ষণ করেছেন, অথবা ঘুষ খেয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো একটি রায় ঘোষণা করেছেন। এই ধরণের প্রমাণাদি জনসম্মুখে তুলে ধরলে তা কি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে? কেননা এটা হয়তোবা একটি আদালতের ক্ষমতাকে অবনমন করা কিংবা অবনমন করার প্রচেষ্টা, অথবা কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করার চেষ্টা হিসেবে গণ্য হবে।'

হ্যাঁ, এসব ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে, তবে তা সামান্যই। গত বছরই পার্লামেন্টে আদালত অবমাননার আইনের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে যেন সত্যবাদিতা একটি গ্রহণযোগ্য আত্মরক্ষার পন্থা হিসেব গণ্য হয়। কিন্তু বেশিরভাগ মামলার ক্ষেত্রেই (যেমন সাবেক প্রধান বিচারপতি ওয়াই. কে. সাভারওয়াল-এর 'ঘটনা'য়) কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্য সেটির তদন্ত করা একটি আবশ্যিক কাজ। কিন্তু সুস্পষ্টতই যখন তুমি কোনো তদন্তের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমাকে তার কারণ বা সন্দেহমূলক অভিযোগগুলো বলতে হবে; এবং যখন তুমি কারণটা বলবে তখন তোমার বক্তব্যের মাধ্যমে তুমি একজন

বিচারকের বিরুদ্ধে অমর্যাদাকর ধারণাগুলোই প্রচার করছো, যার জন্য তুমি আদালত অবমাননা দোষে আটকে যেতে পারো। সুতরাং, কোনো কিছু তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নয়, এবং কোনো কিছুর প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তা তদন্ত করা সম্ভব নয়।

এখন একমাত্র বাস্তবসম্মত যে বিকল্পটি সামনে রয়ে গেল, তা হলো শুধু নির্মল ধারণা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–

১. ভারতের সব বিচারক হচ্ছেন স্বর্গীয় সত্তা
২. তারা সবাই নির্দোষ, পরিপূর্ণ, ন্যায়ানুগ। স্বচ্ছতা এবং সততা তাদের 'ডিএনএ'-এর ভেতরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।
৩. এই বাস্তবতা প্রমাণিত যে, আমাদের রাষ্ট্রের ইতিহাসে এ যাবৎকালে কোনো বিচারক কোনোভাবেই অভিশংসিত কিংবা শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত হননি।
৪. জয় বিচারব্যবস্থা, জয় হিন্দ।

এ সবকিছু একটু হলেও হতবুদ্ধিকর হয়ে পড়ে যখন জনসম্মুখে আমাদের বিচারব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত দুর্নীতির বিবৃতি দেন এস.পি. ভারুচার মতো একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি।[৫] এসব শোনার সময় সম্ভবত আমাদের উচিত কানে তালাবদ্ধ করে বসে থাকা, কিংবা কোনো মন্ত্র জপ করতে থাকা।

এটা আমাদের অহংবোধকে আহত করতে পারে, এবং কোনো কিছু স্বীকার করার মুক্ত স্পৃহা বা মানসিকতাকে নির্মূল করতে পারে। কিন্তু এটাই সত্য যে, আমরা এ বিশেষ ধরনের এক স্বৈরতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থার মধ্যেই বসবাস করছি। আর এখন তো রাজপ্রাসাদের কেলেঙ্কারিই প্রকাশিত হলো।

২০০৬ সালটা দিল্লির জনগণের জন্য একটা কঠিন বছর ছিল। সুপ্রিম কোর্ট ধারাবাহিকভাবে এখানে বেশ কয়েকটি আদেশ জারি করেন যেটা এ শহরের অবয়বটাকে অনেকখানি পাল্টে দেয়। এটি এমন একটি শহর যেটি বিগত কয়েক বছর ধরেই কিছুটা আইন না মেনেই অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওয়াই. কে. সাভারওয়াল-এর নেতৃত্বে একটি ডিভিশন বেঞ্চ এই মর্মে আদেশ প্রদান করেন– হাজার হাজার দোকান, ঘরবাড়ি এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে যেগুলোর ভেতরে রয়েছে– আদালতের ভাষায়– আইনবহির্ভূত ব্যবসা। এসব ব্যবসা আবাসিক এলাকায় দশকের পর দশক ধরে চলে আসছিল। আর তা ছিল নগরের পুরাতন মূলপরিকল্পনার বাইরে।

এটা সত্য যে, ভূমির ব্যবহারের পুরাতন মূলপরিকল্পনা অনুযায়ী, এইসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এই মূলপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তে ছিল, সেই পৌর কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক এলাকার মাত্র এক চতুর্থাংশ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেছিল, অন্যদিকে জনগণ তাদের নিজেদের মতো করেই ব্যবস্থা করে নিচ্ছিল। (এবং তাদের সমগ্রজীবনের সঞ্চয়কে এসব ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করেছিল।) তারপর হঠাৎ করেই দিল্লি হয়ে গেল নব্য আবির্ভূত একটি সুপার পাওয়ারের রাজধানী নগর। সুরাং তার বহিরাবরণও সেই রকম সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার হলো। এ করার জন্য সহজতম উপায় ছিল আইনের শাসনকে সামনে নিয়ে আসা।

এই বন্ধ করে দেওয়ার আদেশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শত সহস্র মানুষের জীবন ও জীবিকা। সেখানে অনেক বিরোধিতা ছিল, সংঘর্ষ ছিল। শহর জ্বলছিল আগুনে। র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‍্যাফ)-কে মাঠে নামানো হয়েছিল। জনগণের ক্রমবর্ধমাণ ক্রোধ ও দুর্দশা দেখে ভয় পেয়ে দিল্লি সরকার আদালতকে অনুরোধ করেছিল তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য। এবং উপস্থাপন করেছিল '২০২১ মাস্টারপ্লান' নামে নতুন পরিকল্পনার, যাতে এখন পর্যন্ত আবাসিক হিসেবে নির্ধারিত কিছু অঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্যও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বিচারপতি সাভারওয়াল অবিচলিত রয়ে গেলেন। তিনি যে বেঞ্চের নের্তৃত্বে ছিলেন, সেটি নির্দেশ প্রদান করলেন 'বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া'টি চলতে থাকবে।[৬]

কাছাকাছি সময়ে সুপ্রিম কোর্টের অপর একটি বেঞ্চ নির্দেশ প্রদান করলেন 'নাঙলা মাছি' ও বিভিন্ন ঝুগ্গি কলোনি ধূলিস্যাত করা হোক। এর ফলে শত সহস্র মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ল। বসবাস করতে লাগলো নিজেদের ভেঙে ফেলা ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষের ওপরে। গ্রীষ্মের তীব্র রোদ্দুর ও গরমের ভেতরে।[৭]

এমনকি আরেকটি বেঞ্চ ঘোষণা করলো, নগরের রাজপথ থেকে সকল নিবন্ধনহীন হকার উচ্ছেদ করতে। যদিও দিল্লি ক্রমাগতভাবেই এর দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছিল। এর নগরবাসীর আশেপাশ দিয়ে এক নতুন ধরনের শহর যেন লাফ দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো। একটি ঝা চকচকে শহর, যা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কর্পোরেট মল ও বিনোদনের 'মাল্টিপ্লেক্স'-এর সমন্বয়ে গঠিত– যেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের নতুন নতুন পণ্যগুলো প্রদর্শন করে। যে সব মানুষের ঘরবাড়ি দোকানপাট অফিস প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হলো, তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অবস্থা-সম্পন্ন লোকেরা লাইন দিলো, এসব নতুন মলগুলোতে একটুখানি জায়গার বুকিং দিতে। দাম হঠাৎ করেই

আকাশচুম্বি হলো। দোকান বুকিংয়ের ব্যবসা রাতারাতি রমরমা হয়ে গেল, শহরে এটাই ছিল একেবারে আনকোরা এক উন্মাদনা।

এসব শপিং মলের কিছু কিছু আবার নিজেরাই যেন একেকটি ছোট শহর। এবং এদের অনেকগুলোই ছিল অবৈধ স্থাপনা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এ ধরনের অসদাচরণকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলো। আইনের শাসন হঠাৎ করেই যেন তার চোখ বন্ধ করে নিল। এবং চা পানের বিরতিতে চলে গেল। ১৭ অক্টোবর ২০০৬-এ 'বসন্ত কুঞ্জ মল'-এর বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশনের রায়ে (যাতে এসব শপিং মলের নির্মাণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়) বিচারপতি অরিজিৎ পাসায়াত এবং এস.এইচ. কাপাডিয়া বললেন,

এ জাতীয় নির্মাণাধীন সংস্থাগুলো যদি 'ডিডিএ' থেকে ছাড়পত্র না পেত তবে তারা এখানে এত বিশাল অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করতো না। 'যেখানে এসব অননুমোদিত নির্মাণকাজ চলছে, সেখানে এসবের অপসারণ হচ্ছে এ সমস্যার একমাত্র বিকল্প'– এ রকম একটি 'মতাদর্শ' বর্তমান এ মামলার জন্য প্রযোজ্য নয়। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, যেখানে অন্যান্য কিছু ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে আইনের অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে, তার বিপরীতে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেখানে তাদের কোনো অপব্যবহার এবং অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনার প্রশ্ন অবান্তর, এটা হচ্ছে সে ধরনের একটি ক্ষেত্র।[৮]

কথাগুলো বেশ জটিল, আমি জানি। পুরো রায়ের অর্থ উদ্ধার করতে আমার এক বন্ধু এবং আমি– দুজনে একসঙ্গে বসেছিলাম, যাতে এটাকে একটি সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা যায়। মূলত–

ক. যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে নির্মাণকাজ অননুমোদিত এবং সম্ভবত এর যথোপযুক্ত সব ছাড়পত্র নেই। বিরাট অঙ্কের অর্থ এখানে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে এর ধ্বংস সাধনই একমাত্র বিকল্প নয়।

খ. অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে ভূমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আইনের অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু এই বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছেন মূলত কর্পোরেট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, এবং এখানে এ ধরনের কোনো সম্ভাবনার প্রশ্নই নেই যে, তারা এ জাতীয় বরাদ্দ অনুমোদন পাবার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অসৎ কার্যপদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন।

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ পেতে কোনো অসৎ প্রক্রিয়াতে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনার প্রশ্নটি এখানে উঠতে পারে না। এরকমটিই আমাদের ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন।[৯] সেই সব উন্মত্ত জনগণকে আমাদের কি বলা উচিত, যারা রাজপথে

আদালতের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় এই বলে প্রতিবাদ করছে যে, আদালত হলো 'নব্য কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ'-এর একটি ঘুটি মাত্র? আমরা কি তাদেরকে গলাফাটানো চিৎকারে নিশ্চুপ করিয়ে দেব? আমরা কি বলবো– 'এনরন' জিন্দাবাদ? বেকটেল, হ্যালিবার্টন জিন্দাবাদ? 'টাটা, বিড়লা, মিত্তাল, রিলায়েন্স, বেদান্ত, অ্যালকান জিন্দাবাদ?' 'কোকাকোলা এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে'? সাভারওয়াল-এর ঘটনাটি ঘটার সময় সুপ্রিম কোর্টের ভেতরে এটাই তো তা হলে আদর্শগত পরিবেশ।

এটা স্পষ্ট করে দেওয়া জরুরি যে, বিচারপতি সাভারওয়াল-এর আদেশটি মোটেও তাৎপর্যপূর্ণভাবেই ভিন্ন কিংবা ওই সময়ের সেসব অন্যান্য বিচারপতির রায়ের সঙ্গেও আদর্শগতভাবে সাংঘর্ষিক ছিল না যারা এ ধরনের কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়াননি বা যাদের ব্যক্তিগত সততা কখনই প্রশ্নের মুখে পড়েনি। কিন্তু একজন বিচারপতির আদর্শগত অবস্থানগ্রহণ তার ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধি বা স্বার্থের সংঘাত থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন একটি ব্যাপার, যার মাধ্যমে আমরা বিচারপতি সাভারওয়াল-এর আদেশের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারতাম। এবং এ কাহিনির সারমর্ম এটাই।

বিচারপতি সাভারওয়াল ২০০৭-এর জানুয়ারিতে অবসর গ্রহণের পূর্বে সংবাদমাধ্যমের কাছে চূড়ান্ত বিবৃতির সময় তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন সময়ের মধ্যে তিনি যে সব রায় দিয়েছেন, তার মধ্যে যে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করা সব থেকে কঠিন ছিল, সেটা হলো– দিল্লির হাজার হাজার 'অবৈধ' দোকান, ঘরবাড়ি এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ। সম্ভবত তাই হবে। 'ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা' দেখানো এত সহজ বিষয় নয়।

২০০৭-এর মে মাসে সান্ধ্যকালীন সংবাদপত্র 'মিড ডে' পত্রিকার দিল্লি সংস্করণে বিচারপতি সাভারওয়ালের পক্ষ থেকে বিচারবিভাগীয় গুরুতর অসদাচরণের ওপর একটি বিস্তারিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন (এবং একটি কার্টুনচিত্র) প্রকাশ করা হয়। ওই প্রকাশিত নিবন্ধগুলো ইন্টারনেটে সহজলভ্য। 'মিড ডে' পত্রিকা যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছিল, তার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে বিচারবিভাগীয় জবাবদিহিতা আদায়ের জন্য কমিটি গঠনের চাপ তৈরি হয়, যেখানে সিনিয়র আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সমাজকর্মীরা প্রধান পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা পালন করেন।[১০]

অভিযোগগুলো সংক্ষেপে নিচে তুলে দেওয়া হলো–

১. বিচারপতি ওয়াই. কে. সাভারওয়ালের পুত্র চেতন ও নিতিনের তিনটি কোম্পানি ছিল: পবন ইমপেক্স, সাবস এক্সপোর্টস এবং সাগ এক্সপোর্টস– যে অফিসগুলো প্রথম নিবন্ধিত করা হয়েছিল তাদের পারিবারিক বাসস্থান ৩/৮১

পাঞ্জাবি বাগ, নতুন দিল্লির ঠিকানায়। এবং পরবর্তীতে এগুলোকে তাদের পিতার সরকারি আবাসস্থল ৬ মতিলাল নেহরু মার্গ, নিউ দিল্লির ঠিকানায় স্থানান্তর করা হয়।

২. প্রধান বিচারপতি হওয়ার পূর্বে তিনি যখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন, তখন তিনি দিল্লির বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার রায়টি নিজে তলব করে পাঠান এবং নিজের হাতে নেন। (এবং কাজটা অবৈধ ছিল। কারণ, অন্য কোনো বেঞ্চে বিবেচনাধীন কোনো মামলা তলব করার ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রধান বিচারপতি রয়েছে।)

৩. একই সময়ে একটি বৃহৎ শপিং মল কেতাদুরস্ত 'স্কয়ার ১ মল'-এর পুরুষোত্তম বাঘারিয়া এবং বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স ডেভেলপার কোম্পানি 'বিজনেস পার্ক টাউন প্লানারস (বিপিটিপি) লি.'-এর কাবুল চাওলার সঙ্গে বিচারপতি সাভারওয়ালের পুত্ররা অংশিদারিত্বের চুক্তি করেন। এর ফল অন্যরকম হয়। কেননা, বিচারপতি সাভারওয়ালের 'বন্ধ' আদেশের ফল হিসেবে এসব মল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণকে বলপূর্বক সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এতে ওসবের মূল্য উর্ধ্বমুখী হয় যার ফলে প্রাসঙ্গিকভাবে বিচারপতি সাভারওয়ালের পুত্র ও তাদের ব্যবসায়ী অংশীদাররা বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করে।

৪. পবন ইমপেক্স প্রকল্পের নিরাপত্তা জামানতের বিনিময়ে ইউনিয়ন ব্যাংক তাদেরকে ২৮ কোটি রুপি (৫৬ লাখ ডলার) ঋণ দেয়। পরবর্তীতে দেখা যায় এই পবন ইমপেক্স প্রকল্পের কোনো অস্তিত্ব নেই। বিচারপতি সাভারওয়াল বলেছেন, তার পুত্রদ্বয়ের কোম্পানীগুলোর ৭৫ কোটি রুপি (এক কোটি ৫১ লাখ ডলার) পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের সুবিধা ছিল।

৫. যেহেতু এখানে স্বার্থের সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব রয়েছে, তার উচিত ছিল 'বন্ধ' করে দেওয়া মামলার শুনানী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া (এর পরিবর্তে তিনি বরং বিপরীত কাজটিই করেছেন– অন্য বেঞ্চ থেকে মামলাটি নিজের কাছে তলব করেছেন)।

৬. 'নয়দা' প্রকল্প থেকে সাভারওয়ালের পুত্রদের কোম্পানির নামে মুলায়াম সিং/ অমর সিং সরকার কর্তৃক প্রায় বিনামূল্যে বেশ কিছু সংখ্যক শিল্প ও বাণিজ্যিক ভূমির প্লট প্রদান করা হয়। সে সময় অমর সিং-এর 'ফোন টেপ' মামলার বিচারপতির আসনে ছিলেন সাভারওয়াল (যে মামলায় তিনি সেই ফোন টেপের যে কোনো ধরনের প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।)

৭. তার পুত্র মহারানি বাগ এলাকায় ১৫ কোটি ৪৬ লাখ রুপি (৩১ লাখ ডলার)

একটি বাড়ি ক্রয় করেছিলেন। অর্থের এ উৎস এখনও অজানা রয়ে গেছে। তাদের দলিলপত্রে পিতার নাম লিখেছেন 'যোগেশ কুমার' (যেসব ছেলেরা পিতার সরকারি বাসভবনের ঠিকানায় ব্যবসা চালাতে দ্বিধা করে না, তাদের জন্য এটা বেশ ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ বটে।)

এসব অভিযোগের সমর্থনে আছে অত্যন্ত নিরেট ও অপরিবর্তনীয় দলিলপত্রাদি : ইউনিয়ন মন্ত্রণালয় থেকে তৈরি করা নথিপত্র, নিবন্ধনের দলিল, বিভিন্ন কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সনদপত্র, শেয়ারহোল্ডারের নোটিশ ও প্রকাশিত তালিকা, যেখানে নিতিন ও চেতনের কোম্পানিগুলো শেয়ার ক্যাপিটাল বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়াও আছে আয়কর বিভাগ প্রদত্ত বিভিন্ন নোটিশ, এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও স্বয়ং বিচারপতির মধ্যে ফোনালাপের রেকর্ডকৃত একটি সিডি।

এই প্রমাণপত্রাদি দেখে মনে হচ্ছে, দিল্লি যখন আগুনে পুড়ছিল, যেখানে হাজার হাজার দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল এবং তাদের মালিক ও কর্মচারীদেরকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল, তখন বিচারপতি সাভারওয়ালের পুত্র ও তার অংশীদারগণ ধন সম্পদে ফুলে ফেঁপে উঠছিল। 'নব্য ভারত' কীভাবে কাজ করে– তারা সম্ভবত তা নির্দেশিকা ম্যানুয়ালের মতোই গুরুত্ব দিয়ে পড়েছিলেন।

কাহিনীটা যখন জনগণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন জে.এস. ভার্মা নামের অপর একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি 'সিএনবিসি' টেলিভিশন চ্যানেলে করণ থাপার উপস্থাপনায় প্রচারিত 'ইন্ডিয়া টুনাইট' নামে একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। একজন প্রাক্তন বিচাপতির সমগ্র প্রজ্ঞা ও সর্তকতা নিয়ে অনুষ্ঠানটিতে কথা বলেন তিনি। এবং সেসবের ভিত্তিতে তিনি বলেছিলেন: 'এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এটি ভ্রান্ত কার্যকলাপের চূড়ান্ত রূপ... সরকারি দায়িত্বশীল পদে কর্মরত যে কোনো ব্যক্তি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত তিনি জনগণের কাছে জবাবদিহিতায় বাধ্য। সুতরাং এটা জানতে জনগণের সব ধরনের অধিকার আছে যে, কীভাবে তারা কাজ করছেন এবং যত বেশি ক্ষমতাশীল দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত তত বেশি তার দায়বদ্ধতা থাকবে।' বিচারপতি ভার্মা এটাও বলেছিলেন, যদি এই কথাগুলো সত্য হয়ে থাকে তবে এটা অবশ্যই একটি পরস্পর স্বার্থবিরোধী দ্বন্দ্বের একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবে এবং বিচারপতি সাভারওয়ালের 'বন্ধ' আদেশের পুরো মামলার পুনর্শুনানি হতে হবে।[১১]

সমগ্র ঘটনার সারমর্ম এটা। এটাই সেই ঘটনা যা এই সমাজের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য হয়েছে। লাখ লাখ জীবন বিপন্ন হয়ে গেছে। এটা যদি সত্য হয়, যে রায় এ ধরনের ঘটনার জন্ম দিল তা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়– তার সংশোধন অবশ্যই করতে হবে।

কিন্তু এই ঘটনাগুলো কি সঠিক?

কেলেঙ্কারিগুলো এ ধরনের ক্ষমতাবান ও খ্যাতনামা লোকদের ক্ষেত্রে প্রায়শই দূরভিসন্ধিমূলক, বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মূলত অসত্য হয়ে থাকে। এটা সর্বজনবিদিত যে, বিচারকরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন জলজ্যান্ত শত্রু তৈরি করে যাচ্ছেন। তাদের বিচারকাজ পরিচালনার সময় প্রতিটি মামলাতেই একজন জয়ী এবং একজন বিজেতা থাকেন। এবং এটাও প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিচারপতি সাভারওয়াল তার জীবদ্দশায় তারজন্য উপযোগী বেশ ভালো পরিমাণ শত্রুই উৎপন্ন করেছেন। আমি যদি তিনি হতাম এবং আমার যদি সত্যিকারের লুকানোর মতো কোনো কিছু না থাকতো তবে আমি প্রকৃতপক্ষে বরং একটি তদন্ত কর্মকে স্বাগত জানাতাম। প্রকৃতপক্ষে, আমি হয়তোবা প্রধান বিচারপতির নিকট প্রার্থনাই জানাতাম যেন একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। যারা আমার বিরুদ্ধে এসব বানোয়াট প্রমাণপত্র তৈরি করেছে, তাদের পেছনে যাওয়ার জন্য আমি এটাকে একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করতাম।

যেটা নিশ্চিতভাবে আমি করতাম না, সেটা হচ্ছে– অত্যন্ত দুর্বল একটা আত্মরক্ষামূলক অকার্যকর লেখা লিখে ঘটনাকে আরো খারাপ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যেটা মূল অভিযোগগুলোর প্রতি কোনো নজর দিত না এবং কারো বিশ্বাসও অর্জন করতে পারতো না।[১২]

সমানভাবেই, আমি যদি বর্তমানে কর্মরত প্রধান বিচারপতি হতাম, অথবা এমন যে কোনো ব্যক্তি– যে কিনা যথাযথভাবেই আদালতের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে আগ্রহী (ভাগ্য ভালো যে এটা আমার কাজের ধারা নয়), আমি অবশ্যই জানতাম যে, একেবারে শেষ মুহূর্তে কার্পেটের নিচে ধূলাবালিকে চাপা দিয়ে দেওয়াটা; অথবা যারা এ বিষয়গুলোকে সামনে এনেছেন, তাদেরকে ভয় দেখিয়ে নীরব করে দেওয়ার চেষ্টা করা– এ জিনিসগুলো শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে লাগে না। এটা বুঝতে আমার খুব বেশি সময় লাগতো না যে, আমি যদি এ ধরনের কোনো তদন্তের আদেশ না দিই এবং সেটা যদি দ্রুততার সঙ্গে না দিই, এবং যেটা সুনির্দিষ্ট একজনের ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারি হিসেবে শুরু হয়েছিল, সেটা তবে হয়তোবা এক পর্যায়ে সামগ্রিক বিচারব্যবস্থার জন্য একটা কেলেঙ্কারি হিসেবে বিরাট আকারে দেখা দিতে পারে।

তবে, অবশ্যই সবাই এটাকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। এসব অভিযোগসহ 'মিড ডে' যেদিন প্রকাশিত হলো তার কিছুদিন পরই দিল্লি হাই কোর্ট একটি সুয়োমোটো (স্বপ্রণোদিত) রুল জারি করলো যাতে ওই পত্রিকার সম্পাদক, আবাসিক সম্পাদক, প্রকাশক ও কার্টুনিস্টের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হলো।১৩১৩

আদালত অবমাননার অভিযোগে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০৭-এ তিন মাস পর এই আদালত তাদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। এবং ২১ সেপ্টেম্বর তাদেরকে জেলের হুকুম দিলেন।

'মিড ডে' দৈনিকের অপরাধ কী ছিল? একটি অসাধারণ সৎসাহসের প্রদর্শন? হাই কোর্টের এই আদেশে বিচারপতি সাভারওয়ালের বিরুদ্ধে লেখা 'মিড ডে' পত্রিকার এই অভিযোগগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে একেবারেই কোনো ধরনের মন্তব্য প্রদান করেনি। তার পরিবর্তে প্রায় অস্বাভাবিক কৌশলে এটা প্রতিপন্ন করা হলো যে, 'মিড ডে' পত্রিকার নিবন্ধে প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু ছিলেন সেই সব বিচারকরা, যারা বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন, এবং যারা ইতিপূর্বে বিচারপতি সাভারওয়ালের সঙ্গে বিভিন্ন ডিভিশন বেঞ্চে বসেছেন (সুতরাং, তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের অভিসন্ধি আদালত অবমাননার মতো অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে) :

আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ধরনের আচরণের মাধ্যমে এ সমগ্র ঘটনাটিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, যেন মনে হয় একজন অসৎ-অভিসন্ধিমূলক সদস্যের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নিজেকে অনুমতি দিয়েছিল। এ প্রকাশের যে ধরন ছিল এবং যে পরিস্থিতিতে এটি করা হয়, যেখানে তাদের দেখা মেলে, যদিও সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু তার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এর ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা নষ্ট হতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন ডিভিশনে বসে এবং এর প্রতিটি আদেশই কোনো একটি বেঞ্চের আদেশ। কোনো একটি নেতৃত্ব প্রদানকারী সদস্যের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের ইঙ্গিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সংকেত প্রদান যে অন্য সদস্যগণও প্রকৃতপক্ষে 'পুতুল' ছিলেন, অথবা তারা ছিলেন সেই অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সহযোগীদল।

'মিড ডে' নিবন্ধের কোথাওই অন্য কোনো বিচারককে এত বেশি উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং পত্রিকাটির সাংবাদিকরা এখন এক কষ্টকল্পিত অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। এর অর্থ হলো, এমনকি কতিপয় বিচারপতিও যদি একটি বেঞ্চে কর্মরত থাকেন এবং আপনার কাছে যদি প্রমাণ থাকে যে, তাদের মধ্যে একজনও কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত বিবেচনার দ্বারা এমন কোনো মতামত বা আদেশ দিচ্ছেন,

অথবা মামলাটি এমনভাবে বিচার করছেন, যেখানে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তিস্বার্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে– তবে সেটুকুই যথেষ্ট হবে না। এর জন্য আপনার কাছে এমন প্রমাণ থাকতে হবে যে, ওই বেঞ্চের প্রতিটি সদস্যই দুর্নীতিগ্রস্ত অথবা তাদের সবারই স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এবং তাদের সবাই তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রমাণের সূত্র রেখে দিয়েছেন। বাস্তবতা হলো, এটাও যথেষ্ট নয়। আপনাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, আপনার মামলাটি এমন কিছু না– যা আদালতের ওপরে কোনো প্রকার অভিযোগ হিসেবে দেখা দিতে পারে। (নিখাঁদভাবে, তর্কের খাতিরে প্রশ্ন করছি, যদি একটি বেঞ্চের দুজন বিচারপতি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমাণিত হন, তা হলে আমরা কী করবো?)

তাই আমরা এখন এই আদালত অবমাননা আইনের নতুন চিন্তাধারায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি : আমাদের রয়েছে যেকোনো ধরনের অনাস্থী বিচারকের ওপর কল্পিত-অবমাননাযুক্ত অপরাধের একটি পক্ষপাতিত্বমূলক বিশ্লেষণ। বাহ! আমরা তো দেখছি 'তাইরে-নাইরে (লা-লা) দেশে' আছি।

বেশিরভাগ রাষ্ট্রগুলোতেই আদালত অবমাননা অপরাধের সংজ্ঞাটি শুধুমাত্র সেই সব বিষয়ের প্রতি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে– যেখানে বিচারপ্রক্রিয়াটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অথবা বিচারব্যবস্থাটি নিজেই হুমকির মুখে পড়ে। এই যে 'কেলেঙ্কারি' এবং 'কর্তৃপক্ষকে অবমাননা' করার কাজে আমরা ব্যস্ত– এগুলো খুবই উদ্ভট ধারণা। অন্যদিকে এটি সেন্সরশিপের একটি বিপজ্জনক রূপ এবং আমাদের সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তার প্রতিও এটি এক ধরনের অপমান।

'মিড ডে' পত্রিকার সাংবাদিকরা যে কাহিনি প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীতে অন্যান্য সংবাদপত্রগুলো তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এর ধারবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। এবং বেশ কিছু মানুষ গণবিবৃতি দিয়ে এই কাজকে উৎসাহিত করেছেন। ঘটনা দ্রুতই গড়িয়ে চলছে। বোতলের ছিপি খুলে যাচ্ছে প্রায়, এবং এখনই সেই সময়।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা

ঘাস ফড়িংয়ের শব্দ শোনা যায়

গণহত্যা, অস্বীকৃতি এবং তার উদ্‌যাপন

তুর্কি-আর্মেনিয়াম সংবাদপত্র 'আগোস'-এর সম্পাদক হ্র্যান্ট ডিঙ্ক-এর গুপ্তহত্যার প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৮ জানুয়ারি ২০০৮-এ ইস্তাম্বুলে একটি ভাষণে প্রথম এই প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এ ছাড়াও ভারত থেকে প্রকাশিত 'আউটলুক' ম্যাগাজিনের ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সংখ্যায় এবং 'ইন্টারন্যাশনাল সোসালিস্ট রিভিউ'- ৫৮ ইস্যু, মার্চ-এপ্রিল ২০০৮ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়

হ্র্যান্ট ডিঙ্ক-এর সঙ্গে আমার কখনই সাক্ষাৎ হয়নি। যে সময় আসছে, তার জন্য এটি আমার জন্য একটি দুর্ভাগ্য। তার সম্পর্কে, তিনি যা বলেছেন-লিখেছেন এবং তার জীবনযাপন সম্পর্কে, এখন পর্যন্ত যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে করে আমি যদি বছরখানেক আগে ইস্তাম্বুলে আসতাম, তা হলে আমি সম্ভবত সেই লক্ষাধিক লোকের কাফেলায় শরিক হতাম– যারা শবযাত্রায় তার কফিনের সঙ্গে হেঁটে গিয়েছিল অত্যন্ত গভীর নীরবতার সঙ্গে তুষারশীতল শহরের রাস্তার ভেতর দিয়ে। তাদের ব্যানারে লেখা ছিল– 'আমরা সবাই আর্মেনিয়াম', 'আমরা প্রত্যেকেই হ্র্যান্ট ডিঙ্ক'। সম্ভবত আমার ব্যানারে আমি এ কথা লিখতাম যে, 'পনেরো লাখ মানুষ + ১ জন'।*[১]

মাঝে মধ্যে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি যে, কী ধরনের ভাবনাচিন্তা আমার মগজের ভেতরে খেলে যেত যে সময় আমি তার কফিনের সঙ্গে শবযাত্রায় হেঁটে যেতাম। হয়তোবা আমি শুনতে পেতাম 'আরাকসি বারসামিয়ান' (যিনি আমার বন্ধু ডেভিড বারসামিয়ানের মা)-এর তিরস্কারমূলক কণ্ঠস্বর। তিনি আমাকে একটি কাহিনি শুনিয়েছিলেন, সে সময় তাঁর এবং তাঁর পরিবারে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ১৯১৫ সালে তার বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। তাঁর খুব ভালোই মনে আছে, তাঁদের 'ডাবনি' এলাকা ছিল আর্মেনিয়ামের ঐতিহাসিক 'ডিক্রানাগেট' (বর্তমানে যা 'ডায়ারবাকির' নামে পরিচিত) শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি গ্রাম। ডাবনিতে হঠাৎ করেই ঘাসফড়িংয়ের একটি বিরাট দল এসে উপস্থিত হলো। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কারণ তারা হাড়ে হাড়ে জানতেন, ঘাস ফড়িং হচ্ছে অশুভ ঘটনার পূর্বলক্ষণ। তাদের ধারণা ভুল ছিল না, সেই পূর্বলক্ষণ ভয়ঙ্করভাবে ফলে যেতে কয়েকমাস মাত্র সময় লেগেছিল। সে সময় গমখেতগুলো ভরে উঠেছিল পাকা ফসলে। সেটা ছিল ঘরে ফসল তোলার সময়।

*(*পনেরো লাখ লোকের কথা বলা হলো। এই সংখ্যা হচ্ছে সেই সব আর্মেনিয়ামদের সমষ্টি যাদেরকে অটোমানদের রাজত্বকালে বিশেষ পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়। ১৯১৫ সালের বসন্তকালে আনাতোলিতে এ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এ আর্মেনিয়ামরা প্রধানত সংখ্যালঘু খ্রিস্টান যারা যে সময় ইসলামিক তুর্কির শাসনাধীন এলাকায় বসবাস করতেন। তারা আড়াই হাজারেরও বেশি কাল ধরে আনাতোলিতে বসবাস করতেন।)*

আরাক্সি বারসামিয়ান বললেন, 'আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫ জন।'

তারা আমাদের সব সাধারণ পুরুষদের ধরে নিয়ে যায়... তারা আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার গোলাবারুদ অস্ত্রপাতি কোথায়?' পিতা জানিয়েছিলেন, 'আমি সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছি।' তারা বলল, 'সেগুলো নিয়ে আসো, যাও।' এরপর তিনি সেসব অস্ত্রপাতি ফেরত আনার জন্য যখন 'কুর্দ' শহরে পৌঁছান, তখন তাঁরা তাকে প্রহার করলো এবং তাঁর সব জামা কাপড় খুলে নিল। এটা আমার মা আমাকে জানিয়েছিলেন– তিনি (বাবা) নগ্ন শরীরে আমাদের গ্রামে ফিরে এলেন। তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার দুই হাত কেটে ফেলা হয়, এবং তিনি জেলের ভেতরেই মৃত্যুবরণ করেন। আর সব লোকদের তাঁরা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল, হাত বাঁধা অবস্থায় গুলি করে তাদের প্রত্যেককেই হত্যা করা হয়েছিল।[২]

আরাক্সি, তাঁর মা এবং তাঁর আরো তিনটি ছোট ভাইসহ, তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়। এরপর সবাই ধুকে ধুকে মারা যায়। টিকে থাকেন শুধু তিনি একা। এটা, অবশ্যই, একটিমাত্র ঘটনার বিবরণী, যেটা এমন একটি ইতিহাসের কথা বলে– যা তুর্কি সরকার তো বটেই, অনেক তুর্কি নাগরিকও স্বীকার করতে চায় না।

আজকে আমি এ কারণে আসিনি যে, এখানে আমি একটি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের ভূমিকা পালন করবো, আপনাদের সামনে আমি ভাষণ দেবো, অথবা ১৯১৫ সালে আনাতোলিতে সংঘটিত ঘটনাবলীর ব্যাপারে যে বিশাল নীরবতা অবলম্বন করা হচ্ছে, তাঁর বিরোধিতায় কিছু করার চেষ্টা করবো। এটি এমন একটি কাজ, যেটি হ্রান্ট ডিঙ্ক করার চেষ্টা করেছিলেন এবং জীবন দিয়ে তাঁকে এর মূল্য শোধ করতে হয়েছিল।

আমি যেদিন ইস্তাম্বুলে এসে পৌঁছেছিলাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি শহরের রাজপথ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি যখন আশেপাশের দিকে খেয়াল করছিলাম, তখন একটি সুন্দর রোমাঞ্চকর শহরের অধিবাসী হওয়ার কারণে ইস্তাম্বুলের লোকদের ওপর কিছুটা হিংসাই হচ্ছিল। আমার বন্ধু হঠাৎ করেই ছোট ছোট ছেলেদের দিকে আমার দৃষ্টি নির্দেশ করলো। ছেলেগুলো সবাই সাদা ক্যাপ পরে ছিল, যাদেরকে হঠাৎ করে দেখে শহরের ফুসকুড়ির মতো মনে হচ্ছিল। আমার বন্ধু আমাকে এর ব্যাখ্যা করে বলল যে, এই বাচ্চারা তাদের সংহতি প্রকাশ করছে সেই শিশু গুপ্তহত্যাকারীর প্রতি যে নাকি হ্রান্টকে হত্যা করার সময় একটি সাদা রঙের ক্যাপ পরে ছিল। নিশ্চিতভাবেই গুপ্তহত্যাকাণ্ডটির মাধ্যমে দুটি অর্থ বোঝানো হয়েছিল– এটা হ্রান্টের জন্য এক ধরনের শাস্তি, এবং তা ছিল সে দেশের এ জাতীয় অন্যান্যদের প্রতি

সতর্কবার্তা, যাদের ভেতরে সঞ্চারিত হতে পারে হ্রান্টের সৎসাহস। আর তা হলো, যেটা বলার জন্য নয়– সেটা শুধু নিষেধই নয়, যেটা অচিন্তনীয়– সেটা চিন্তাও করতে পারবে না।

হ্রান্ট ডিঙ্ককে যে বুলেট দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, তার মর্মবাণী এটাই। এবং এই বার্তাই 'অরহান পামুক', 'এলিফ শাফাক' এবং আরো অনেকে মৃত্যু-পরোয়ানার মাধ্যমে পেয়েছিলেন। এই অন্যান্যরা তারা, যারা তুর্কি সরকারের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করার দুঃসাহস দেখান।[৩]

হ্রান্ট ডিঙ্ককে গুপ্তহত্যার পূর্বে তাকে তুরস্কের পেনাল কোডের আর্টিকেল ৩০১-এর অধীনে তিনবার বিচারের মুখোমুখি করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে এই অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি জনসম্মুখে তুরস্কত্ব-কে (টার্কিশনেস) অবমানিত করছেন– যেটি একটি ফৌজদারি অপরাধ। এর প্রতিটির বিচারের চেষ্টাই তুরস্কের সরকারের পক্ষ থেকে দেশটির ডানপন্থী দলগুলোর জন্য এক ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, হ্রান্ট ডিঙ্ক তোমাদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য 'শিকার'। একটি সত্যভাষণ কীভাবে তুরস্কত্ব-কে অবমানিত করতে পারে? তুরস্কত্ব আসলেই কী– সেটাকে নির্ধারণ করার ক্ষমতা বা সেটাকে গণ্ডীবদ্ধ করার ক্ষমতা কাদের রয়েছে?

হ্রান্ট ডিঙ্ককে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা তার এই হত্যাকাণ্ডকে উদ্‌যাপন করছে, তাদের জানা উচিত, তারা যেটা করলেন সেটা তাদের জন্য বরং হিতে বিপরীতই হবে। নীরবতার পরিবর্তে বরং এটাই অনেক বেশি শোরগোল ফেলেছে। হ্রান্টের জন্য যেটা ছিল একটি কণ্ঠ মাত্র, সেটা এখন পরিণত হয়েছে অযুত লোকের তীব্র চিৎকারে– যাকে আর কখনই নিস্তব্ধ করে দেওয়া যাবে না। কোনো বুলেট বা কারাবন্দী করে অথবা অপমান করে সেটাকে আর আটকে রাখা সম্ভব হবে না। এটা এখন চিৎকার করে, ফিসফিসিয়ে, নিজের মতো গুনগুনিয়ে যায় এবং এটি এখন সব উৎকট নীরবতাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলে– যেটা এখন সেনাবাহিনীর মতোই নিজেকে নিজে সঙ্ঘবদ্ধ করতে শুরু করেছে। এই ঘটনার মাধ্যমে ৯০ বছরেরও আগে আনাতোলিতে কী ঘটেছিল সে ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে উৎসুক করে তুলেছে। হ্রান্টের শত্রুরা যে জিনিস চাপা দিতে চেয়েছিলেন সেটার বরং উল্টো পরিণতি হলো। যাই হোক, আমি নিজের কথা বলতে পারি। এ ঘটনায় আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, ১৯১৫ সালে আসলে কী ঘটেছিল সেটা আমার সাধ্য মতো খুঁজে দেখার বাসনা জাগে। এ সংক্রান্ত ইতিহাস পড়া, মানুষের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণাদি শুনে নেওয়া। এ এমন একটি কাজ, যেটা, এমন একটি ঘটনা না ঘটলে আমি সম্ভবত করতাম না। এখন এ বিষয়ে আমার মতামত

আছে। অত্যন্ত সুচিন্তিত মতামত আছে। তবে, আমি আগেই যেটা বলেছি, আমি আজকে আমার মতামত আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে আসিনি।

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সাদা-ক্যাপ পরিহিতিদের সঙ্গে যে যুদ্ধ, সেটা আমার যুদ্ধ নয়, সেটা আপনাদের যুদ্ধ। আমার নিজের দেশের অন্য ধরনের ক্যাপ পরিহিতদের সঙ্গে এবং মতাদর্শদের সঙ্গে আমার নিজস্ব একটি যুদ্ধ আছে। তবে প্রকৃতিগতভাবে এই যুদ্ধগুলো প্রকৃতপক্ষে একটা থেকে আরেকটি ভিন্ন কিছু নয়। একটা অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়ে গেছে, তুরস্কতে যেখানে একদিকে 'নীরবতা' রয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রে সেখানে রয়েছে 'উদ্‌যাপন'। এবং আমি আসলে সত্যিই জানি না– এ দুটোর ভেতরে প্রকৃতপক্ষে কোনটা বেশি খারাপ। আমি অবশ্য মনে করি যে, নীরবতা এক ধরনের লজ্জা বোধের ইঙ্গিত দেয়। আর এ ধরনের লজ্জাবোধ এই ইঙ্গিতও দেয় যে, এটা যে একটি অপরাধমূলক কাজ এ বিষয়ে তাদের একটি সচেতনতা আছে। ব্যাখ্যা কি খুব বেশি সহজ সরল এবং উদার হয়ে গেল? হয়তোবা। তবে একটু উদার, বা একটু সাদাসিধে না হওয়ারই বা কী আছে? দুঃখজনক হলেও সত্য যে, 'উদ্‌যাপন' কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধার ধারে না। 'উদ্‌যাপন' নিজেই বলে দেয় যে এটা আসলে কী।

অতীত থেকে তোমাদের যে শিক্ষামূলক নির্দশনটি রয়েছে, আমাদের ভবিষ্যত কী হতে পারে সে বিষয়ে সেটা আমাকে একটি অন্তর্দৃষ্টি দান করলো। সুতরাং আমার আজকের আলোচ্য বিষয় অতীত নিয়ে নয়, ভবিষ্যত নিয়ে। আমি আলোচনা করবো সেইসব ভিত্তিপ্রস্তর নিয়ে যেগুলো বর্তমান ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার জন্য গাঁথা হচ্ছে। এটি সেই রাষ্ট্র, যাকে বিশ্বব্যাপী সবাই ভূয়সী প্রশংসা করে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের একটি আদর্শ মডেল হিসেবে।

২০০২ সালে গুজরাট রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর একটি গণহত্যা চালানো হয়েছিল। আমি এখানে 'গণহত্যা' শব্দটি সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি। গণহত্যা-অপরাধের প্রতিরোধ এবং শাস্তি সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২-এর অধীনে যে ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই আমি এই 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করছি। গণহত্যাটি শুরু হয়েছিল একটি সামষ্টিক প্রতিশোধ বা শাস্তিপ্রদানের অংশ হিসেব। শাস্তিটা প্রদান করা হয়েছিল একটি অমীমাংসিত অপরাধের কারণে। অপরাধটি ছিল একটি ট্রেনের বগি জ্বালিয়ে দেওয়া– যেখানে ৫৩ জন তীর্থযাত্রী জীবন্ত পুড়ে মারা যায়। একটি অনুমেয় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে প্রকাশ্য দিনের আলোয় সশস্ত্র হত্যাকারীর বিভিন্ন দল-উপদল দুই হাজারেরও বেশি মুসলমানকে জবাই করে। উগ্রবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীর দ্বারা এ অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। এবং গুজরাট

সরকার ও তৎকালীন প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদেরকে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছিল। মুসলমান নারীদের গণধর্ষণ করা হয় এবং জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। মুসলমানদের দোকান, বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও পবিত্র স্থানগুলো অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়। দেড় লাখের বেশি মুসলমানকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়।

এমন কি আজ পর্যন্ত তাদের অনেকেই বিভিন্ন বস্তি বা ঘেটো (শহরের যে এলাকায় সাম্প্রদায়িকভাবে বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষেরা বসবাস করে।) এলাকায়– যার কিছু হয়তোবা তৈরি হয়েছে আবর্জনার স্তূপের ওপরে। সেখানে না আছে পানীয় জল, না আছে পয়ঃনিষ্কাষণের ব্যবস্থা। সেখানকার রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে আলো থাকে না, মানুষগুলোর জন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা থাকে না। সেখানে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো বসবাস করবে। যেন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে তাদেরকে একঘরে করে রাখা হয়েছে।[৪]

ইতিমধ্যে, হত্যাকারীদের, যার ভেতরে পুলিশ যেমন আছে, তেমনি বেসামরিক নাগরিকও আছে, তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে, সাদরে আলিঙ্গন করা হয়েছে, এবং কাউকে কাউকে পদোন্নতিও দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সরকারি কর্মকাণ্ডগুলোকে স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করা হয়। এবং এই স্বাভাবিকতার চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে এই যে, ২০০৪ সালে ভারতের অন্যতম শীর্ষপর্যায়ের শিল্পপতি রতন টাটা এবং মুকেশ আম্বানি যৌথভাবে গুজরাট সরকারের প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, অর্থনৈতিক রাজধানী হওয়ার জন্য এই রাজ্য একটি স্বপ্নময় স্থান হতে পারে।[৫]

শুরুর দিকে জাতীয় সংবাদপত্রগুলোয় যে শোরগোল তোলা হয়েছিল, সেটা এখন একেবারেই হিমঘরে চলে গেছে। হিন্দুত্ব, ভারতীয় ও গুজরাটের চূড়ান্ত অহংকার হিসেবে এই হত্যাকাণ্ডটিকে গুজরাটে অত্যন্ত জমকালোভাবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ ধরনের বিষাক্ত অবস্থা পর পর দুবার সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে রাজ্য সরকারের নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব হয়। যেখানে প্রচারণা চালানো হয়েছিল খুব কৌশলী বাক্যবিন্যাসে– গণতন্ত্র ও আধুনিকতার বিভিন্ন উপাত্তের মাধ্যমে। এ ঘটনার কাণ্ডারি নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের স্থানীয় জনসাধারণের কাছে নায়ক বনে গেছে। আর ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিভিন্ন রাজ্যে প্রচারণা চালানোর জন্য দলের পক্ষ থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

গণহত্যাগুলো এ পর্যন্ত যেভাবে সংঘটিত হয়ে এসেছে– কঙ্গো, রুয়ান্ডা এবং বসনিয়াতে যেভাবে লোক হত্যা করা হয়, যেখানে মৃতের সংখ্যা লাখে ছাড়িয়ে যায়, গুজরাটের হত্যাকাণ্ডটিকে সেগুলোর মতো করে তুলনা করা যাবে না। আবার এটাও বলা যাবে না যে, এটাই ভারতবর্ষে সংঘটিত প্রথম গণহত্যা (উদাহরণ

হিসেবে বলা যায়, ১৯৮৪ সালে দিল্লির রাজপথে কংগ্রেস পার্টির লোকজনদের হাতে তিন হাজারের বেশি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিল।[৮] তবে গুজরাটের গণহত্যাটি ছিল আরো বৃহৎ পরিসরে, আরো বিস্তারিত, এবং অত্যন্ত পদ্ধতিগতভাবে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। এই ঘটনা আমাদেরকে বলে দেয় যে, আসলে গমখেত পেকে আসছে এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডে ঘাস ফড়িংদের আগমন ঘটে গেছে।

এই গণহত্যা করার ব্যাপারটি আসলে অত্যন্ত সুপ্রাচীন একটি মানবীয় অভ্যাস। এটা সভ্যতার অগ্রযাত্রায় অত্যন্ত বিস্ময়কর একটি ভূমিকা রেখেছে। আমরা নথিবদ্ধভাবে সবচেয়ে প্রাচীন যে গণহত্যার কথা জানতে পারি, তা ১৪৯ খ্রিস্টপূর্বে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের শেষে কার্থেজ শহরে ঘটেছিল। 'গণহত্যা' শব্দটিই এই মাত্র সেদিন, ১৯৪৩ সালে রাফায়েল লেমকিন উদ্ভাবন করেন এবং নাৎসীদের দ্বারা ব্যাপক প্রাণহানি ঘটার পরে ১৯৪৮ সালে এ শব্দকে জাতিসংঘ প্রথম গ্রহণ করে। গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনের অধীনে অনুচ্ছেদ ২ নং-এ গণহত্যাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে :

নিম্নোল্লিখিত কর্মকাণ্ডের যে কোনোটি যদি কোনোরূপ ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়, অর্থাৎ– সার্বিক বা আংশিকভাবে, একটি জাতিগত-গোষ্ঠীগত বা বর্ণগত কিংবা ধর্মীয় আদর্শগত সংগঠনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, যেমন :

১) নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষদের হত্যা করা;
২) অথবা, তাদের মানসিক বা শারীরিক অবস্থার গুরুতর ক্ষতিসাধন করা;
৩) অথবা, এই শ্রেণীর মানুষদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে জীবনযাপনের এমন একটি শর্ত বা অবস্থার ভেতরে নিয়ে যাওয়া, যার ফলে অত্যন্ত হিসাবনিকাশ করে তাদের শারীরিক ধ্বংস সাধন করা সম্ভব হয়, সেটা হতে পারে পুরোটা কিংবা আংশিকভাবে;
৪) অথবা, এমন কোনো পদক্ষেপ চাপিয়ে দেওয়া যা এই নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে নতুন শিশুর জন্মকে প্রতিরোধ করে;
৫) অথবা, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিশুদের অন্য গ্রুপে সরিয়ে ফেলা।[৭৭]

যেহেতু রাজনৈতিক মতপার্থক্যজনিত কারণে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে এ সংজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে, তাই জনগণের শত্রু, সেটা বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক হোক,

এ ধরনের হত্যাকাণ্ডগুলোকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর ফলে ইতিহাসের বেশ কিছু গণহত্যাকে এর আওতায় আনা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি 'গণহত্যা' সম্পর্কে দ্য হিস্টরি অ্যান্ড সোশিওলোজি অব জেনোসাইড গ্রন্থের লেখক ফ্রাঙ্ক চক ও কুর্ট জনাশন অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, 'গণহত্যা' এমন একটি রূপ যাতে একপক্ষই শুধু অপরপক্ষকে গণহারে হত্যা করে চলে; এবং এতে দেশ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, অথবা অন্য যেকোনো কর্তৃপক্ষ এ ধরনের একটি শ্রেণীকে নির্মূল করার চেষ্টা করে; এবং এখানে অপর দলটি কে হবে ও কারা তার সদস্য– এসব মূলত সংজ্ঞায়িত করা হয় আক্রমণকারীদের মাধ্যমে।[৮]

'গণহত্যা'র এ সংজ্ঞার ভেতরে যেসব দৃষ্টান্তের কথা বলা যায় তার ভেতরে রয়েছে– ইন্দোনেশিয়াতে সুহার্তো কর্তৃক লাখ লাখ মানুষকে হত্যা, বা কম্বোডিয়ায় পল পট, সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিন, চীনে চেয়ারম্যান মাও কর্তৃক গণহারে মানুষ নিধনযজ্ঞ চালানো হয়। এর সঙ্গে ব্যাপক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এসব বিবেচনায় একটি শব্দ চিন্তা করতে পারি, তা হলো– নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, যা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আমরা ক্ষতিকর কীটপতঙ্গদের চূড়ান্ত পরিণতিসাধনের ব্যাপারে ভেবে থাকি। সম্ভবত এটাই হচ্ছে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শব্দ। যখন এ ধরনের আক্রমণকারীরা তার শিকারকে সামনে পায়, তখন প্রথমেই তার উদ্দেশ্য থাকে যে কোনো ধরনের মানবিক সত্ত্বাকে অস্বীকার করবে। তাকে অবশ্যই তার লক্ষ্যকে বিবেচনা করতে হবে ইতর কোনো সত্ত্বা হিসেবে, যেন তার শিকার একটি জীবাণু বা কীটপতঙ্গ মাত্র– যাকে নির্মূল করাটা সমাজের জন্য একটি কল্যাণকর কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। উদাহরণ হিসেব বলা যায়, জন ম্যাসনের নেতৃত্বে ইংরেজ 'পিউরিটান'রা (শুদ্ধিবাদী) ১৬৩৬ সালে কানেকটিকাটে 'পিকিউ ইন্ডিয়ান'দের ওপর ব্যাপক নিধন চালানো হয়। সেই গণহত্যার যে বিবরণী আছে সেটা নিচে দেওয়া হলো :

তারা, যারা নাকি আগুনের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তলোয়ার দিয়ে তাদের মুণ্ডুচ্ছেদ করা হয়েছিল। কাউকে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছিল, আর কেউ কেউ ছত্রভঙ্গ হয়ে বনের দিকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। খুব কমই পালাতে পেরেছিল। এ সময়ের ভেতরে আনুমানিক চারশ' লোককে ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল। তাদেরকে কড়াইতে ভাজা করা হচ্ছিল। এবং তাদের রক্তের ধারাতেই আগুন আরো তেড়েফুড়ে জ্বলছিল। এটা ছিল একটি ভয়াল দৃশ্য। এই জীবন্ত মানুষ পোড়ানোর দুর্গন্ধও অতি উৎকট ছিল। যদিও 'বিজয়'কে মনে করা হচ্ছিল একটি স্নিগ্ধ আত্মদান।[৯]

আর এখানে, প্রায় চার শতাব্দী পরে, গুজরাট গণহত্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ খলনায়ক বাবু বজরঙ্গি, মাত্র কয়েক মাস আগে 'তেহেলকা' নামে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম তার বক্তব্য ক্যামেরাবন্দী করে :

> আমরা মুসলমানদের একটি দোকানকেও রেহাই দেইনি। আমরা সবকিছুতেই আগুন লাগিয়েছি ... কুপিয়েছি, হত্যা করেছি। তাদেরকে কাবাব বানিয়েছি ... ঝলসিয়েছি। আমরা তাদেরকে আগুনে পোড়াতেই বিশ্বাস করি, কেননা এই বেজন্মাগুলো দাহ হতে চায় না, তারা এই ব্যাপারটাতে বেশ ভালোই ভয় পায় ...।[১০]

এই বাবু বজরঙ্গি যে নরেন্দ্র মোদীর আর্শীবাদপুষ্ট ছিল, এ ব্যাপারে মনে হয় আমার আর কিছুই বলার রইলো না। বজরঙ্গির জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে সুরক্ষা ছিল, আর তার নিজের লোকের পক্ষ থেকে তো ভালোবাসা ছিলই। গুজরাটে এখনও তিনি নিজের মতো করে কাজ করে যাচ্ছেন এবং একজন স্বাধীন মানুষের মতো উন্নতির পথেই এগিয়ে যাচ্ছেন। তবে একটা অপরাধ আছে, যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা যায় না। সেটা হলো, 'গণহত্যার অস্বীকৃতি'।

গণহত্যার অস্বীকারও একটি প্রাচীন বিষয়গত কিছু তীব্র অবস্থার ভিন্ন রূপ। এটা সম্ভবত বিবর্তিত হয়েছে কিছুটা জোড়াতালি দেওয়া দ্বিমুখী নৈতিকতার উত্থানের ভেতর দিয়ে। ১৯ শতকে ইউরোপীয় জাতিগুলো তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে একটু সীমিত পর্যায়ে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং নাগরিক অধিকারগুলোর ধারণাগুলো নিয়ে এগিয়ে আসছিল। একই সময়ে তারা তাদের উপনিবেশগুলোতে লাখ লাখ মানুষকে নির্মূল করে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় জোড়াতালি দেওয়া দ্বিমুখী নৈতিকতার উত্থান এবং 'গণহত্যার অস্বীকার' তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। রাষ্ট্র এবং সরকারগুলো ইতিপূর্বে যেসব গণহত্যা করেছিল, হঠাৎ করেই সেগুলো অস্বীকার করতে শুরু করলো। অর্থাৎ, কার্যক্ষেত্রে অস্বীকৃতি হচ্ছে একধরনের 'কথা বলার' অপরাধ। এটা কর্মমূলক অপরাধ নয়, বক্তব্যমূলক অপরাধ। রবার্ট জে. লিফটন এটাকে এভাবে দেখেন যে, 'অস্বীকৃতি' মানে হচ্ছে এ ধরনের একটি কথা বলা– "হত্যাকারীরা আসলে 'খুনে' নয়, এবং শিকারগুলো আসলে 'নিহত' হয়নি। এ ধরনের অস্বীকৃতির সরাসরি নেতিবাচক দিক হলো, আরো নতুন নতুন হত্যাকাণ্ডকে এটি উদ্বুদ্ধ করে।"[১১]

নিশ্চিতভাবেই, আজকের দিকে যখন গণহত্যার রাজনীতি মুক্তবাজারের সঙ্গে মিলিত হলো, সেক্ষেত্রে একে সরকারিভাবে স্বীকার করা বা অস্বীকৃত জানানো– সেটা হতে পারে কোনো নির্বিচার নিধন– এটা হয়ে দাঁড়াল বহুজাতিক কোম্পানির

ব্যবসাক্ষেত্র। ঐতিহাসিক সত্যতা বা ময়নতদন্তের প্রমাণাদির সঙ্গে খুব কম ক্ষেত্রেই এর সরাসরি কোনো যোগসূত্র থাকে। আর নৈতিকতা তো নিশ্চিতভাবেই এর দৃশ্যপটের ধারেকাছে কোথাও নেই। এটা আসলে খুব আগ্রাসি ধরনের একটি প্রক্রিয়া, যেখানে খুব উচ্চ পর্যায়ের দর কষাকষি চলতে থাকে। এটা জাতিসংঘের চেয়ে বেশি দর কষাকষির ব্যাপার ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের সঙ্গে। এবং এই দরকষাকষিতে কখনো 'মুদ্রা' হিসেবে থাকে আমাদের 'ভূ-রাজনীতি', কখনো থাকে প্রাকৃতিক সম্পদের একটি পরিবর্তনশীল বাজার। কখনো কখনো উদ্ভট ধরনের কিছু বিষয় থাকে, যেটাকে ডাকা হয় 'ভবিষ্যত বাণিজ্য' বা ফিউচার ট্রেডিং হিসেবে ('ফিউচার ট্রেডিং' হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের লেনদেন, যেটা বর্তমান স্টক মার্কেটগুলোতে ঘটে থাকে, যেখানে লেনদেন করার জন্য মূল্যস্থির হয় এই মুহূর্তে, কিন্তু যে জিনিসটি আদানপ্রদান করা হবে, সেটি হাতবদল ভবিষ্যতের কোনো এক সময়)। এ ছাড়া পুরাতন সাদাসিধে অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তিমত্তাও এর চলনশক্তি।

অন্যভাষায় বলতে গেলে, ঠিক যেসব কারণে গণহত্যাটি এগিয়ে নেওয়া হয়, সেই একই কারণে তাকে অস্বীকার করা হয়। যেমন– অর্থনৈতিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, যাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে বর্ণবৈষম্য/ জাতিগত বিদ্বেষ/ ধর্মীয় বিদ্বেষ/ জাতীয়তাবোধের পাথর্ক্যের দ্বারা। স্থূলভাবে বললে, এক ব্যারেল তেলের দাম বাড়বে না কমবে (কিংবা এক টন ইউরেনিয়ামের দাম) কিংবা একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনার অনুমতি দেওয়া হলো কি হলো না, অথবা একটি দেশের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো কি না– এ সব বিষয় মূলত চূড়ান্ত নির্ধারণী উপাদান হিসেবে কাজ করে যে, কখন কোনো একটি সরকার নির্ধারণ করবে যে, 'গণহত্যা' সংঘটিত হয়েছিল কি হয়নি। কিংবা প্রকৃতপক্ষেই আদৌ কোনো গণহত্যা হবে কি হবে না। এবং যদি হয়ে থাকে, তবে এটাকে প্রকাশ করা হবে কি হবে না। এবং যদি প্রকাশ করা হয়, তা হলে সেই প্রতিবেদনটা কীভাবে উপস্থাপন করা হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কঙ্গোতে দশ লাখেরও বেশি নিহত হওয়ার ঘটনাটি বলা যায় একরকম অনুল্লিখিতই থেকে গিয়েছে।[১২]

কেন? ২০০৩-এ ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অনুপ্রবেশের পূর্বে যখন ইরাকের ওপর অবরোধ চলছিল তখন যে লাখ লাখ লোক নিহত হয়েছিল, সেটাকে কি গণহত্যা বলা যাবে? (ইরাকে নিয়োজিত জাতিসংঘের মানবিক সাহায্য সংস্থার একজন সমন্বয়ক ডেনিস হ্যালিডে এটাকে গণহত্যা বলেই অভিহিত করেছিলেন।) অথবা সেই সব হত্যাকাণ্ডগুলো কি গণহত্যার সংজ্ঞায় পড়ার 'যোগ্য', যেমনটি বলেছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের দূত ম্যাডেলিন অলব্রাইট?[১৩]

এটা আসলে নির্ভর করে নিয়মটা তৈরি করছেন কে, তার ওপর। বিল ক্লিনটন? নাকি একজন ইরাকি মা, যে তার সন্তানকে হারিয়েছে?

যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে এ পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এবং সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র, সুতরাং গণহত্যা অস্বীকারের বীজ বপনের ক্ষেত্রেও বিশ্বের এক নম্বরে সে। এটি এখন পর্যন্ত 'কলম্বাস দিবস' উদ্‌যাপন করে যাচ্ছে– এটি সেই দিন– যেদিন ক্রিস্টফার কলম্বাস প্রথম আমেরিকাতে পা রাখেন, এবং দিনটি স্মরণ করে একটি জাতিগোষ্ঠীকে নির্মূল করে দেওয়ার সূচনাকে। মূল ভূখণ্ডে বসবাসকারী ৯০ শতাংশ মানুষ, প্রায় লাখ লাখ 'নেটিভ ইন্ডিয়ান'কে মুছে ফেলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস-এ একটা বিশ্ববিদ্যালয় শহর রয়েছে। এ ছাড়াও আছে বেশ মর্যাদাপূর্ণ লিবারাল আর্টস কলেজ– যার নামকরণ হয়েছে লর্ড আমহার্স্ট-এর নামে, যার মাথায় প্রথম এই অভিসন্ধি এসেছিল যে, এসব 'নেটিভ ইন্ডিয়ান'দের মধ্যে স্মল পক্সের ভাইরাসযুক্ত কম্বল বিতরণ করা হোক।

আমেরিকার দ্বিতীয় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ছিল আফ্রিকাতে, যেখানে প্রায় তিন কোটি আফ্রিকানকে অপহরণ করা হয় এবং ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। যদিও তাদের প্রায় অর্ধেকই পথের ভেতরে মারা যায়। কিন্তু ২০০১ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স এগেনস্ট র‍্যাসিজম' (বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্মেলন)-এ যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিনিধি দল এটি মেনে নিতে না পেরে ওয়াকআউট করেন যে, 'ক্রীতদাস প্রথা ও ক্রীতদাসদের ক্রয়বিক্রয় অপরাধ ছিল'। তাদের মতে, ওই সময়টাতে ক্রীতদাস প্রথা বৈধ ছিল।[১৪]

টোকিও, হিরোসিমা, নাগাসাকি, ড্রেসদেন এবং হামবুর্গে যে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল এবং তাতে যে লাখ লাখ বেসামরিক লোকের মৃত্যু ঘটেছিল, সেটাকে 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া দূরে থাক, যুক্তরাষ্ট্র সেটাকেও 'অপরাধ' হিসেবে মেনে নিতেই অস্বীকৃতি জানিয়েছে। (এখানে এই যুক্তি তুলে ধরা হয় যে, সরকার এখানে বেসামরিক মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এটা করেনি, এটা ছিল 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' বা 'পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতি'। এই ধারণা তখন মাত্রই তৈরি হওয়ার সূচনাকালে ছিল।)[১৫]

১৮৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বৈদেশিক বিজয়-অভিযান চালিয়েছিল মেক্সিকোতে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অসংখ্যবার দেশের বাইরে তার সামরিক হস্তক্ষেপ চালায়। সেটা কখনো খোলামেলাভাবে কখনো গোপনে গোপনে। এর মধ্যে রয়েছে ভিয়েতনামে আগ্রাসী অভিযান, যেটাতে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য ছিল, তাতে ইন্দোচায়নার লাখ লাখ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।[১৬]

এ সব হত্যাকাণ্ডের কোনোটিকেই যুদ্ধাপরাধ বা গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড

হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। রবার্ট ম্যাকনামারা প্রশ্ন রাখেন, 'কতোটা নিকৃষ্ট হলে', যার নিজের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির লেখচিত্রটি ছিল এরকম- ১৯৪৫ সালে টোকিওতে বোমাবাজির পর, যেখানে এক রাতে লাখ খানেক লোকের মৃত্যু হয়, তারপর থেকে তিনি হন ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রধান পরিকল্পনাকারী, এবং তার পরে তিনি উন্নীত হন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে, এবং বর্তমানে তিনি জীবনযাপন করছেন স্বস্তিপূর্ণ দেশের আরামদায়ক চেয়ারে বসে, আয়েশি বাড়িতে, প্রশ্ন রাখেন, 'ভালো কিছুর জন্য আমাদের কতখানি খারাপ কাজ করতে হবে?'[১৭]

রবার্ট জে. লিফটনের একটি মূল বিষয়বস্তু ছিল যে গণহত্যার অস্বীকৃতি আরো নতুন নতুন গণহত্যার আমন্ত্রণ জানায়। গণহত্যা অস্বীকৃতির যথার্থ রূপ প্রকাশ করতে এর চেয়ে সঠিক কথা আর কী হতে পারে?

মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ সংবেদনশীল রাজনীতির মধ্যে তুরস্কের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্কের নজির হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তুরস্কের আর্মেনিয়াম গণহত্যার অস্বীকৃতির ব্যাপারে একমত হয়। এবং একই কারণে ইসরায়েলের সরকারও এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করে।[১৮]

এদের কারণেই আর্মেনিয়ার সাধারণ জনগণ একটি সামষ্টিক দৃষ্টিবিভ্রমের যন্ত্রণায় ভুগছে।

এবং যদি ক্ষতিগ্রস্তরাই আক্রমণকারীতে পরিণত হয়, যেমনটি হয়েছিল কঙ্গো বা রুয়ান্ডাতে, তা হলে কী হবে? ইসরায়েল সম্পর্কে আর কি বলা যেতে পারে, যা মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার ধ্বংসাবশেষের ওপরে-সৃষ্ট। অধিকৃত ভূখণ্ডে তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কী বলা সম্ভব? এর ক্রমবর্ধমাণ বসতি স্থাপন, জলের ওপর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, এর নতুন নিরাপত্তা দেওয়াল- যেটা ফিলিস্তিনি জনগণকে তাদের কৃষিভূমি, কর্মস্থল, আত্মীয়স্বজন, শিশুদের স্কুল, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসুবিধার যেকোনো সুযোগ থেকে পৃথক করে দিয়েছে। এটা যেন একটি 'ফিসবল জেনোসাইড'- কোনো একটি পাত্রের ভেতরে রেখে গণহত্যা করা। এবং এটা হচ্ছে ধীরস্থিরভাবে পরিচালিত হত্যাকাণ্ড- যা গণহত্যা-অপরাধের প্রতিরোধ এবং শাস্তি সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২-এর অধীনে প্রদত্ত সংজ্ঞার যেন অবিকল প্রতিচ্ছবি- এই ধীরগতির গণহত্যা।

সবচেয়ে কুৎসিত দিকটি হলো, আন্তর্জাতিক টেনিস খেলোয়াড়দেরকে যে রকম র‍্যাংকিং করা হয়, এই গণহত্যাগুলোকে যেন তেমনই ক্রমবিন্যাস করা হচ্ছে। এর শিকারীদেরকে শ্রেণীভুক্ত করা হয় কখনো উপযুক্ত এবং কখনো অনুপযুক্ত হিসেবে (অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ও অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে)। উদাহরণ হিসেব বলা যায়, সবচেয়ে বেশি তথ্যসমৃদ্ধ ও তিরস্কৃত যে গণহত্যাটি এ পর্যন্ত আমরা

দেখতে পাই তা হলো– ইহুদি নির্মূল অভিযান– যে গণহত্যায় ৬০ লাখেরও বেশি ইহুদির প্রাণহানি ঘটে। (এ গণহত্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ, চলচ্চিত্র, সাহিত্যকর্ম রচিত হলেও আরেকটি বাস্তবতা খুব কমই উঠে এসেছে যে, নাৎসি বাহিনী ইহুদি ছাড়াও হত্যা করেছে লাখ লাখ জিপসি, কমিউনিস্ট, সমকামী এবং লাখ লাখ রুশ যুদ্ধবন্দীদের– যাদের অনেকেই ইহুদি ছিলেন না।[১৯]) বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা হিসেবে ইহুদি-নির্মূলে নাৎসিদের এই গণহত্যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক আর্মেনিয় গণহত্যাকে বিস্মৃত গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করেন। এবং এ ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে তারা প্রায়ই এই গণহত্যাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম গণহত্যা হিসেবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। আর্মেনিয় গণহত্যার ওপর একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ পিটার বালাকিয়ানের লেখা একটি গ্রন্থ আছে, যার নাম– 'দ্য বার্নিং টাইগ্রিস : দ্য আর্মেনিয়াম জেনোসাইড অ্যান্ড আমেরিকাস রেসপন্স' (বাংলায় – জ্বলন্ত টাইগ্রিস : আর্মেনিয় গণহত্যা এবং এর প্রেক্ষিতে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া)। এ গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'আর্মেনিয় গণহত্যা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এটা ছিল অভূতপূর্ব। গণহত্যা যুগের সূচনা ছিল এটা। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল বিংশ শতাব্দী।'[২০]

তবে এই অধ্যাপক একটি ভুলের মধ্যে রয়েছেন, গণহত্যার যুগ শুরু হয়েছিল আরো বহু বহু কাল আগেই। উদাহারণ হিসেব বলা যায়, জার্মানরা বিংশ শতাব্দী শুরুর মাত্র কয়েক মাস পরেই 'হেরেরোর জনগণ'কে দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকান এলাকা থেকে নির্মূল করে। ১৯০৪ সালের অক্টোবরে জেনারেল অ্যাডোল্‌ফ লেব্রেক ভন ট্রোথা এই নির্দেশ জারি করেন যে, হেরেরোর অধিবাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোক।[২১]

তাদেরকে মরুভূমিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, খাদ্য ও পানীয় জলের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং এ পদ্ধতিতেই তাদেরকে বিলীন করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য অংশগুলোতেও গণহত্যার কাজ বেশ জোরেশোরেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ফরাসি, ব্রিটিশ, বেলজিয়ামরাও এ কাজে ব্যস্ত ছিল। বেলজিয়ামের রাজা লিয়োপল্ড কঙ্গোতে তার একটি 'পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে' ক্রীতদাস, রাবার এবং মণিমুক্তোর খোঁজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন।[২২]

তার এই পরীক্ষা নিরীক্ষার মূল্য ছিল এক কোটি মানব প্রাণ। এটা ছিল যেকোনো কালের বর্বরতম নিষ্ঠুর গণহত্যার একটি। (আফ্রিকার খনিজ সম্পদ

নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল– সেখানে আপনি আফ্রিকা, রুয়ান্ডা, কঙ্গো, নাইজেরিয়া যেকোনো একটি দেশ বেছে নিন এবং সমসাময়িক যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য মোটামুটিভাবে অনুসন্ধান চালান, তবে এর মূল সূত্র আপনার খুঁজে পাওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা থাকবে, যেখানে আপনি দেখতে পাবেন, এর সঙ্গে যোগসূত্র আছে দূর অতীতের ইউরোপীয় উপনিবেশিক আমলের স্বার্থ এবং আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে।)

ব্রিটিশরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে, এশিয়া এবং তাসমানিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ অংশের আদিবাসীদের ওপর নির্মূল অভিযান সম্পূর্ণ করেছিল। তাদেরকে অনাহারে রাখা হতো এবং শিকার করে মারা হতো। ব্রিটিশ সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের প্রতি একজন নেটিভ বা আদিবাসীদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করার জন্য পাঁচ পাউন্ড সম্মানী দেওয়া হতো। ক্রগানিনা নামের সর্বশেষ তাসমানিয়ান মহিলা ১৮৭৬ সালে মারা যান। (তার কঙ্কালটি হোবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। সেখানে কখনো গেলে তাকে একটু দেখে নেবেন।) স্প্যানিস, ফরাসি এবং অবশ্যই ব্রিটিশরা আমেরিকাতে তাদের প্রায় ঐশ্বরিক কর্মকাণ্ড শেষ করে এনেছে।

গণহত্যার এই উন্মাদনার মধ্যে যখন কিছু গোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচারের প্রার্থনা জানানো হয়, অন্যদিকে অপর কিছু গোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা কতই না সহজ। গণহত্যার আন্তর্জাতিক রাজনীতির এটা হচ্ছে সেই নীতিবিবর্জিত নৈতিকতাবোধ। গণহত্যার ভেতরে গণহত্যা, অস্বীকৃতির মধ্যে অস্বীকৃতি। এবং এরকম আরো বহু কিছুই, ম্যাট্রিওস্কার পুতুলগুলোর মতো।

গণহত্যার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, এগুলো মোটেও কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছিল না। এগুলো কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। মানবসভ্যতার বিবর্তনে এটা কোনো অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যাপার নয়। এটা একটি অভ্যাস। অভ্যাসটি যেমন প্রাচীন, তেমনই বিরতিহীনভাবে বহমান। মানবীয় অবস্থার কিছু অংশে ভালবাসা, চিত্রকর্ম কিংবা কৃষি যেমন পুরাতন এই অভ্যাসটিও তেমনই পুরাতন এবং পুনঃপুন ঘটনশীল। পনেরো শতকের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত গণহত্যা কর্মকাণ্ডগুলোর বেশিরভাগই ছিল ইউরোপের অনুসন্ধান অভিযানের একটি অন্তর্গত অংশ। এটি হলো 'লিভিং স্পেস' (কোনো রাষ্ট্রের বিবেচনায় তার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকা)– জার্মানদের মাধ্যমে এটি 'লেবেনস্রাম' শব্দ হিসেবে বিখ্যাত। এই 'লেবেনস্রাম' শব্দ প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত করেন জার্মান ভৌগোলিক ও প্রাণিতত্ত্ববিদ ফ্রেডরিক রাটজেল। তিনি মনে করতেন, মানবজাতির সবার ওপর প্রভাববিস্তারে একটি অভ্যাসগত প্রণোদনা ছিল যে, তারা শুধু স্থানের খোঁজেই সাম্রাজ্য বিস্তার

করবে না, বরং এটা করবে তাদের জীবনধারণের পুষ্টিকর উপাদানের জন্যও। এই যে সম্প্রসারণের প্রণোদনা, প্রাকৃতিকভাবেই এর ক্ষতি সহন করতে হবে তুলনামূলক দুর্বল প্রাণীকুলকে, যেমনটা নাৎসি আদর্শবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে, অধিকতর শক্তিশালী জাতির বিস্তারের জন্য দুর্বলরা অবশ্যই পথ ছেড়ে দেবে, অথবা তাদেরকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হবে।

'লেবেনস্রাম'-এর ধারণাগুলো ১৯০১ সালেই স্ফটিক স্বচ্ছভাবে নির্ধারণ করা হয়। তবে এই 'লেবেনস্রাম' পাবার আকাঙ্ক্ষা ইউরোপে শুরু হয়েছিল আরো চারশ' বছর আগেই, যখন কলম্বাস আমেরিকাতে পা রেখেছিল।

'এক্সটার্মিনেট অল দ্য ব্রুটস' (বাংলায় : সকল অনগ্রসর জাতিকে নির্মূল করে দাও) বইয়ের লেখক ইজভেন লিন্ডকভিস্ট এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, নাৎসি বাহিনীর পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল হিটলারের 'লেবেনস্রাম' অর্জনের প্রচেষ্টা, সেসব এমন জায়গা ছিল– যা ইউরোপের অন্যান্য দেশের দখলে আগেই চলে গেছে।[২৩]

পূর্ব ইউরোপ এবং পশ্চিম রাশিয়ার ইহুদিরা হিটলারের এই ঔপনিবেশিক উচ্চাশার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং, আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের মতো কিংবা আমেরিকা এবং এশিয়ার আদিবাসীদের মতো তাদেরকে হয় দাসত্বে আবদ্ধ করতে হতো, অথবা নির্মূল করতে হতো। সুতরাং লিন্ডকভিস্ট বলেন, নাৎসিদের এই উগ্রবাদী প্রক্রিয়া তাদের মানবীয় সত্তা থেকে উগ্র বর্ণবাদী চিন্তাধারার মাধ্যমে ইহুদিদেরকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত করার যে মানসিকতা, তাকে উন্মাদ শয়তানের মাতলামি হিসেবে এখানেই শেষ করে দেওয়া যায় না।

এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, রাজনৈতিক দলগুলো, যারা অটোমান সাম্রাজ্যকালে আর্মেনিয়দের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল, তাদেরকে অভিহিত করা হতো, 'কমিটি ফর ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস' (বাংলায় : একতা ও সমৃদ্ধির সংঘ)। 'একতা' (বর্ণবাদী/ গোষ্ঠীগত/ ধর্মীয়/ জাতিগত) এবং 'সমৃদ্ধি' (অর্থনৈতিক ডিটারমিনিজম) এই দুটো জিনিসই বহুকাল ধরে গণহত্যার কাজে যমজ বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা পালন করেছে।

ইতিহাসের এই সব অংশ জানার পরে আমাদের পক্ষে কি এটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়া যৌক্তিক হবে যে, একটা দেশ যে নাকি উন্নয়নের চূড়ান্ত মাপকাঠিতে উন্নীত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, সে গণহত্যা সংঘটিত করার জায়গাতেও প্রস্তুত হয়ে আছে? ভারতবর্ষ, যাকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের এক অলৌকিক সত্তা হিসেবে প্রশংসা করে, সে কি তা হলে সম্ভাব্যভাবে গণহত্যা চালানোর প্রান্তদেশে এসে প্রস্তুত হয়ে আছে? আপাতভাবে প্রাথমিক ইঙ্গিতে মনে

হতে পারে এটি খুব বেশি অবাস্তব। এবং এই মুহূর্তে 'গণহত্যা' শব্দের ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই অনভিপ্রেত। তবে যাই হোক, আমরা যদি ভবিষ্যতের দিকে তাকাই এবং উন্নয়নকাজের নেতারা যদি তাদের নিজস্ব প্রচারণার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হয়ে থাকেন, এবং তারা যদি এটা বিশ্বাস করে থাকেন যে, উন্নয়নের জন্য তারা যে পথ পছন্দ করেছেন সেটা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই, তা হলে অনিবার্যভাবেই তাদেরকে হত্যাকাণ্ডে নিয়োজিত হতে হবে। এবং সেই হত্যাকাণ্ড হবে বেশ ব্যাপক মাত্রায়– যেন তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারেন।

যেসব সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, তার প্রতিটি অংশ বিবেচনা করে আপাতদৃষ্টিতে এটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে যে, হত্যাকাণ্ড এবং মৃত্যুবরণ করার প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের কিছুকাল পরেই ১৯৮৯ সালে ভারত তার জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। এবং একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী জোটে যোগদান করে, এবং প্রায়ই এ কথা বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, সে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের স্বাভাবিক মিত্র। (এদের প্রতেক্যের অন্তত একটি জিনিসে মিল আছে– এরা সবাই খোলাখুলিভাবে নব্য উপনিবেশবাদী সামরিক দখলদারিত্বে বিশ্বাসী, এবং এরা সেই দখলদারিত্ব বজায় রেখেছে। ভারত রেখেছে কাশ্মীরে, ইসরায়েল রেখেছে ফিলিস্তিনিতে এবং যুক্তরাষ্ট্র রেখেছে ইরাক ও আফগানিস্তানে।)

ঘড়ির কাঁটা ধরে জাতীয় পর্যায়ে প্রায় দুটি বড় রাজনৈতিক দল বিজেপি ও কংগ্রেস একটি যৌথ কার্যক্রমের ওপরে খুব আস্ফালন করছিল একতা ও উন্নয়নের ভারতীয় সংস্করণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এদের আধুনিককালের আদর্শ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ এবং উন্নয়ন। প্রায় প্রতিটি সময়ই, বিশেষত নির্বাচনকালে তারা পরিচিত কিছু ঝঞ্ঝাট করার চেষ্টা করলেও তাদের অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীগুলোতে (যেমন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি [মার্ক্সিস্ট]) কোনো না কোনোভাবে তাদের প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

একতার প্রকল্পগুলো আমাদের সামনে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরে (হিন্দু ভোটগুলোকে কুক্ষিগত করাই যার মূল উদ্দেশ্য। ভারতের মতো একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ, কোনো সন্দেহ নেই)। আর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত করা। উভয় প্রকল্পের মধ্যেই সম্ভাব্য গণহত্যার উপাদানগুলো গেঁথে আছে।

একত্রীকরণের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত দেওয়া হয়েছে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' (আরএসএস)কে। এটি বিজেপি ও তার সশস্ত্র সংগঠন 'বিশ্ব

হিন্দু পরিষদ' (ভি.এইচ.পি.), 'বজরং দল'সহ প্রতিটি দলেরই নিয়ন্ত্রণকারী আদর্শ প্রতিষ্ঠান। ১৯২৫ সালে আরএসএস গঠন করা হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ড. কে.বি. হেজেওয়ার, যিনি বেনিটো মুসোলিনির একজন ভক্ত ছিলেন, ইতালিয়ান ফ্যাসিজমের অনুকরণে তার পথ তৈরি করলেন। হিটলার, একইভাবে একজন অনুপ্রাণিত করা ব্যক্তিত্ব হিসেবে ছিলেন এবং এখনো আছেন। এখানে এম. এস. গোয়ালকার (যিনি ১৯৪০ সালে ড. হেজেওয়ারের কাছ থেকে আরএসএস-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন) রচিত আরএসএস-এর বাইবেল 'উয়ি, অর, আউয়ার ন্যাশনহুড ডিফাইনড' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো–

> মুসলমানরা যখন হিন্দুস্তানে প্রথম পা রাখলো সেই মন্দ দিনের পর থেকে এমন কি বর্তমান সময় পর্যন্ত এই হিন্দু জাতি বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে এই সব ধ্বংসবাজদের সঙ্গে। এবং তাদের জাতিগত যে সজীবতা সেটিও পুর্নজাগ্রত হচ্ছে।

তারপর:

> হিন্দুদের ভূমি হিন্দুস্তানে শুধুমাত্র 'হিন্দু জাতি'ই থাকবে এবং থাকা দরকার... অন্য সবাই বিশ্বাসঘাতক এবং জাতীয় উৎস থেকে দেশের শত্রু, অথবা আরেকটু উদারভাবে বলি, তারা হচ্ছে সব 'ইডিয়ট' ... বিদেশি যেসব জাতি ভারতবর্ষে আছে ... এ দেশে বসবাস করতে পারে হিন্দুদের কাছে সম্পূর্ণ অধীনস্থ হয়ে; কোনো কিছু দাবি না করে, কোনো অধিকার আশা না করে, যদি থাকতে চায় তো থাকতে পারে। প্রাধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধা বহু দূরের ব্যাপার, এমনকি তারা নাগরিক অধিকারও পেতে পারে না।

এবং আরো বলেছে :

> জার্মানি তার সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষায় পুরো বিশ্বকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। এ কাজে তারা তাদের ভূখণ্ডে আরবীয় জনগোষ্ঠী ইহুদিদের সমূলে বিনাশ করছিল। এটা ছিল জাতিগত গৌরবের চূড়ান্ত প্রকাশ। এবং হিন্দুস্তানে এটাকে কাজে লাগিয়ে ভালো কিছু পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক একটি নিদর্শন।

আপনি কীভাবে সাংগঠনিক হিংসামূলক আচরণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন? ধর্মনিরপেক্ষ ভালোবাসার ফালতু হিতোপদেশ শুনিয়ে অবশ্যই এটা করা সম্ভব নয়।

ভারতজুড়ে ২০০০ সাল নাগাদ আরএসএস-এর ৬০ হাজারের শাখা এবং তাতে ৪০ লাখের বেশি সশস্ত্র সেচ্ছাসেবক ছিল।[২০]

এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা এল.কে. আদভানি এবং নিশ্চিতভাবেই গুজরাটের তিন বারের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এতে আরো আছেন ভারতীয় গণমাধ্যমের বিশিষ্ট সিনিয়র ব্যক্তিরা, পুলিশ, সেনা কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থা, বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক বিভাগের অনেক কর্তাব্যক্তি– যারা আরএসএস-এর মতো মতাদর্শে অদৃশ্যভাবে হিন্দুত্ববাদের একজন ঘনিষ্ট সমর্থক। যারা রাজনীতিবিদদের থেকে ব্যতিক্রম, যারা আসেন আর যান– তারাই আমাদের রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রায় স্থায়ী সদস্য।

তবে আরএসএস-এর মূল ক্ষমতা এই বাস্তবতায় নিহিত আছে যে, এটি প্রায় দশকের পর দশকের কঠোর পরিশ্রম করে সামাজের প্রতিটি স্তরে নেটওয়ার্ক করে ফেলেছে– যা ভারতের কোনো রাজনৈতিক দল বা সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। বিজেপি হচ্ছে এর একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এ ছাড়াও এর আছে একটি ট্রেড ইউনিয়ন শাখা 'ভারতীয় মজদুর সংঘ', নারীদের জন্য শাখা 'রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি', ছাত্রদের জন্য আছে 'অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ' এবং অর্থনৈতিক শাখা 'স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ'।

এর সামনের সারির একটি সংস্থা 'বিদ্যা ভারতী'– যেটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সর্ববৃহৎ শিক্ষা সংগঠন। এ সংস্থার আছে ১৩ হাজারেও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন– 'সরস্বতী বিদ্যামন্দির'। বিদ্যালয়গুলোয় ৭০ হাজার শিক্ষক এবং ১৭ লাখ শিক্ষার্থী। এর আছে আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করার একটি সংগঠন– 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রম'; সাহিত্য বিষয়ক– 'অখিল ভারতী সাহিত্য পরিষদ'; বুদ্ধিজীবীদের– 'প্রাজ্ঞ ভারতী' ও 'দীনদয়াল রিসার্স ইন্সটিটিউট'; ইতিহাসবিদদের– 'ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনালয়'; ভাষার জন্য– 'সংস্কৃত ভারতী'; বস্তিবাসীদের জন্য– 'সেবা ভারতী' ও 'হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠান'; স্বাস্থ্যের জন্য– 'স্বামী বিবেকানন্দ মেডিকেল মিশন' ও 'ন্যাশন্যাল মেডিকোস অরগানাইজেশন'; কুষ্ঠরোগীদের জন্য– 'ভারতীয় কুষ্ঠ নিবারক সংঘ'; সমবায়ের জন্য– 'সখার ভারতী'; সংবাদপত্র প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রপাগাণ্ডা প্রচারের জন্য রয়েছে– 'ভারত প্রকাশন', 'সুরুচি প্রকাশন', 'লোখিত প্রকাশন', 'জ্ঞানগঙ্গা প্রকাশন', 'অর্চনা প্রকাশন', 'ভারতীয় বিচার সাধনা', 'সাধনা পুস্তক' ও 'আকাশবাণী সাধনা'; জাতিপ্রথা অঙ্গীভূতকরণের জন্য– 'সামাজিক সম্রাস্ত মঞ্চ', ধর্ম ও ধর্মান্তরিতকরণের জন্য– 'বিবেকানন্দ কেন্দ্র', 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ', 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ', 'বজরং দল'। এই তালিকা এভাবে চলতেই থাকবে।

১৯৮৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আরএসএস-কে একটি উপহার তুলে দেন। তিনি অযোধ্যার বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিতে বাধ্য হন; আরএসএস যেটাকে প্রভু রামের জন্ম স্থান হিসেব দাবি করে থাকে। ১৯৮৯ সালের ১১ জানুয়ারি বিজেপির একটি ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ সভায় মসজিদটি ধ্বংস ও সেখানে একটি মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব পাশ করা হয়। এই সভার প্রায় পর পরই লালকৃষ্ণ আদভানি বলেন, 'আমাদের এই সভার সিদ্ধান্ত তালিকাটি ভোটে পরিণত হবে।' অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তে তাদের পক্ষে ভোটের জোয়ার আসবে। পরের বছরই তিনি তার 'রথ যাত্রা' শুরু করেন। তিনি সমগ্র ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়ান এবং অনলবর্ষী বক্তৃতার তীর ছুঁড়ে তিনি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দাবি জানান। তিনি যে পথ দিয়ে গমন করেন তার পেছনে ফেলে রাখেন জাতিগত দাঙ্গা আর রক্তপাত। ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ১৯৯১ সালে এই দল ১২০টি আসনে জয়লাভ করে। (১৯৮৪ সালে মাত্র ২টি আসনে জয়লাভ করেছিল)। আদভানির শেখানো উন্মাদনা যখন সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হলো, তখন ১৯৯২ সালে কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতা মসজিদটিকে ধূলিস্যাত করে। ১৯৯৮ সালে বিজেপি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারেই ক্ষমতা দখল করে।

ক্ষমতায় এসে তাদের প্রথম কাজই হয় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ধারাবাহিক পরীক্ষা। দেশজুড়ে ফ্যাসিস্ট, কর্পোরেটস, ধনী বা নির্ধন– সকলেই ভারতের 'হিন্দু বোমা' উদ্‌যাপন করে। এবং মোটামুটি দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল জগতে ঢুকে পড়ে হিন্দুত্ব। ২০০২ সালে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদি সরকার পরিকল্পিতভাবে একটি গণহত্যা চালায়। তার কয়েক মাস পরেই যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে জনসাধারণের ভোটে অত্যন্ত বিস্ময়কর রকমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় সে ক্ষমতায় আসীন হয়। যারা এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের জন্য তিনি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। যেকোনো ধরনের গণহত্যার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো– পরবর্তীতে ক্ষমা বা প্রতিরক্ষা লাভের নিশ্চয়তা। আর গণহত্যার ব্যাপারে দুষ্কৃতকারীদের জন্য এই ধরনের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় ভারতের তো বিশাল ঐতিহ্য রয়েই গিয়েছে। আমি চাইলে এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বড় বড় খণ্ড বই লিখতে পারবো।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণহত্যার পরে এ ধরনের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য আপনাকে 'উপযুক্ত চ্যানেলের ভেতর দিয়ে' এগোতে হবে। এবং এখানে কার্যবিধি সব কিছু। শুরুতেই দেখা যায়, 'পোটা' (প্রিভেনশন অব টেররিজম অ্যাক্ট) আইনের অধীনে যে ২৮৭ জন অভিযুক্ত হয়েছে তাদের ভেতরে ২৮৬ জনই মুসলমান ও ১ জন শিখ সম্প্রদায়ের।[২০]

তাদের জন্য কোনো জামিনের ব্যবস্থা ছিল না। এমন কী বেশ ক'টি হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও যেসব আইনজীবীরা গুজরাট সরকারের পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল– তারা প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্তের পক্ষে বেশ ক'বার দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের অনেকেই আরএসএস বা ভিএইচপি-এর সদস্য এবং অনেকেই বেশ খোলাখুলিভাবেই সেই সব লোকদের প্রতি শত্রুতামূলক বক্তব্য পেশ করতেন– যাদের হয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার কথা। বেঁচে যাওয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় যে, যখন তারা কোনো রিপোর্ট নথিবদ্ধ করার জন্য পুলিশ স্টেশনে যান তখন পুলিশ ভুলভাবে অথবা আক্রমণকারীদের নাম না তুলে তাদের বক্তব্যকে নথিবদ্ধ করে। বেশ কিছু ক্ষেত্রেই বেঁচে যাওয়া লোকগুলো দেখেছেন যে, তাদের কোনো পরিবারের সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে (এবং জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, যাতে মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া না যায়), পুলিশ সাধারণত হত্যাকাণ্ডের কোনো ঘটনা নথিবদ্ধ করতে অস্বীকার করতো।

কংগ্রেসের এহসান জাফরি মোদীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর মতো ভুল করেছিলেন। এ কারণে তাকে দাঙ্গাবাজরা কসাইয়ের মতো কেটে টুকরো টুকেরো করে। (এসব উচ্ছৃঙ্খল জনতা তারই কংগ্রেস দলের সহকর্মী ছিল।) এই নৃশংসতায় অংশ নেওয়া একজন ব্যক্তির নিজের ভাষায়– পাঁচ জন লোক তাকে ধরে রেখেছিল এবং দাঙ্গাবাজদের মধ্যে থেকে কেউ একজন তলোয়ার দিয়ে তার হাত ও পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে ...তারপর তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই... (এবং) টুকরো টুকরো করে ফেলার পরে, আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা কাঠের স্তূপের ওপরে তাকে তুলে দেওয়া হয় এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। যখন দাঙ্গাবাজরা জাফরির ওপর নির্যাতন চালায় এবং আরো প্রায় ৭০ জন লোককে হত্যা করে ও ১২ জন নারীকে গণধর্ষণ করে ও তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে, সেই সব উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাবাজরা যখন মাত্র জমায়েত হচ্ছিল, আহমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার পি.সি. পাণ্ডে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে দয়া পরবশ পরিদর্শন করেছিলেন। মোদি যখন পুনর্নির্বাচিত হয়, পাণ্ডেকে তখন পদোন্নতি দিয়ে গুজরাট পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল বানানো হয়। সমগ্র হত্যাযজ্ঞের সব অনুষঙ্গই যথাস্থলে অক্ষুণ্ন রয়ে যায়।

দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্ট হুমকি দিয়ে কিছু শোরগোল তৈরি করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব কিছু হিমাগারেই চলে যায়। কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট দলও অনেক শোরগোল তুললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

গুজরাট গণহত্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ খলনায়ক বাবু বজরঙ্গি মাত্র কয়েক মাস আগে 'তেহেলকা' নামে ভারতীয় একটি সংবাদ টেলিভিশন চ্যানেলে মৌচাকে

ঢিল জাতীয় একটি অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য ক্যামেরাবন্দী করেন। অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনের 'প্রাইম টাইমে' সম্প্রচার করা হতো। এ অনুষ্ঠানে বাবু বজরঙ্গি ছাড়াও তাদের অসংখ্য স্মৃতিচারণ করে– কীভাবে এই গণহত্যাটি পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচালিত করা হয়েছে। কীভাবে মোদি ও অন্যান্য প্রবীণ রাজনীতিক এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। এই তথ্যগুলোর কোনোটিই নতুন নয়। তবে অবশেষে এই খুনে কসাইরা নিউজ চ্যানেলগুলোতেই উপস্থিত হলো। তারা যে শুধু স্বীকারোক্তি প্রদান করলো তাই নয়, তাদের অপরাধের ব্যাপারে আস্ফালন করলো এবং অনুষ্ঠানটির প্রতি দর্শকদের হতবুদ্ধিকর প্রতিক্রিয়ার ভেতরে কোনো রাগ বা ক্ষোভ ছিল না। বরং সন্দেহ ছিল এর সময়কাল নিয়ে। বেশির ভাগ মানুষই বিশ্বাস করতো, যে এই ঘটনা এভাবে জানানোর মাধ্যমে মোদীকে পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করতে হয়তো সাহায্য করতে পারে। এমন কি তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটাও বিশ্বাস করতো যে, এই অনুষ্ঠান মোদীর ইচ্ছায় কৌশলগতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। এবং তিনি সত্যিসত্যি নির্বাচনে জয় লাভ করেন। এ সময়ে একতা এবং উন্নয়নের দুই মূলসূত্রই ছিল তার নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার টিকেট। এটা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কমিটি ছিল। এ সময় বিজেপির হাজার হাজার সমর্থক নরেন্দ্র মোদীর প্লাস্টিক মুখোশ পরে মিছিলে অংশগ্রহণ করতো এবং খুন ও ধ্বংসের শ্লোগানে পথঘাট মুখরিত করে তুলতো। ফ্যাসিবাদী গণতান্ত্রিক লোকজন শারীরিকভাবেই অভিযোজিত হয়ে গিয়েছিল লাখ লাখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্যাসিবাদে। এবং গণতন্ত্রের আনন্দই এটা। (জার্মানিতে নাৎসি বাহিনীর কার সাহস ছিল হিটলারের মুখোশ পরার?) বিজেপি-শাসিত অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও গুজরাটের নীল নকশাটি পুনরায় বাস্তবের মঞ্চে নামানোর প্রচেষ্টা রয়েছে; যেমন– ওড়িশা, ছত্তীশগঢ়, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ও কর্ণাটকের মতো অঞ্চলে।

আর্মেনিয় গণহত্যা বিশেষজ্ঞ পিটার বালাকিয়ান বলেন, 'গণহত্যার মতো অপরাধ করার পূর্বে আপনাকে অবশ্যই এই নির্দিষ্ট একটি উপগোষ্ঠীকে দীর্ঘদিনের জন্য অনগ্রসর প্রান্তিক মানুষে পরিণত করতে হবে।' পিটারের এই শর্ত ভারতে খুব ভালোভাবে পূরণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের পদ্ধতিগতভাবেই অনগ্রসর গোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে এবং তাদেরকে এখন আদিবাসী বা দলিতদের পর্যায়ে ফেলা যায়। বর্ণহিন্দু সমাজের মাধ্যমে এদেরকে শুধু প্রান্তিক করা হয়নি বরং মানবসত্তা থেকেও তাদেরকে অবনমিত করা হয়েছে। (এমন একটি সময় ছিল যখন মানবসত্তা থেকে তাদেরকে অবনমিত করা হতো। যে সব কাজ করতে বর্ণ হিন্দুরা অপছন্দ করতো সে সব কাজ তাদের থেকে আদায় করে

নেওয়া হতো। এখনকার দিনে বিজ্ঞান প্রকৌশলের উন্নতির কারণে মানুষের কায়িক শ্রমও অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।) আরএসএস মুসলমানদের বিরুদ্ধে দলিতদের এবং দলিতদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের লেলিয়ে দেয়– যেন সে তার আরো বৃহত্তর স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে। একদিকে যেমন জনগণকে একতার একটি মঞ্চে নিয়ে আসার কাজে ব্যস্ত রাখা হয়েছে, অন্যদিকে 'ভারতের উন্নয়নের' যে লক্ষ্যমাত্রা– যা ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির মূল মন্ত্র– সেটাও একই গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। উদারিকীকরণ এবং বেসরকারীকরণের যে নতুন যুগ শুরু হয়েছে, সেটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভৌত অবকাঠামোকে ব্যক্তিখাতে বিক্রি করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এটি অকল্পনীয় ধনী উচ্চশ্রেণী ও ক্রমবর্ধমান একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি করছে যারা খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন ধরনের বণ্টনের সশস্ত্র যোদ্ধা।

উন্নয়নের এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে হঠকারী ও ছলচাতুরির একটি নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে, যা 'একতা প্রকল্পের' বিশদ কার্যপদ্ধতির চেয়ে কম লোমহর্ষক নয়। সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানসমূহ এর মিথ্যাচারিতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। যেমন সুপ্রিম কোর্ট, যেটা খুব দ্রুততার সঙ্গেই কর্পোরেট শক্তিকেন্দ্রের প্রধান স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে। এই কোর্ট একটির পর একটি আদেশ জারি করে বাঁধ নির্মাণ বা আন্তঃনদী সংযোগসাধন কিংবা খনি থেকে নির্বিচারে সম্পদ আহরণ, অথবা বন বা প্রাকৃতিক জলচক্র ধ্বংস-সাধনের মতো কর্মকাণ্ডকে অনুমোদন দিচ্ছে। এ ধরনের সকল কর্মকাণ্ডকে বলা যায় 'ইকোসাইড' (সুবিস্তৃতভাবে প্রাকৃতিক অবকাঠামোর ধ্বংসযজ্ঞ)– যা সম্ভাব্য গণহত্যার পূর্বশর্ত। (এবং আদালতের সমালোচনা করাটা একটি ফৌজদারি অপরাধ, এর শাস্তি হিসেবে কারাবাস রয়েছে)।

হাস্যকর এই যে, মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে ভারতে এ যাবৎ সংঘটিত সবচেয়ে সফল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে নিয়ে এসেছে। একটি দেশের নিজের মধ্য এবং উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শ্রেণী সংগ্রাম এমন একটি জায়গা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে যেটা হয়তোবা আরো ওপরে, হয়তো বায়ুমণ্ডলের ওপরে অন্তর-আকাশে (স্ট্রাটোস্ফিয়ার), যেখানে হয়তাবা বিশ্বের সব অভিজাত ব্যক্তির স্বার্থই একীভূত হয়ে গেছে। শূন্য নভোমণ্ডলে এই যে রাজত্ব, এটি নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ব– যাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকে একটি সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য পর্দা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। এ বিশ্বের রয়েছে নিজস্ব সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, রয়েছে টেলিভিশন অনুষ্ঠানসূচী, এবং রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব মানদণ্ডের নাটক, নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা দোকানপাট এবং নিজস্ব বুদ্ধিজীবী

শ্রেণী। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে তাদের এ জগৎ পুরোপুরি আনন্দময়, তবে আপনি ভুল করবেন। এর নিজেরও রয়েছে বিভিন্ন করুণা উদ্রেককারী ঘটনা। এর হয়েছে নিজস্ব পরিবেশগত সমস্যা (যেমন– গাড়ি পার্ক করে রাখার সমস্যা, অথবা নগরের বাতাস দূষিত হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা), এর নিজস্ব শ্রেণী সংগ্রাম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'ইয়ুথ ফর ইকুয়ালিটি' নামে একটি সংগঠন আছে। তারা একটি সমস্যাকে উপরে তুলে ধরেছে, সেটা হলো– সংরক্ষণ সমস্যা। অর্থাৎ, কোনো স্থান নিজেদের নামে বুকিং দেওয়ার সমস্যা (একটি ইতিবাচক আচরণ), কারণ এটি মনে করে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কারণে উচ্চবর্ণরা নির্বিবাদে অসম্মনিত হচ্ছে। ভারতে এই সমাজের রয়েছে নিজস্ব কিছু গণঅন্দোলন। রয়েছে মোমবাতি নিশিপালন ('জেসিকার জন্য ন্যায়বিচার'–এই দাবিতে। জেসিকা একজন মডেল, যাকে একটি সরাইখানা বা 'বার'-এ গুলি করে হত্যা করা হয়) এবং এদের নিজেদের জন্য রয়েছে গণগাড়ি (টাটা গ্রুপ সাম্প্রতিককালে 'সাধারণ মানুষের জন্য একটি গাড়ি' নামে এই প্রোগাম চালু করেছে)। এমন কি এর রয়েছে নিজস্ব স্বপ্ন যেটা নাকি টিভি বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়, যেখানে ভারতের নির্বাহী প্রধানরা (যারা 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি' মেখে মুখ চকচকে করে) আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলো কিনতে থাকে। এমন কি বর্তমানে কাল্পনিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকেও যারা কিনে নেয়। তারা গল্প করে তাদের খুব ব্যয়বহুল নিত্যনতুন অফিস নিয়ে, যেখানে হীনমন্যতাপূর্ণ তোষামোদকারী শাদা মহিলাদের দেখা যায় (যাদেরকে দেখলে মনে হয় যেন তারা হা-পিত্যেশ করে অপেক্ষা করছে কখন তাদেরকে নিয়ে শোয়া হবে, যা তাদের বিজয়ের চূড়ান্ত উপহার) এবং প্রশংসনীয় শ্বেতাঙ্গ মানুষ যারা হয়তোবা একটি নতুন রাজত্ব জয়ের অপেক্ষায় রয়েছে। এরই মধ্যে স্টেডিয়ামে মানুষেরা (তাদের পকেটে রয়েছে ক্রেডিট কার্ড) তুমুল উত্তেজনায় চিৎকার করছে 'ভারত! ভারত!'

কিন্তু এখানে একটি সমস্যা রয়ে গেছে, তা হলো– 'লেবেনস্রাম' (জার্মান এ শব্দের অর্থ 'লিভিং স্পেস'। অর্থাৎ, এটা হলো কোনো রাষ্ট্রের বিবেচনায় তার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকা)। একটি রাজত্বের জন্য দরকার একটি 'লেবেনস্রাম'। একটি রাজ্য, যার অবস্থান আকাশে, সে কীভাবে 'লেবেনস্রাম' খুঁজে পাবে? এই নভো-নাগরিকরা এটা পেতে পুরাতন জাতিগুলোর দিকে তাকায়। তারা দেখে আদিবাসীরা ওড়িশার বক্সাইটের স্তূপের ওপর বসে আছে, কিংবা ঝাড়খন্ড বা ছত্তীশগঢ় লোহার খনির ওপর বসে আছে। তারা দেখে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামের (মুসলিম ও দলিত) লোকজন বসে আছে একটি গুরত্বপূর্ণ জমিতে– যেটা একটি

কেমিকেল হাব হওয়া উচিত ছিল।[২৬]

তারা দেখে হাজার হাজার একর কৃষি ভূমি এবং চিন্তা করে, এগুলো আসলে আমাদের শিল্প কারখানার জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল হওয়া উচিত ছিল। সিঙ্গুরের উর্বর ভূমির দিকেও তাদের নজর পড়ে। তাদের দেখাল, এখানে টাটা কোম্পানির একটি ন্যানো গাড়ির (যাকে জনগণের গাড়ি বলা হয়) কারখানা হওয়াই উচিত। তারা মনে করে : এগুলো তো আমাদের বক্সাইট, আমাদের লৌহখনি, আমাদের ইউরেনিয়াম। তা হলে এই সব লোকজন আমাদের ভূখণ্ডের ওপর বসে আছে কেন? আমাদের জল কি কাজে ওদের নদীর ভেতরে পড়ে আছে? আমাদের আসবাবপত্রের কাঠগুলো ওদের গাছের ভেতরে থেকে কী করছে?

আপনি যদি ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকান; এর বনাঞ্চল, খনিজসম্পদ ও আদিবাসীদের ভূমির দিকে মনোযোগ দেন, আপনি দেখতে পাবেন– এরা যেন একটার ওপর আরেকটি মিলেমিশে আছে। সুতরাং বাস্তবতা হলো, যাদেরকে আমরা গরীব বলে মনে করি, সত্যিকার অর্থে তারাই প্রকৃত ধনবান। কিন্তু এই আকাশ সংস্কৃতির নাগরিকরা যখন এসব ভূখণ্ডের প্রতি নজর দেয় তখন তারা শুধু দেখে কতগুলো উড়ে এসে জুড়ে বসা লোকজন তাদের অত্যন্ত অমূল্য সম্পদের ওপর বসে আছে। নাৎসি বাহিনীর কাছে এ ধরনের লোকদের একটি বিশেষ নাম ছিল– উবারজাহলিজেন এর্সান, অর্থাৎ– মাত্রাতিরিক্ত খাদক।

উত্তর আমেরিকাতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি এবং সেখানকার স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যে সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে জার্মান ভৌগোলিক ও প্রাণিতত্ত্ববিদ ফ্রেডরিক রাটজেল বলেন, 'লেবেনস্রাম'-এর জন্য যে সংগ্রাম– তা আসলে একজনকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার সংগ্রাম।[২৭]

এই নির্মূল করে দেওয়া মানে এই বোঝায় না যে, কিছু মানুষকে শারীরিকভাবে নির্মূল করে দেওয়া হত্যাকাণ্ড– পুড়িয়ে বা খুঁচিয়ে মারা, গ্যাসচেম্বারে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা, গুলি করে বা বোমা ফেলে হত্যা করা। (কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকল্প আছে। বিশেষ করে তখন, যখন নাকি তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়, কেননা সে সময় তারা সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত হয়।) ঐতিহাসিকভাবে, গণহত্যার সবচেয়ে দক্ষ রূপটি ছিল– জনগণকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে স্থানচ্যুত করে দাও, তাদেরকে মেষপালের মতো এক জায়গায় জড়ো করো এবং তাড়িয়ে নিয়ে যাও ও খাদ্য ও পানীয় সংস্থানের সব ব্যবস্থা বন্ধ করে দাও। এই উপায়ে সুস্পষ্ট কোনো সহিংস ঘটনা ছাড়াই তাদের মৃত্যু ঘটে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বেশি সংখ্যায় মারা যায়। ইজভেন লিন্ডকভিস্ট

('এক্সটার্মিনেট অল দ্য ব্রুটস' বইয়ের লেখক) বলেন, 'নাৎসিরা ইহুদিদের কোর্টের ওপর একটি তারকাখচিত ব্যাচ লাগিয়ে দিয়েছিল, এবং তাদেরকে এক জায়গায় জমায়েত করে 'সংরক্ষিত' করেছিল।' তিনি বলেন, ''ইন্ডিয়ান', 'হেরেরোস', 'বুশমেন', 'অ্যামানডেবেল'-এদের মতোই ওই তারকাখচিত লোকদের বাকি বাচ্চাদের এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল। এর পর তাদের খাদ্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিলে তারা একা একাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ঐতিহাসিক মাইক ডেভিস লিখেছেন, ১৮৭৬ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ভারতে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার ফলে এক কোটি ২২ লাখ থেকে দুই কোটি ৯৩ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। এ সময়ে ব্রিটেন ঠিকই ভারত থেকে প্রচুর খাদ্য ও খাদ্যজাত কাঁচামাল নিজের দেশে অব্যাহভাবে রফতানি করে।[২৮]

অমর্ত্য সেন যেরকমটি বলে থাকেন, একটি গণতান্ত্রিক কার্যপ্রণালীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া অঘটনীয় ব্যাপার। কিন্তু চীনের মহা দুর্ভিক্ষের পরিবর্তে ভারতে রয়েছে মহা অপুষ্টি। (সারা বিশ্বে অপুষ্টির শিকার শিশুর এক-তৃতীয়াংশই ভারতে বসবাস করে।)[২৯]

চীন সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান ভারতে সর্ববৃহৎ সংখ্যক অধিবাসীকে অভ্যন্তরীণভাবেই স্থানচ্যুত করা হয়েছে। বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণের ফলে তিন কোটির বেশি মানুষকে বাস্তুহারা করেছে।[৩০]

এবং অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের বাস্তুহারার ঘটনা কার্যকর করা হচ্ছে আদালতের আদেশের মাধ্যমে অথবা পুলিশ বাহিনীর অস্ত্রের মুখে, কিংবা সরকার সমর্থিত সশস্ত্র লোকদের মাধ্যমে, নয়তো কর্পোরেট দস্যুদের মাধ্যমে (নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে, এমন কী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরও [মার্ক্সবাদী] এমন একটি সশস্ত্র দল রয়েছে)। এ ধরনের স্থানচ্যুত লোকজনদের কোনো একটি আশ্রয়স্থলে পালের মতো একত্রিত করা হয়। এসব আশ্রয় ক্যাম্পে বা বস্তি কলোনিতে তাদের ন্যূনতম জীবিকা অর্জনের দৈনন্দিন উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে তারা আরো বেশি দারিদ্রের জালে আটকে যায়।

ছত্তীশগঢ় রাজ্যের ক্ষেত্রে, যেখানে লৌহের খনিজসম্পদের কারণে কর্পোরেট সংস্থাগুলো শিকার হিসেবে তাদের লক্ষ্যস্থল ঠিক করেছে। এখানে একটি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। মাওবাদী বিদ্রোহীদের দমন করার নামে এখানে শত শত গ্রামবাসীদেরকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিতাড়িত করা হয়, এবং প্রায় ৪০ হাজার গ্রামবাসী লোকদের বিভিন্ন পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের কাউকে কাউকে সরকার অস্ত্র দিয়ে 'সালওয়া জুদুম' নামে একটি সংগঠন, যেটির উদ্দেশ্যগতভাবে মূল কাজ ছিল মাওবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এটি

ছত্তীশগঢ়ের রাজ্য বিজেপি সরকার অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে পরিচালিত করছে। এটা হচ্ছে, সরকারের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা দুষ্ট-জনগণের একটা রক্ষিবাহিনী। জুদুম এবং সরকার যৌথভাবে এমন একটি মৈত্রী জোট গঠন করেছে যারা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে বনের ভেতরেই এমন একটি ভীতিকর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা পৌঁছে গেছে অমানবিক পর্যায়ে।[৩১]

ফলে একদিকে যেমন গরীব লোকই গরীবের বিরুদ্ধে এমন একটি অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করছে। এটি এক পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় 'টাটা' এবং 'এসার গ্রুপ' নামে দুই শিল্পগোষ্ঠী খুব নীরবে নিভৃতে এই খনিজ সম্পদের ওপরে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা ও দেনদরবার চালিয়ে যাচ্ছিল। (আমরাই কি এদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারি? আমরা হয়তো এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি– 'সালওয়া জুদুম' নামের সংগঠনটির অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয় মাত্রই টাটা গ্রুপ ও রাজ্য সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরের দিনই।[৩২])

এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, এ ধরনের ঘটনার বিবরণে চলতি মার্কেটের দৃশ্যপটে তৈরি ভারতবর্ষের নতুন সংস্করণকে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। এর কারণ হিসেবে আমরা অস্বীকৃতির আরেকটি রূপ দেখতে পাই– যেটাকে রবার্ট জে. লিফটন 'প্রতারণাপূর্ণ বিশ্ব' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই বিশ্বে পদ্ধতিগতভাবে 'আতঙ্ক'কে রূপান্তর করে সাময়িক কিছু 'সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি'তে পরিণত করা হয়েছে।[৩৩]

আমাদের সামনে প্রকৃত বিশ্বের পরিবর্তে আরেকটু বেশি 'ভারসাম্যপূর্ণ' এবং অধিকতর সুখী একটি বিশ্বকে উপস্থাপন করাটাকে এর জন্য দোষারোপ করা হয়। এখানে যে 'ভারসাম্যের' কথা বলা হয়েছে– তা বেশ সন্দেহযুক্ত। এটা করতে গিয়ে একতা এবং উন্নয়নকে একে-অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। যেমন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য বহু লোকের জীবনযাত্রার যে অবনতি ঘটে সেটাকে 'বৈধতা' দেয়া হয় ঐক্যসাধন প্রকল্পগুলোয় যেসব উদারমনা ধর্মনিরপেক্ষ সমালোচক আছে– তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে। এই শৃঙ্খলার শীর্ষে যাদের অবস্থান, তারাই সম্ভবত এই 'প্রতারণাশীল বিশ্বের' উদ্ভাবক। তাদের মূল কাজ হচ্ছে, সীমান্ত কে পাহারার মধ্যে রাখা, যেকোনো ধরনের বিক্ষোভকে স্তিমিত করে দেওয়া, যে কোনো উষ্মাকে অন্যায় হিসেবে সাব্যস্ত করা এবং যেকোনো ধরনের যুদ্ধবিরতির জন্য দেনদরবার করা।

বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের (যার রয়েছে কোটি কোটি ভক্ত) প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করুন। তাকে নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে

তিনি বলেন, 'আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তাই তার সম্পর্কে আমার কোনো মতামত নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি তিনি কখনো সদয়হীন আচরণ করেননি।'[৩৪]

একজন সংস্কারমুক্ত ইতিহাসবিদ– রাজচন্দ্র গুহ, যিনি 'নিউ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, 'ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী: দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'স লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি' নামে তার নতুন বইতে তিনি বিজেপি সরকারের জামানাকে (২০০২ সালের গণহত্যার সময় গুজরাট এবং কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার সময়) এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'ফ্যাসিস্টরা তাদের ক্ষমতাকে অতিমূল্যায়ন করে থাকে এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যগুলো, যেগুলোর সঙ্গে ভারতের জনগণ অভ্যস্ত– তাকে অবমূল্যায়িত করে থাকে।' তার এ বক্তব্যের সারমর্ম আমরা নিই তা হলে গুহ আমাদেরকে এটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি জোটকে কেন্দ্র থেকে ভোটের মাধ্যমে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তিনি প্রশ্ন করেন, 'শেষ কবে একটি ফ্যাসিস্ট' সরকারের আমলে এরকম ন্যায়নিষ্ঠভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা ঘটেছিল?' তিনি এটা উল্লেখ করেননি যে, গুজরাটের রাজ্য সরকারের নির্বাচনটি গণহত্যার (গুহ যাকে 'গুজরাট-দাঙ্গা' বলে অভিহিত করেছেন) পর পরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসীন হয়, এমন কি তার পাঁচ বছর পরে তৃতীয় বারের মতো। এবং গুজরাটে এ পর্যন্ত ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব হয়নি। সেটি ন্যায়নিষ্ঠভাবেই হোক, কিংবা অন্য কোনোভাবে।[৩৫]

জাতীয় 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংবাদমাধ্যমে এসব সম্পাদক ও ধারাভাষ্যকর গুজরাট গণহত্যার চরম নিষ্ঠুর কাণ্ড ভুলে গিয়ে এখন নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক দক্ষতাতে মুগ্ধ হচ্ছেন। হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার সম্পাদক বলেন, 'মোদী হয়তোবা একজন গণহত্যাকারী, তবে তিনি হচ্ছেন আমাদের গণহত্যাকারী', তিনি তার এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ করেন– কীভাবে একজন গণহত্যাকারীর সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা উচিত যখন নাকি তিনি একজন 'ভালো' মুখ্যমন্ত্রীও।[৩৬]

এই ধরনের 'প্রতারণামূলক ভারতীয় সংস্করণ' আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রয়েছে। এটার দেখা মেলে বলিউডের নতুন নুতন চলচ্চিত্রের ভেতরে, দ্রুত বিস্তারময় ভারত-ইঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে। এ সব ক্ষেত্রে গরীব জনগোষ্ঠাকে প্রায় সর্বাংশেই অনুপস্থিত দেখা যায়। তাদেরকে আগেভাগেই মুছে ফেলা হয়েছে (কখনো কখনো তাদের দেখা মেলে একজন হাস্যরত ক্ষুদ্রঋণের সুবিধাভোগী হিসেবে, অথবা কোনো এনজিও পরিচালিত কোনো দাতব্য প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে।)

গত গ্রীষ্মে আমি ঘটনাক্রমে একটি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম যেখানে চারটে সুন্দরী মেয়ে– পার্লার থেকে যাদের চুল দীঘল সোজা করে নেওয়া, ত্বক মসলিনের মতো চকচকে করে নেওয়া– সেখানে এক সঙ্গে বসে গল্প করছিল এবং যার যার পোষা কুকুরের বাচ্চা একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। তাদের একজন হঠাৎ আমার দিকে ঘুরলো এবং বললো, "এই ছুটিতে আমি আমার পরিবারের সঙ্গে ছিলাম। সে সময় আমি বাঁধ ও এইজাতীয় বিষয় নিয়ে তোমার একটি লেখা দেখছিলাম। আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে, সে কি জানে এই সব দলিত ও আদিবাসীরা কী ভয়ানক খারাপ সময় অতিবাহিত করছে, বিশেষ করে এসব ঘটনার কারণে ভূমিহীন হয়ে যাওয়ার পরে?... মানে, আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে, তাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে যে লাথি দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে বা এই ধরনের যে অন্যান্য যেসব ঘটনা ঘটছে এ বিষয়ে। এবং তুমি জানো, আমার ভাই এমন নির্বোধ যে, সে আমাকে বলল যে, 'এইসব লোকজন হলো তারা যারা ভারতকে পেছনে টেনে ধরে রেখেছে। ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত।' তুমি চিন্তা করতে পারো?"

সমস্যাটা হলো– আমি চিন্তা করতে পারি। বস্তুত আমি এটাই চিন্তা করি।

কুকুরের এই বাচ্চাগুলো বেশ মিষ্টি দেখতে। আমি খুব অবাক হচ্ছিলাম যে, কুকুররা কখনো একে-অন্যকে নির্মূল করার কথা চিন্তা করে কিনা। সম্ভবত কুকুররা যথেষ্ট উন্নয়নমনস্ক নয়।

সেই দিন সন্ধ্যায় আমি টেলিভিশনে অমিতাভ বচ্চনের (আরেকজন বলিউড সুপারস্টার, যার রয়েছে কোটি কোটি ভক্ত) একটি অনুষ্ঠান দেখছিলাম। সেখানে টাইমস অব ইন্ডিয়ার একটি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান চলছিল যার নাম 'ইন্ডিয়া পয়জ্‌ড' (বাংলায় : প্রস্তুত ভারত)। টিভি উপস্থাপক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এ কথা জানান যে, 'জনগণকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এটা প্রচার করা হচ্ছে, যেন তারা তাদের অলঙ্ঘনীয় অতীত দৈত্যকে পেছনে ফেলে আসতে পারে; যেন তারা হতাশাবাদের পরিবর্তে আশাবাদে জেগে ওঠেন। অমিতাভ বচ্চন তার বিখ্যাত কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন–

আমাদের এ দেশে দুটি ভারতবর্ষ রয়েছে। বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 'একটি ভারত' টানটান অবস্থায় রয়েছে। উদগ্রীব হয়ে আছে সম্মুখপানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। এবং যেখানে মানুষরা জীবনধারণ করে সেই সব বিশেষণ নিয়ে– যেগুলো দিয়ে সমগ্র বিশ্ব আমাদেরকে এখন অলঙ্কৃত করছে। আর 'অপর ভারত' হলো সেই 'বন্ধন'।

'একটি ভারত' বলছে, "আমাকে একটি সুযোগ দাও, নিজেকে আমি প্রমাণ

করবো।" অন্যদিকে 'অপর ভারত' বলছে, "নিজেকে আগে প্রমাণ করো। তারপর হয়তাবা তুমি একটি সুযোগ পেলেও পেতে পারো।"

'একটি ভারত' বসবাস করে আমাদের হৃদয়ের আশাবাদের দোলাচলে। 'অপর ভারত'টি আমাদের যাবতীয় সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্বের পঙ্কিলে ঘুরপাক খাচ্ছে। 'একটি ভারত' কিছু করতে চায়, 'অপর ভারত' আশা জিইয়ে রাখে।

'একটি ভারত' নেতৃত্ব দেয়, আর 'অপর ভারত' অনুসরণ করে।

এইসব পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে দ্রুততর হচ্ছে। প্রতিটি অতিক্রান্ত দিনের সঙ্গে অধিক থেকে অধিকতর মানুষ 'অপর ভারত' থেকে এই ভারতের পাশে চলে আসছে। এবং খুব নীরবে, যখন বিশ্বও দেখছে না– একটি উত্তেজিত, গতিশীল এক নতুন ভারতবর্ষ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

এবং চূড়ান্তভাবে :

ষাটতম বর্ষের একটি মুক্তজাতি হিসেবে এই আরোহণ আমাদের পৌঁছে দিয়েছে সময়ের প্রান্তবর্তী এক মহান প্রপাতে– অত্যন্ত খাড়া পিঠে। এবং একটি ভারত, যার মাথার পেছন থেকে একটি ছোট্ট ক্ষুদ্রকণ্ঠ, তার গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকার তলদেশের দিকে দোলায়মানচিত্তে তাকিয়ে আছে। আর অপর ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে এবং বলছে, 'দিন এসেছে আকাশে ওড়ার।'[৩৭]

আর এখানেই ছলনাময় বিশ্ব তার স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়। এটি বলে, 'বিত্তবানদের কোনো বিকল্প নেই ('দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ'), কিন্তু গরিবের রয়েছে। তাদের রয়েছে ধনী হবার একটি বিকল্প। যদি তারা এটা না করে তবে তার কারণ এই যে– তারা আশাবাদের পরিবর্তে হতাশাবাদকে বেছে নিচ্ছে, আস্থার পরিবর্তে দ্বিধার অচলে আটকে যাচ্ছে। অন্য ভাষায়, তারা আসলে দারিদ্র্যকেই বেছে নিচ্ছে। এটা তাদের সমস্যা। তারা দুর্বল। (এবং আমরা জানি 'লেবেনস্রাম' যারা খুঁজে বেড়ায়, তারা দুর্বলদের সম্পর্কে কী চিন্তা করে)। তারা হচ্ছে "পেছনে আটকে ধরা 'অতীত'-এর 'ভূত'"। তার মানে হলো– তারা ইতিপূর্বেই প্রেতাত্মায় পরিণত হয়েছে। রবার্ট জে. লিফটন বলেন, 'একটি চলমান ছলনাময় বিশ্বে গণহত্যা খুব সহজে ও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হয়।'[৩৮]

দরিদ্র মানুষ, তথাকথিত গরীব মানুষের একটি মাত্রই বিকল্প পথ রয়েছে : হয় প্রতিরোধ করো, নয়তো আত্মসমর্পন করো। বচ্চনের কথাটি ঠিক, তারা নীরবে এক পাশ থেকে অন্য পাশে চলে আসছে। বিশ্বও সেটা লক্ষ্য করছে না। তবে তিনি যেদিকে ভেবেছেন, সেদিকে নয়, তারা দেখছে গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকার এপার থেকে ওপার। তারা দেখছে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকটি। তারা

সেখান থেকে পেছনে ফিরে তাকায় 'রাশিয়ার জার (সম্রাট)-দের স্বেচ্ছাচারি উন্নয়নের দিকে (জার্‌স অব ডেভেলপমেন্ট) এবং সেই অনুতাপভরা স্লোগান অনুকরণ করতে থাকে– 'দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ'।

তারা লক্ষ্য করে দেখেছে কীভাবে মহান গান্ধীর আন্দোলনগুলোকে ক্রমান্বয়ে স্তিমিত করে দেওয়া হয়েছে, অনশন পাল্টা-অনশনে তাদেরকে অবমানিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আদালতের মামলার কূটচালে নাকানিচোবানি খাওয়ানো হয়েছে। এসব কোটি কোটি "পেছনে আটকে ধরা 'অতীত'-এর 'ভূত' সম্ভবত অবাক হয় যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আফ্রিকার ক্রীতদাস, তাসমানিয়ান, হেরেরো, হটেনটট, আর্মেনিয়ান, জার্মানির ইহুদি এবং গুজরাটের মুসলমানদের কী ধরনের উপদেশ দিতে পারতেন? সম্ভবত তারা এ কারণে হতবুদ্ধি হয়ে যায়, কীভাবে তারা অনশন ধর্মঘটে যেতে পারে? তারা তো না খেয়েই আছে। কিংবা কীভাবেই বা তারা বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে পারে– যখন কোনো ধরনের দ্রব্য কেনার মতো ন্যূনতম অর্থও তাদের হাতে নেই। অথবা তারা কীভাবে আয়কর দেওয়া অস্বীকার করতে পারে– যখন তাদের কোনো উপার্জনই নেই।

যেসব লোক সশস্ত্র সংগ্রামের পথে, তারা এর ফলাফল সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন হয়েই তাতে পা দিয়েছে। তারা এতটাই জেনে বুঝে এ পথ বেছে নিয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে নিজেদের চিন্তায় নিজেরাই স্বাধীন। তারা জানে যে, তাদের ভূখণ্ডে নতুন আইন গরীবদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। আর যেকোনো প্রতিরোধ আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা এটা জানে যে, আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দেওয়া নীতিবোধ, উদার সদাচরণ এবং সহানুভূতিশীল সংবাদমাধ্যম– কোনো কিছুই আর তাদের সাহায্য করতে পারবে না। তাদের জানা আছে, কোনো আন্তর্জাতিক মিছিল সংঘটিত হবে না, কোনো বৈশ্বিক ভিন্নমত তৈরি হবে না, বিখ্যাত লেখকগোষ্ঠী তাদের পাশে থাকবে না। যখন বুলেট ছুটে আসবে তখন এই সবকিছুই তাদের বিপরীত মেরুতে থাকবে। লাখ লাখ মানুষ ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এবং এই সব সংক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বড় অংশই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। (সর্বশেষ হিসেবে ধারণা করা হয় এর সংখ্যা কমপক্ষে ২৫ শতাংশ।)[৩৯]

এই যুদ্ধ মৃত্যুর দুর্গন্ধে ভরা। কোনো দিকে থেকেই এটাকে মনোহর বলা যায় না। এটা কীরকম হবে যখন এই সব পেছনের দিকে টেনে ধরা প্রেতাত্মাদের কাণ্ডারি হন চেয়ারম্যান 'মাও' নিজেই? (আশার রোশনাই এখানে যে, এসব পদাতিক বাহিনীর অনেকেই জানে না, তিনি আসলে কে। অথবা তিনি আসলে কী করেছিলেন। অধিকতর গণহত্যার অস্বীকৃতি? হয়তো।) তারা কি কোনো

আদর্শবাদী ব্যক্তি যারা একটি অধিকতর সুন্দর বিশ্বের জন্য সংগ্রাম করছেন? বেশ... নির্মূল করা অপেক্ষা অন্য যেকোনো কিছুই উত্তম।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, মাওবাদী বিদ্রোহী আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এককভাবে সবচেয়ে বড় হুমকি।[৪০]

আমাদের সংবাদমাধ্যম মাওবাদীদের নিন্দার জন্য দমবন্ধকরা ব্যাকুলতায় মুখিয়ে থাকে। এখানে একটি সাধারণভাবে দৃশ্যমান সংবাদপত্রের কলাম তুলে দেওয়া হলো। এটা স্বাভাবিকের এক বিন্দুও বাইরে নয়। 'নকশালদের পিষে চূর্ণ করে দাও' (স্ট্যাম্প আউট নকশাল্‌স) কলামে লেখা আছে :

অবশেষে এ সরকার নকশালবাদীদের দমনের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে।

এক মাসের কম সময় আগে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং রাজ্য সরকারগুলোকে নিবেদিত শক্তিশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে নকশালদের অবকাঠামো 'অবরুদ্ধ' ও তাদের কর্মকাণ্ড 'পঙ্গু' করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে এই 'ভাইরাস' নির্মূল করে ফেলা যায়। এটি আমাদের এই সংকেত দিচ্ছে যে, উন্নয়নের পেছনে অর্থ অপচয়ের পরিবর্তে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নকশালবাদীদের মোকাবিলা করার কথা সরকার অবশেষে উপলব্ধি করতে পেরেছে।[৪১]

'অবরুদ্ধ'। 'পঙ্গু'। 'ভাইরাস'। 'নির্মূল'। 'পিষে চূর্ণ করা'। হ্যাঁ। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অভিসন্ধি। এবং সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে, যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার হুমকির মুখে– তাদের অধিকার রয়েছে প্রতিরোধযুদ্ধের। যে ভাবেই হোক না কেন– তা অপরিহার্য।

তারা সম্ভবত শুনতে পাচ্ছে ঘাস ফড়িংয়ের শব্দ।

আজাদী

২২ আগস্ট ২০০৮-এ লন্ডনের 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা এবং ভারত থেকে প্রকাশিত 'আউটলুক' ম্যাগাজিনের ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়।

জুনের প্রায় শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে গত ষাট দিন ধরে কাশ্মীরের জনগণ অনেকটাই মুক্ত হয়ে গেছে। এই মুক্তি সবচেয়ে গভীরতর অনুভূতির দিক থেকে। প্রায় ৫ লাখ সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের বন্দুকের নলের মুখে, বিশ্বের সবচেয়ে নিবিড় সামরিকায়িত অঞ্চলে, জীবন যাত্রার যে ভীতি– তারা তা ঝেড়ে ফেলেছে।

প্রায় ১৮ বছর সামরিক দখলদারিত্ব বজায় রাখার পর, অবশেষে ভারত সরকারের সবচেয়ে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নটি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সশস্ত্র আন্দোলনকে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে– এ ঘোষণার পর পরই শুরু হয়েছে অহিংস বিদ্রোহের। অথচ এটি এমন একটি রূপ– যা নিয়ন্ত্রণের উপায় জানা নেই সরকারের।[১]

এই আন্দোলনের মূলে জলসিঞ্চন করছিল জনগণের সুদীর্ঘ নির্যাতনময় বছরগুলোর স্মৃতি– যখন হাজার দশেক মানুষকে হত্যা করা হয়, কয়েক হাজার লোক গুম হয়ে যায়, কয়েক লাখ লোক অত্যাচারিত ও অবমানিত হয়।[২]

বিগত বছরগুলোতে এই ভারতীয় রাজ্য, যেটা সচেতন মানুষের কাছে 'গভীর সমস্যাপীড়িত রাজ্য' হিসেবে পরিচিত– কাশ্মীরি জনগণকে দমিয়ে রাখার সব কিছুই এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে অর্থ (প্রচুর পরিমাণে), সহিংসতা (প্রচুর পরিমাণে), ভুলতথ্য প্রদান, প্রপাগাণ্ডা, নির্যাতন, এবং অত্যন্ত সুবিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে (যেখানে রয়েছে প্রচুর বিশ্বাসঘাতক), যোগসাজশকারী, গুপ্তচর, টিকটিকি ইত্যাদি। আরো ব্যবহার করা হয়েছে জেলহাজতের ভয়, ব্ল্যাকমেইল, লোক দেখানো নির্বাচন এবং এ জাতীয় আরো কিছু– গণতান্ত্রিক ভাষায় বলা যায়, 'জনগণের ইচ্ছে।' কিন্তু এখন এই গভীর সমস্যাপীড়িত রাজ্য নিয়ে যে ভুল বিশ্বাস রয়েছে, যেমন– এর জবরদখল করা বিষয়, অথবা বন্দুকের নলের মুখে যে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয়– সেটাকে প্রতিপন্ন করা হয় এক ধরনের স্বাভাবিকতা হিসেবে এবং জনগণের নীরবতাকে দেখানো হয় এক ধরনের স্বীকৃতি।

বলা হয়, 'কাশ্মীরিরা নিয়ত সহিংসতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা শান্তি চায়।' কিন্তু কী ধরনের শান্তির তারা প্রত্যাশী সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে

তুলে ধরা হয়নি। ইতিমধ্যে বলিউডে নির্মিত কাশ্মীরি মুসলমান-সন্ত্রাসীগোষ্ঠীদের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো বেশিরভাগ ভারতীয়দের মগজ এমনভাবে ধোলাই করে দিয়েছে যে, তারা বিশ্বাস করে– কাশ্মীরের দুঃখ-দুর্দশার নেপথ্যে রয়েছে জনঘৃণ্য সব সন্ত্রাসী।

গত দুই মাসে খুব সযত্নে চিত্রায়িত একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে যে, সাধারণ নির্দোষ লোকজন 'দুই বন্দুকের' মধ্যবর্তী ফাঁদে আটকা পড়েছে। এই দুই দিককেই তারা সমানভাবে ঘৃণা করে (এমন ব্যঙ্গের জন্য দুঃখিত)। এবং এই দুই দিক তাদেরকে গুলি করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

নিয়তির একটি আকস্মিক পরিবর্তন– যা অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্যপূর্ণ– যার মাধ্যমে ১০০ একর বনজ ভূমি 'অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড' (অমরনাথ তীর্থ বোর্ড, যেটি কাশ্মীরের হিমালয়-সংলগ্ন একটি গভীর গুহার কাছে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের বাৎসরিক তীর্থযাত্রার আয়োজন করে থাকে।)-কে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়– যা হঠাৎ করেই এক ড্রাম পেট্রোলের ভেতরে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি ছুড়ে ফেলার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে।[৩]

১৯৮৯ সাল পর্যন্ত অমরনাথ বছরে ২০ হাজার তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করতো– যারা দুই সপ্তাহের মধ্যে অমরনাথের গুহা ঘুরে যেতে পারতো। ১৯৯০ সালে যখন এই উপত্যকতায় খোলামেলাভাবে মুসলিম জঙ্গি বিদ্রোহের সঙ্গে সমতল ভারতে বিদ্বেষপূর্ণ হিন্দুত্বের প্রসারের সময়কাল মিলে গেল, তখন এই তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা গাণিতিক হারে বেড়ে গেল। ২০০৮ সালের মধ্যে পাঁচ লাখেরও বেশি তীর্থযাত্রী অমরাথের এই গুহাতে এসে তীর্থ করেন। এবং ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে এদের অনেকের তীর্থযাত্রী সম্পন্ন হয়। উপত্যকার অনেক স্থানীয় মানুষের কাছেই তীর্থযাত্রীর এই নাটকীয় সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিভাত হয় অনেকটা হিন্দু-মৌলবাদীতায় আগ্রাসী ভারতীয় রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক বিবরণীর মতোই।[৪]

সত্য হোক অথবা মিথ্যা, এই ভূমি হস্তান্তরকে দেখা হয়েছিল একটি কীলকের অগ্রভাগ হিসেবে। এবং এটা এক ধরনের ভীতিকে জাগিয়ে তুললো যে, এটা হচ্ছে একটি বিশদ পরিকল্পনার সূচনা– ইসরায়েলের মতো বসতি স্থাপনের সূচনা মাত্র। কয়েকদিনের তীব্র প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এই উপত্যকার সমস্ত কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দেয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই বিরোধিতা ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রামে। তরুণ প্রতিবাদীরা হাজার হাজার পুলিশের সঙ্গে নুড়িপাথর ছুড়ে বিক্ষোভ চালায়। পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুলিতে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হয়। প্রতিবাদের কয়েক সপ্তাহজুড়ে হরতাল এবং পুলিশের গোলাগুলির ঘটনার সময় হিন্দুত্ববাদীরা প্রপাগাণ্ডার সবটুকু কাশ্মীরিদের প্রতি অভিযোগের অঙ্গুলি তুলে ধরে

এবং এর অভিযোগের ভেতর দিয়েই সব ধরণের সাম্প্রদায়িক অপরাধ চালিয়ে যায়। এর ভেতরেই পাঁচ লাখের মতো তীর্থযাত্রী অমরনাথ তীর্থযাত্রা শেষ করে; এবং তারা যে শুধু অক্ষতই থাকে তাই নয়, বরং স্থানীয় জনগণের অতিথিপরায়ণতায় তারা মুগ্ধ হয়ে যায়।[৫]

অবশেষে, জনগণের তীব্র বিক্ষোভে সম্পূর্ণ বিব্রত হয়ে সরকার ভূমি হস্তান্তর বাতিল ঘোষণা করে।[৬]

তবে ইতিমধ্যেই ভূমি হস্তান্তরটি ইস্যু হিসেবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেও এসব বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

এই সিদ্ধান্ত বাতিলে বিরুদ্ধে হিন্দু-অধ্যুষিত জম্মুতে ব্যাপক আকারে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। এখানেও এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বিক্ষোভকারীরা জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে অবরুদ্ধ করে। এটি ছিল কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের একমাত্র কার্যকরী যোগাযোগব্যবস্থা।[৭]

হাইওয়ে পরিষ্কারের জন্য সেনাবাহিনীকে তলব করা হয় এবং জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে নিরাপত্তার সঙ্গে ট্রাক চলাচল বহাল রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু কাশ্মীরি ট্রাক চালকদের ওপর সহিংসতার ঘটনার খবর পাঞ্জাবের মতো দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও পাওয়া গেল। সেখানে নাকি তাদের জন্য কোনোপ্রকার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না।[৮]

এর ফলে কাশ্মীরের ট্রাক ড্রাইভাররা জীবনের ভয়ে হাইওয়েতে গাড়ি চালাতে অস্বীকৃতি জানালো। এই উপত্যকার উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্য ও টাটকা ফলমূল এবং সহজে পচনশীল মালামাল ট্রাকের ভেতর পচতে শুরু করলো। এটা খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে, এই অবরোধের ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকার ঘোষণা করলো যে, অবরোধ থামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ট্রাকগুলো নির্বিঘ্নে চলাচল করছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটি নিয়ন্ত্রিত অংশ গোয়েন্দা উৎসের বরাদ দিয়ে জানাল, এই অবরোধ মানুষের ধারণার বাইরে ছিল। এবং অনেকে এই ধারণাও দিতে লাগল যে, এ জাতীয় অবরোধ আসলে কখনই ছিল না।[৯]

কিন্তু এ জাতীয় কৌশল প্রয়োগের সময় ইতিমধ্যেই পার হয়ে গিয়েছিল এবং এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিসাধন হয়েছিল। কাশ্মীরের জনগণকে এটা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা আসলে বসবাস করে নির্যাতনের ওপরে। এটাও তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, তারা যদি নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না রাখে তবে তাদের ওপর অবরোধ আরোপ করা হতে পারে, না-খাইয়ে রাখা হতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ও জীবনদায়ী ওষুধপত্রের সরবরাহ

থেকে তাদের বঞ্চিত করা হতে পারে। সুতরাং একটি ভৌত অবরোধ পরিণত হলো একটি মানসিক অবরোধে।

ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যাবে– এটি আশা করা নিঃসন্দেহে বাতুলতা মাত্র। কেউ কি ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেনি যে, এমন কি ছোট ছোট বিষয়ে– যেমন জলব্যবস্থা বা বিদ্যুৎ সরবরাহ-জাতীয় নাগরিক সমস্যা নিয়ে কাশ্মীরে যে প্রতিবাদ শুরু হয় সেগুলো শেষ পর্যন্ত আজাদির (মুক্তি) দাবিতে পরিণত হয়? সুতরাং না-খাইয়ে মারার হুমকি আসলে ছিল একটি রাজনৈতিক আত্মহননের মতো ভুল।

যে তরুণ প্রজন্ম বড় হয়ে উঠেছে সেনাক্যাম্পের মাঠে, কিংবা বাঙ্কার ও নিরাপত্তা চেকপোস্টগুলোতে, কিংবা নির্যাতন কেন্দ্রের আর্তনাদের শব্দের মধ্য দিয়ে– তারা হঠাৎ একটি গণ-আন্দোলনের শক্তি উপলব্ধি করতে পারলো। এবং সর্বোপরি ঘাড় সোজা করে নিজেদের কথা বলার এবং নিজেদের প্রতিনিধিত্ব নিজেদের করার ভেতরে যে মর্যাদা রয়েছে– সেই সম্মানকে অনুভব করাটার বিষয়টি তারা আবিষ্কার করলো।

ত্রিশের দশক থেকেই কাশ্মীরের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে? এই প্রতিনিধিত্বকারী কি শেখ আব্দুল্লাহ? নাকি 'মুসলিম কনফারেন্স'? আজকে তা হলে কে এর প্রতিনিধিত্বকারী? আমাদের মূলধারার রাজনৈতিক দল? নাকি হুরিয়ত? নাকি জঙ্গিগোষ্ঠী? এই সময়টাতে জনগণই ছিল নিজেদের প্রতিনিধি। কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক দল– ন্যাশনাল কনফারেন্স, কিংবা পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি– এই সমস্যাপীড়িত রাজ্যে যাদের উৎপত্তি এবং ভারতের সংবাদমাধ্যম যাদেরকে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করেছে– খুব নৈরাশ্যময় ভোটারের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা খুব অনুগতভাবে নয়াদিল্লির টিভি স্টুডিওতে বিতর্কের জন্য হাজির হয়, কিন্তু কাশ্মীরের রাজপথে জমায়েত হওয়ার সাহস পায় না। সশস্ত্র জঙ্গিগোষ্ঠী– নির্যাতনের সবচেয়ে খারাপ সময়ে যাদেরকে মনে করা হতো কাশ্মীর মুক্তির একমাত্র মশালবাহী গোষ্ঠী, এ সময় যদি তারা আশেপাশে থেকেও থাকে, দেখে মনে হচ্ছে– আপাতত তারা পেছনের সিটে চুপচাপ বসে থাকতেই বেশি সন্তুষ্ট। এবং কাশ্মীরের পরিবর্তনের জন্য জনগণকেই তারা সুযোগ করে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে কাশ্মীরে একটি জনসংযোগ মিছিলে সৈয়দ আলি শাহ গিলানি ঘোষণা করেছিলেন এই আন্দোলনের একমাত্র নেতা হিসেবে। এটি তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের জন্য একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘোষণা। এই সংগ্রামের যে বিভিন্ন গোষ্ঠী রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অত্যন্ত পাতলা সুতোর ওপর যে জোট গড়ে উঠেছে, গিলানির এ ঘোষণায় তা প্রায় ছিঁড়ে পড়ার দশা সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি তার বক্তব্য থেকে সরে আসেন।[১০]

এটি পছন্দ করুন আর নাই করুন, এটিই হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র।

দিনের পর দিন লাখ লাখ মানুষ সেই সমস্ত এলাকাতে জমায়েত হতে লাগলেন, যেগুলোতে তারা ভয়াবহ সব স্মৃতি বয়ে বেড়াত। তারা বাঙ্কারগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে, কনসারটিনা তারের বিভিন্ন বেষ্টনি ভেঙে ফেলে এবং বিভিন্ন সৈনিকের মেশিনগানের নলের ভেতর দিয়ে এমন কিছু বলতে বলতে একদম সোজাসুজি তাকায়– যেটা ভারতীয়দের খুব কম অংশ শুনতে পছন্দ করে: 'হাম কেয়া চাহতে?' 'আজাদি!'– আমরা চাই স্বাধীনতা চাই।

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে শ্রীনগর কার্যত পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে। বক্‌শী স্টেডিয়াম, যেখানে গর্ভনর সাধারণত পতাকা উত্তোলন করতেন, কিছু সংখ্যক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যতীত সেটা ছিল প্রায় জনশূন্য।

১৬ আগস্টে লক্ষাধিক লোক পামপুরের দিকে পদযাত্রায় সামিল হয়। এটি হুরিয়ত নেতা শেখ আবদুল আজিজের গ্রাম– যাকে মাত্র পাঁচদিন আগে গুলি করে হত্যা করা হয়।[১১]

তিনি ছিলেন নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর রাস্তা উন্মুখ করার জন্য এক বিশাল আন্দোলনমূলক পদযাত্রার অংশ। যখন থেকে জম্মুর ওপর দিয়ে চলাচলকারী রাস্তাটির ওপর অবরোধ আরোপ করা হয়, তখন শ্রীনগর থেকে মুজাফ্‌ফারবাদে যাতায়াতকারী হাইওয়ে জনসাধারণের চলাচল ও পণ্য পরিবহনের জন্য খুলে দেওয়াটাই ছিল একমাত্র যৌক্তিক উপায়। এটি হচ্ছে সেই রাস্তা যেটি কাশ্মীরকে বিভক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হতো।

১৮ আগস্টে লক্ষাধিক মানুষ শ্রীনগরের বিশাল 'টিআরসি' (এর মানে 'ট্রুথ অ্যান্ড রেকনসিলেশন কমিটি' নয়, এটি হলো 'টুরিস্ট রিসিপশন সেন্টার') মাঠে জমায়েত হয়। এটি 'ইউনাইটেড নেশনস মিলিটারি অবজারভার গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান' (ইউএনএমওজিআইপি) প্রতিষ্ঠানের কাছেই অবস্থিত। সেখানে তিন দফা দাবিনামা পেশ করার জন্য জনগণ সমবেত হয়। দাবিনামা হলো : ভারতীয় শাসনের অবসান, জাতিসঙ্ঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন এবং প্রায় দুই দশক ধরে চলা যুদ্ধাপরাধের তদন্ত। এসব অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল আইনগতভাবে প্রায় সম্পূর্ণ দায়মুক্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পুলিশ কর্তৃক।[১২]

মিছিলের আগের দিন এই সমস্যাপীড়িত রাজ্যটি বলতে গেলে প্রায় কর্মবিরতির অবস্থায় পৌঁছেছিল। সে দিন একটু পড়ন্ত বেলায় আমার একজন সিনিয়র সাংবাদিক বন্ধু ফোন করে বলেছিলেন, সেই বিশেষ বিকেলে স্বরাষ্ট্র সচিব নয়াদিল্লিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আহ্বান করেছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিরক্ষা সচিব এবং গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধানেরা। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য

প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিভিন্ন টিভি সংবাদ চ্যানেলের সম্পাদকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো। এবং এটাও জানানো যে, সরকারের এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এ ধরনের আন্দোলন হঠাৎ করে পুনঃআবির্ভাব হওয়ার পেছেনে আইএসআই-এর একটি ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গোষ্ঠী কাজ করছে। এরপর তারা ওই চ্যানেলগুলোকে অনুরোধ করেন, যখন তারা এই সামগ্রিক বিষয়টিকে সংবাদ আকারে প্রচার করবেন তখন অত্যন্ত বিশেষায়িত অতি গোপনীয় গোয়েন্দা তথ্যটিকে যেন গোপন রাখা হয়। একটি সমস্যাপীড়িত রাজ্যের জন্য এটা দুর্ভাগ্যের এবং ব্যাপারটা এত দূর পর্যন্ত গড়াল যে, টিভি চ্যানেলগুলো– তাদের যদি এই নির্দেশনা মেনে চলতেই হতো তা হলে মানুষের কাছে তারা উপহাসের পাত্রে পরিণত হতো। ভাগ্য ভালো, দেখে মনে হচ্ছিল এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত সম্প্রচারিত হবে।

১৭ আগস্ট রাতে পুলিশ সমগ্র শহর অবরোধ করে ফেলে।

১৮ আগস্ট সকালবেলা জনসাধারণ সমগ্র উপত্যকার বিভিন্ন গ্রাম ও শহর থেকে শ্রীনগরে প্রবেশ করতে শুরু করে। ট্রাক টেম্পু জীপগাড়ি বাস কিংবা পায়ে হেঁটে তার শহরে আসতে থাকে। তারা নিরপাত্তা রক্ষাকারীদের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে ভেদ করে এগিয়ে যায়। এবং তাদের শহর পুনর্দখল করে। পুলিশের হাতে দুটো পন্থার যেকোনো একটি খোলা ছিল– হয় তাদের রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে, নয়তো একটি ব্যাপক গণহত্যা চালাতে হবে। তারা রাস্তা ছেড়ে দেওয়াটাই বেছে নেন। একটি গুলিও সেদিন তাদের বন্দুকের নল থেকে বেরোয়নি।

সমগ্র শহর মানুষের হাসি আনন্দের উত্তুঙ্গ সমুদ্রে ভাসছিল। আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল বিজয়োল্লাস। নৌকার মাঝি, ব্যবসায়ী, ছাত্র, আইনজীবী, চিকিৎসক– সবার হাতেই কিছু না কিছু লেখা ব্যানার ছিল। তাদের একটিতে লেখা ছিল: 'আমরা সবাই বন্দী, আমাদেরকে মুক্ত করো।' আরেকটিতে লেখা ছিল : 'ন্যায়বিচারহীন গণতন্ত্র = শয়তানি-উন্মাদনা'। শয়তানি-উন্মাদনা– এটা শুনতে বেশ সুন্দর। সেই ব্যানার বহনকারী সম্ভবত দিকনির্দেশ করছিলেন একটি দেশের বিকৃত যুক্তির দিকে– যার প্রয়োজন হচ্ছিল সাম্প্রদায়িক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মতো অপরাধগুলো সম্পন্ন করতে, যেন সে তার অসাম্প্রদায়িক পরিচিতিটাকে আরো শক্তিশালী করতে পারে। অথবা সেই পাগলামি যেটি পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক দখলদারিত্ব পরিচালনা করার অনুমোদন দেয় এবং এর পরেও সে নিজেকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করতেই থাকে।

প্রতিটি রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে সবুজ পতাকা ঝোলানো ছিল। এবং

লাইব্রেরি, ঢাকা।

আরো অনেক জায়গায়। রাস্তার পাশে যেসব স্থানের পথনির্দেশক ছিল, সেখানে হজরতবাল, বাটমালু, সোপুর ইত্যাদির জায়গায় নতুন করে লেখা হয়- রাওয়ালপিণ্ডি কিংবা সরাসরি পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রতি কাশ্মীরিদের যে পছন্দের বহির্প্রকাশ- একে আপনি মনে করতে পারেন পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত হওয়ার ইচ্ছা। এমনটি মনে করলে আপনি বড় ভুল করবেন। এ ধরনের পাকিস্তানপ্রীতির কিছুটা কারণ- তাদের প্রতি পাকিস্তানের যে সমর্থন সেই সমর্থনের প্রতি কৃতজ্ঞতা। কোনো ক্ষেত্রে এই সমর্থনের ভেতরে রয়েছে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের দৃষ্টিও। কাশ্মীরের জনগণের সমর্থন সেই জিনিসের প্রতি, যেটাকে তারা বিবেচনা করে তাদের মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে।

এই ধরনের মনোভাবের প্রতি নাক সিটকানো খুবই সহজ যে, এটা এমন একটি মুক্তি আন্দোলন যেটা নাকি এমন একটি দেশ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায় যে দেশটিকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ধারণা করা হয়। আর তারা সমর্থন চায় এমন একটি দেশের কাছ থেকে যে দেশটির বেশিরভাগ সময়টাই অতিক্রান্ত হয়েছে সেনাবাহিনীর স্বৈরশাসকদের ছায়ায়। এবং সেটি এমন একটি দেশ যার সেনাবাহিনী তাদের নিজেদের একটি অংশে (যা পরে স্বাধীনতা পেয়ে 'বাংলাদেশ' হিসেবে পরিচিত হয়) গণহত্যার মতো অপরাধ সঙ্ঘটিত করেছে। অন্যদিকে দেশটি তাদের জাতিগত গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ববিভেদের কারণেও এখন টুকরো টুকরো হওয়ার অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে। কিন্তু এই মুহূর্তে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে- আমাদের এই তথাকথিত 'গণতন্ত্র' কাশ্মীরে এমন কি কাণ্ড করলো যাতে লোকজন একে এতাটাই ঘৃণা করে?

সেদিন প্রতিটি জায়গায় পাকিস্তানের পতাকা উড়ছিল। প্রত্যেকে বলছে : 'পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বন্ধন কীসের?- সেটা আমাদের বিশ্বাসের। তা হলো- 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই'।'

'মুক্তির মানে কি? মানে হলো- 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই'।'

আমার মতো একজন অমুসলিম লোকের পক্ষে মুক্তির এ ধরনের একটি বিশ্লেষণ অনুধাবন করা অসম্ভব না হলেও যথেষ্ট কঠিন। আমি কাশ্মীরের একজন তরুণীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কাশ্মীরের মুক্তির যে আকাঙ্খা তার জন্য একজন নারী হিসেবে অধিকতর বন্দিত্ব বোঝায় না? সে তার কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, 'এখনই বা কী ধরনের মুক্তি স্বাদ আমরা পাচ্ছি? সেনাবাহিনীর হাতে ধর্ষিত হওয়ার স্বাধীনতা?' তার উত্তরটি আমাকে নীরব করিয়ে দিল।

সবুজ পতাকা বেষ্টিত টিআরসি-এর মাঠে দাঁড়িয়ে আমার মনে এই সন্দেহ আনাটা অসম্ভব ছিল যে, আমার আশেপাশে যে বিশাল গণজাগরণ ঘটেছে এটা

গভীরভাবেই ইসলামী ভাবাপন্ন। এবং এটাকে একইসঙ্গে এই নামকরণ করাটাও অসম্ভব যে– এটা একটি শয়তানী, কুচক্রী এবং একটি সন্ত্রাসী জিহাদ।

ভারতে আমাদের মতো লাখ লাখ লোক রয়েছে যারা হিন্দুত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখান উৎসারিত হয়েছে ভালোবাসা থেকে। অথবা আমরা যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের প্রতি আবেগপূর্ণ বোধ থেকে।

নয় আর এগারো এক নয়

(এবং নভেম্বরও সেপ্টেম্বর নয়)

প্রবন্ধটি ২০০৮ সালের ২২ ডিসেম্বর ভারত থেকে প্রকাশিত 'আউটলুক' ম্যাগাজিনে, ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দ্য গার্ডিয়ান'-সংবাদপত্রে, টমডিসপ্যাচ ডট কম-এর ওয়েবসাইটে ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ এবং ইন্টারন্যাশনাল সোশিয়ালিস্ট রিভিউ, ইস্যু-৬৩, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

আমরা নিজেদের ট্রাজেডিগুলোর অধিকার নিজেরাই হারিয়ে ফেলেছি। মুম্বাইয়ের ধ্বংসযজ্ঞ চলার পরের দিন ২৪ ঘণ্টার সংবাদ-চ্যানেলগুলো আমাদের জানালো যে, আমরা আসলে '৯/১১'-এর ভারতীয় সংস্করণ দেখতে পেলাম। এবং পুরাতন হলিউড সিনেমার অনুকরণে নির্মিত বলিউড-সংস্করণে অভিনেতারা যেরকমটি করে থাকেন, আশা করা হয়েছিল আমরাও এখন সেই আমেরিকান নাটকের একই রকম ভূমিকা পালন করবো।

এ অঞ্চলে যখন উত্তেজনা বাড়তে লাগলো তখন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর জন ম্যাককেইন পাকিস্তানকে এই বলে সতর্ক দিলেন যে, সেই সব 'খারাপ লোকদের' গ্রেফতারের ব্যাপারে পাকিস্তান যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তা হলে, তার কাছে গোপনীয় তথ্য রয়েছে যে, ভারত যেকোনো সময় পাকিস্তানে অবস্থিত সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলোতে আকাশপথে হামলা চালাতে পারে। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াশিংটনের পক্ষে কোনোধরনের প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে না। কেননা, মুম্বাইয়ের এই ঘটনা হচ্ছে 'ভারতের ৯/১১'।

কিন্তু নভেম্বর মাস সেপ্টেম্বর নয়, আর ২০০৮ সালও ২০০১ নয়। পাকিস্তানও আফগানিস্তান নয় এবং ভারতও যুক্তরাষ্ট্র নয়। সুতরাং সম্ভবত আমরা নিজেরাই আমাদের দুর্দশাকে পুনরুদ্ধার করতে পারি এবং সেই ধ্বংসাবশেষকে আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি।

এটা খুব অস্বাভাবিক যে, কীভাবে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কাশ্মীরের হাজার হাজার জনগণ ভারতের হাজার হাজার সৈন্যের ঘেরাটোপে তাদের ভোটপ্রদানের জন্য লাইন দিয়েছিল, যখন ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সমৃদ্ধ শহরকে দেখাচ্ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত 'কুপওয়ারা'র (যেটি কাশ্মীরের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা) মতো।

মুম্বাই আক্রমণটি ছিল এ বছরে ভারতীয় শহরগুলোতে সন্ত্রাসী হামলার ধারাবাহিকতার একটি সাম্প্রতিকতম ঢেউ মাত্র। আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালুরু, দিল্লি, গোয়াহাটি, জয়পুর, মালিগাঁও– সবগুলো শহরেই আমরা ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনা দেখেছি, যেখানে শত শত সাধারণ জনগণ আহত ও নিহত হয়েছে। পূর্ববর্তী আক্রমণগুলোর পরে যেসব লোককে সন্দেহভাজন হিসেবে পুলিশ গ্রেফতার

করেছিল, তারা যদি যথার্থভাবেই এসব হামলার সঙ্গে জড়িত থাকতো, যাদের ভেতরে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সন্দেদভাজন রয়েছে এবং যারা প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিক, তবে এটা সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে যে, আমাদের এ দেশ কিছু কিছু ব্যাপারে খুব ন্যাক্কারজনকভাবে ভুলপথে চালিত হচ্ছে।

আপনি যদি টেলিভিশনে এসব ঘটনা দেখতেন, তা হলে হয়তো শুনতেই পারতেন না যে, মুম্বাই-হামলায় সাধারণ লোকজনও নিহত হয়েছিল। ব্যস্ত রেলওয়ে স্টেশন কিংবা সরকারি হাসপাতালগুলোতে তাদেরকে স্তূপাকারে রাখা হয়েছিল। সন্ত্রাসীরা ধনী বা গরিবের ভেতরে কোনো ভেদাভেদ করেনি। তারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় উভয় শ্রেণীকেই হত্যা করেছিল। অবশ্য ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো এই ক্রমবর্ধমাণ আতঙ্কের জোয়ারে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এই ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল মার্বেল পাথরে বাঁধাই করা লবি কিংবা ক্রিস্টাল পাথরে সাজানো বল রুমের অন্দরে, যেগুলো ছিল দুটি হোটেল এবং একটি ছোট ইহুদি সেন্টারে।

আমাদেরকে বলা হয়েছিল যেসব হোটেল মুম্বাই শহরের সবচেয়ে বড় আইকন, এই হামলার শিকার হোটেলটি তার ভেতরে অন্যতম। কথাটি নিখাঁদভাবে সত্য। এটি ছিল ভারতের নগ্ন ন্যায়বিচারহীন প্রাত্যহিক দুঃখকষ্টভোগী সাধারণ ভারতবাসীদের বিপরীতে আরাম আয়েশের স্বর্গ। আন্তর্জাতিক ক্ষুধার্তের সূচকে ভারতের অবস্থান সুদান ও সোমালিয়ারও নিচে। কিন্তু এটি সেই যুদ্ধ নয়। আমাদের দেশের গ্রামগুলোর দলিতদের আবাসস্থল বা বস্তিগুলোতে, কিংবা 'নর্মদা' ও 'কোয়েল কারো' নদীর কূলে যে যুদ্ধ; অথবা 'চেনগারা'র রবার বনে যে যুদ্ধ; কিংবা পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, লালগড়ে যে যুদ্ধ; এবং ছত্তীশগঢ়, ঝাড়গ্রাম, ওড়িশা এবং আমাদের বিপুল আয়তনের নগরগুলোর পাশ-ঘেষে গড়ে ওঠা সবচেয়ে অবহেলিত বস্তিগুলোতে যে যুদ্ধ চলছে– সেই যুদ্ধ কিন্তু আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখানো হয় না।

সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদের ভেতরে রয়েছে একটি অমার্জনীয় সুতীব্র ভুলের ধারা। এর একদিকে রয়েছে (মনে করি এই একটা দিককে আমরা 'ক' বললাম) সে ধরনের মানুষ– যারা সন্ত্রাস, বিশেষ করে 'ইসলামিক সন্ত্রাস'কে দেখে অত্যন্ত ঘৃণাভরে– যার ভেতরে রয়েছে তীব্র উন্মাদনা ও জিঘাংসা। এটি নিজের অক্ষপথে নিজেকে ঘিরেই আবর্তিত হয় এবং আশেপাশের পৃথিবী কী ঘটছে তার সঙ্গে এর যেন কোনো যোগসূত্র নেই। এবং ইতিহাসের সঙ্গেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। সে কারণে 'ক' পাশের লোকজন বলে, একে কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা কিংবা একে বোঝার চেষ্টা করা, এমন কি এর যথার্থটা প্রতিপন্নর চেষ্টা করা

যে এটি একটি অপরাধ। 'খ' পার্শ্বের লোকজন বিশ্বাস করে যে, কোনো কিছু এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে কখন হয়তো যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে পারে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের অস্তিত্ব থাকে একটি সুনির্দিষ্ট সময়কালে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এবং সেই জিনিসটি বোঝার চেষ্টা অস্বীকার করলে তা এসব সমস্যাকে আরো ঘনীভূতই করবে। এবং তখন এটি আরো বেশি লোকের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেবে– যা নিজেই একটি অপরাধে পরিণত হবে।

১৯৯০ সালে হাফিজ সাঈদ 'লস্কর-এ তৈয়বা'র (এর অর্থ– খাঁটি মানবদের সৈন্যদল) প্রতিষ্ঠা করে। সে ইসলামের কট্টরপন্থী 'সালাফি' মতাদর্শে বিশ্বাসী। সে আত্মহত্যামূলক-বোমাহামলার মতাদর্শকে অনুমোদন করে এবং ইহুদি, শিয়া ও গণতন্ত্রকে ঘৃণা করে এবং বিশ্বাস করে যে, জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত চালানো উচিত যতক্ষণ ইসলাম তার মতাদর্শগত শাসনাধীনে সমগ্র বিশ্বকে দখলে আনতে না পারে। সে যা বলে তার কিছু কথা এরকম, 'ভারত যতক্ষণ পর্যন্ত অখ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো শান্তি আসতে পারে না। তাদেরকে টুকরো করে দাও। তাদের এত খণ্ডে খণ্ডে টুকরো করে দাও যেন তারা আমাদের সামনে হাঁটুমুড়ে বসে এবং দয়া ভিক্ষা করে।' এবং সে আরো বলে : 'ভারতই আমাদেরকে জিহাদের এ রাস্তা দেখিয়েছে... আমরাও ভারতকে তার ঢিলের জন্য পাটকেলের জবাব দিতে চাই। আমরা হিন্দুদের নিধন করতে চাই, ঠিক যেভাবে তারা কাশ্মীরে মুসলিমদের হত্যা করেছে।'

অন্যদিকে পার্শ্ব 'ক' এর আনুকুল্যে রয়েছেন গুজরাট গণহত্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ খলনায়ক বাবু বজরঙ্গি, যে নিজেকে সন্ত্রাসী নয়, একজন গণতন্ত্রপন্থী বলেই মনে করে– মাত্র কয়েক মাস আগে 'তেহেলকা' নামে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম তার বক্তব্য ক্যামেরাবন্দী করে – 'আমরা মুসলমানদের একটি দোকানকেও রেহাই দেইনি। আমরা সবকিছুতেই আগুন লাগিয়েছি ... কুপিয়েছি, হত্যা করেছি। তাদেরকে কাবাব বানিয়েছি ... ঝলসিয়েছি। আমরা তাদেরকে আগুনে পোড়াতেই বিশ্বাস করি, কেননা এই বেজন্মাগুলো দাহ হতে চায় না, তারা এই ব্যাপারটাতে বেশ ভালোই ভয় পায় ...। আমার শুধু একটাই শেষ ইচ্ছা রয়েছে, তারপর দরকার হয় আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। তা হলো, ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে আমাকে মাত্র দুটো দিন সময় দিতেই হবে। আমি জোহাপুরা (যেখানে সাত থেকে আট লাখ মুসলিম বসবাস করে) যাবো এবং তাদেরকে শেষ করবো। আমাকে আরো কিছু মুসলিম মারতে দাও। অন্তত ২৫ থেকে ৫০ হাজার তো মরাই উচিত।

এবং পার্শ্ব 'ক'-এর দলভুক্ত এম. এস. গোয়ালকার (যিনি ১৯৪৪ সালে ড. হেজেওয়ারের কাছ থেকে আরএসএস-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন) রচিত আরএসএস-এর বাইবেল 'উয়ি, অর, আউয়ার ন্যাশনহুড ডিফাইনড'-এ লিখেছেন– 'মুসলমানরা যখন হিন্দুস্তানে প্রথম পা রাখলো সেই মন্দ দিনের পর থেকে এমন কি বর্তমান সময় পর্যন্ত এই হিন্দু জাতি বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে এই সব ধ্বংসবাজদের সঙ্গে। এবং তাদের জাতিগত যে সজীবতা সেটিও পুর্নজাগ্রত হচ্ছে।' এবং আরো বলেছে : 'জার্মানিরা তাদের সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষায় পুরো বিশ্বকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। এ কাজে তারা তাদের ভূখণ্ডে আরবীয় জনগোষ্ঠী ইহুদিদের সমূলে বিনাশ করছিল। এটা ছিল জাতিগত গৌরবের চূড়ান্ত প্রকাশ। ... এবং হিন্দুস্তানে এটাকে কাজে লাগিয়ে ভালো কিছু পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক একটি নিদর্শন।'

> অবশ্যই এই হিন্দু অধিকারবাদীদের গুলির মুখে শুধু যে মুসলিমরাই রয়েছে, তাই নয়, দলিতদেরকেও নিরবচ্ছিন্নভাবে আক্রমণের শিকার করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ওড়িশার কান্ধামালে প্রায় আড়াই মাস ধরে খ্রিস্টানদের সঙ্গে সহিংসতা চলে। এ সহিংসতায় কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়। ৪০ হাজারের বেশি খ্রিস্টানকে ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়, যাদের অনেকেই এখন উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করে।রর
>
> ভারতজুড়ে ২০০০ সাল নাগাদ আরএসএস-এর ৬০ হাজারের শাখা এবং তাতে ৪০ লাখের বেশি সশস্ত্র স্বয়ংসেবক ছিল। এদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা এল.কে. আদভানি এবং নিশ্চিতভাবেই গুজরাটের তিন বারের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এতে আরো আছেন ভারতীয় গণমাধ্যমের বিশিষ্ট সিনিয়র ব্যক্তিরা, পুলিশ, সেনা কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থা, বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক বিভাগের অনেক কর্তাব্যক্তি– যারা আরএসএস-এর মতো মতাদর্শে অদৃশ্যভাবে হিন্দুত্ববাদের একজন ঘনিষ্ট সমর্থক। যারা রাজনীতিবিদদের থেকে ব্যতিক্রম, যারা আসেন আর যান– তারাই আমাদের রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রায় স্থায়ী সদস্য।

এবং আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রকে এসব ঘটনা যদি যথেষ্ট কালিমালিপ্ত না করে থাকে, তবে আমাদের এটাও বিবেচনায় আনতে হবে যে, ভারতজুড়ে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম সংগঠন রয়েছে, যারা তাদের সংকীর্ণমনা উগ্রপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে দিতে থাকে। সুতরাং, ভারসাম্যের দিক থেকে, আমাকে যদি একটি পার্শ্ব বেছে নিতে বলা হয়, তবে আমি পার্শ্ব 'খ' বেছে নেব। সত্যিকার অর্থে আমাদের

একটি সামগ্রিক প্রেক্ষাপট দরকার। সবসময়ই।

এই পারমাণবিক শক্তি-সমৃদ্ধ উপমহাদেশে সেই প্রেক্ষাপট হচ্ছে– 'দেশভাগ'। যে 'র‍্যাডক্লিফ লাইন' ভারত ও পাকিস্তাকে বিভক্ত করেছে, যেটির বিভক্তিরেখা নির্মমভাবে কেটে দিয়ে গেছে অসংখ্য রাজ্য জেলা, গ্রাম, প্রান্তর, সম্প্রদায়, জল-ব্যবস্থাপনা, নদী, বাড়িঘর এবং পরিবারকে। এটি আক্ষরিক অর্থেই এক রাতের মধ্যে সীমানা টেনে দেয়। আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাদের পাছায় এটা ছিল ব্রিটিশদের চূড়ান্ত লাথি।

এই দেশ-বিভাগের ফলে দশ লাখের বেশি মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। সমসাময়িক মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মানুষ তার নিজ ভূমি ত্যাগ করে অভিবাসিত হয় অন্য ভূমিতে। এর ভেতরে রয়েছে প্রায় আশি লাখ মানুষ। নব্য পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা পালিয়ে যায়, নব্য ভারত থেকে মুসলিমরা পালিয়ে যায়। বলতে গেলে তারা তাদের গায়ে জড়ানো কাপড় ছাড়া সবকিছুই ছেড়ে চলে যায়। এর ফলে অকল্পনীয় কষ্ট, ঘৃণা, আতঙ্ক ও আকাঙ্ক্ষা এরা প্রত্যেকেই বহন করতে থাকে, এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলোর ভেতরেও তা সঞ্চারিত করে দেয়। আমরা দেখতে পাই 'পাকিস্তান'– যার মানে পবিত্র ভূমি– পরিণত হয় একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে; তারপর দ্রুতই হয়ে ওঠে দুর্নীতিপরায়ণ সহিংস সামরিক রাষ্ট্র– যেটি খোলাখুলিভাবেই অন্য কোনো বিশ্বাসকে বরদাস্ত করে না। অন্য পক্ষে, ভারত নিজেকে ঘোষণা করে, সর্বব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে।

এটা ছিল একটি অসাধারণ পদক্ষেপ। তবে বাবু বজরঙ্গির পূর্বসূরীরা সেই ১৯২০ সাল থেকেই হিন্দুত্ববাদী ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য কঠোর পরিশ্রম শুরু করেছিলো– যা ভারতের রক্তপ্রবাহের ভেতরে একটু একটু করে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। ১৯৮৯ সালের ১১ জানুয়ারি বিজেপির একটি ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ সভায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও সেখানে একটি মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব পাশ করা হয়। এই সভার প্রায় পর পরই লালকৃষ্ণ আদভানি বলেন, 'আমাদের এই সভার সিদ্ধান্ত তালিকাটি ভোটে পরিণত হবে।' অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তে তাদের পক্ষে ভোটের জোয়ার আসবে। পরের বছরই তিনি তার 'রথ যাত্রা' শুরু করেন। তিনি সমগ্র ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়ান এবং অনলবর্ষী বক্তৃতার তীর ছুঁড়ে তিনি বারী মসজিদ ধ্বংসের দাবি জানান। তিনি যে পথ দিয়ে গমন করেন তার পেছনে ফেলে রাখেন জাতিগত দাঙ্গা আর রক্তপাত। ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ১৯৯১ সালে এই দল ১২০টি আসনে জয়লাভ করে। (১৯৮৪ সালে মাত্র ২টি আসনে জয়লাভ করেছিল)। আদভানির শেখানো উন্মাদনা যখন সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হলো, তখন ১৯৯২ সালে কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতা মসজিদটিকে ধূলিস্যাত করে। ১৯৯৮ সালে বিজেপি ভারতের

> কেন্দ্রীয় সরকারেই ক্ষমতা দখল করে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী তাদের পালে অনুকূল হাওয়ার জোগান দেয়। এটা তাদেরকে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়– ঠিক যেরকমটি তারা করতে চায়। এমন কি গণহত্যা চালানোরও। এবং তাদের ফ্যাসিজমকে উপস্থাপন করা হয় একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধপূর্ণ দেশের আইনসম্মত রূপ হিসেবে। এই ঘটনাটি ঠিক তখনই ঘটলো যখন ভারত তার বিশাল বাজার খুলে দিলো তার আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার নিকট। এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমগুলোর স্বার্থেই এটিকে এভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল যে, তারা কোনো ভুল করতে পারে না। এটাই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দিয়েছিল সব ধরনের অস্ত্র ও আইনগত সুরক্ষা।

এই হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, যা এই উপমহাদেশকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলে, যার অনেক রকম সন্ত্রাসী হামলার মধ্যে একটি বৃহৎমাপের হামলা এই 'মুম্বাই আক্রমণ'। আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয় যে, 'লস্কর-এ তৈয়বা'র প্রধান হাফিজ সাঈদ মূলত ভারতের সিমলার অধিবাসী ছিলেন। এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবা সঙ্ঘের লালকৃষ্ণ আদভানি এসেছেন পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ থেকে।

এখন আমরা যে অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তা আমাদের বিগত কয়েক দশকের নোংরা কৃতকর্মের সামষ্টিক প্রতিফল।

যার মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সেই একমাত্র পন্থাটি হলো, এই সন্ত্রাসবাদের দর্পণের ভেত র দিয়েই এই দৈত্যটাকে বিচারবিশ্লেষণ করা। আমরা এখন একটি দ্বিধাবিভক্ত ত্রিশঙ্কু রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে আছি। এক দিকে সঙ্কেত দেখাচ্ছে 'ন্যায়বিচার' রাস্তার। আর অপর রাস্তাটিতে লেখা রয়েছে 'গৃহযুদ্ধ'; এবং তৃতীয় কোনো রাস্তার চিহ্ন নেই। পেছনে ফিরে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই। আপনি বেছে নিন, কোন রাস্তায় আপনি অগ্রসর হবেন।

Notes

Introduction

Democracy's Failing Light

1. See P. Chidambaram's interview with Shoma Chaudhury and Shantanu Guha Ray, *Tehelka* 5, no. 21, (May 31, 2008).
2. P. Sainath, "Neo-Liberal Terrorism in India: The Largest Wave of Suicides in History," *Counter Punch*, February 12, 2009.
3. See United Nations Children's Fund (UNICEF), *The State of Asia-Pacific's Children 2008* (May 2008). Report available online at: f.org/ publications/index 45086.html (accessed March 29, 2009).
4. For a detailed account of the Mumbai riots of 1993, see the Report of the Justice B. N. Srikrishna Commission of Enquiry. Available online at http:// www.sabrang.com/srikrish/sri%20main.htm (accessed March 29, 2009).
5. Sachar Committee Report, November 2006. Available online at tyaftai.in/newsitc/sachar/sachar.asp.
6. Arundhati Roy "The End of Imagination," in *The Cost of Living* (New York: Modern Library, 1999), pp.106-08.
7. See the Rejoinder Affidavit of the Citizens for Justice and Peace through its president vs The Dist. Collector, Ahmedabad & Others... Respondents in Writ Petition Civil 3770/2003. Rejoinder fled October 3, 2006. Available online at: (accessed March 29, 2009).
8. See Celia W. Dugger, "India Orders Inquiry into Miissionan's Killing," *New York Times, January 29, 1999, p.A9.*
9. See Angana Chatterji, "Hindutva's Violent History," Tehelka, September 13, 2008. See also Angana P Chatterji, *Violent Gods: Hindu Nationalism is India's Present; Narrative from Orissa* (Gurgaon: Three Essays Collective, 2009),
10. See Somini Sengupta, "Attack on Women at an Indian Bar Intensifes a Clash of Cultures," *New York Times, February 8,2009,p.A5.*
11. "Lok Sabha Polls to Cost More Than US Presidential Poll," Times of India, March 1, 2009.
12. See Shantanu Guha Ray, "Offer Valid 'Till Votes Last," Tehelka, May 27, 2009.
13. See online results from the Election Commission of India at http://www: eci.nic.in.
14. Of India's population of one billion, the registered voter base is 672 mil-

lion. In 2009, only 356 million Indians voted, a turnout fo 35 percent, of this the UPA vote share was approximately 33 percent, i.e., less than 120 million voted for the UPA, n/frmPercentVotesParty-WiscChart.aspx.

15. See "BJP, Congress Should Join Hands, Says Govindachary," Press Trust of India, Indore, May 15, 2009.
16. See "India, Pak Unite to Block Anti-Lanka Move at: UN," India Express, May 28, 2009.
17. See "Journalism on Wheels," photo by Rajeev Bhatt of BBC's India Election Special Train, *Hindu*, April 26, 2009.
18. See "Vote for Reforms, Says India Inc," *Sunday Hindustan Times, May 17*, 2009.
19. See "Corporate Captains Feel Easy Without Left," *Sunday Hindustan Times*, May 17, 2009.
20. The theme song from the hit film *Slumdog Millionaire, which was bought* by the Congress Party for its election campaign for a sum of Rs I crore ($200,000).
21. See Udav Khandeparkar, "Behind the Nano Hype," Wall Journal, March 19, 2009.
22. D. K. Singh, "'In logos ko pakad pakad ke nasbandi karana padega" (These people must be caught and sterilized), *Indian Express, Marc 22, 2009*.
23. See Pratap Bhanu Mehta, "A Country in 40 Acres," *Indian Express, August*. 6, 2008. See also Vir Sanglivi, "Think the Unthinkable," Hindustan Times, August 16, 2008, and Swaminathan Iver, "Pushing Kashmir Towards Pakistan," *Economic Times*, August 13, 2008.
24. For an appraisal of the recently concluded elections in Janunu and Kashmir, see Gautam Navlakha, "Jammu and Kashmir Elections: A Shift in Equations," and Rekha Chowdhary, "Separatist Sentiments and Deepening of Democracy," *Economic and Political Weekly*, January 17-23, 2009.
25. For a detailed report, see Rajeev Upadhyay, "The Melting of the Siachen Glacier," *Current Science* (March 10, 2009): pp. 646-48.

Chapter One

Democracy: Who's She When She's At Home?

1. "Sayeeda" is a pseudonym. "Om" is a sacred symbol of the Hindus. The violence in Gujarat was directed especially at women. See, for example, the following: "A doctor in rural Vadodara said that the wounded who started pouring in from February 28 had injuries of a kind he had never witnessed before even in earlier situations of communal violence. In a grave challenge to the Hippocratic oath, doctors have been threatened for treating Muslim patients, and pressured to use the blood donated by RSS volunteers only to treat Hindu patients. Sword injuries, mutilated breasts and burns of varying intensity characterized the early days of the massacre.

Doctors conducted post-mortems on a number of women who had been gang-raped, many of whom had been burnt subsequently. A woman from Kheda district who was gang-raped had her head shaved and 'Om' cut into her head with a knife by the rapists. She died after a few days in the hospital. There were other instances of 'Om' engraved with a knife on women's backs and buttocks." from Laxmi Murthy, "In the Name of Honour," CorpWatch India, April 23, 2002.Available online at: (accessed March 29, 2009).

2. "Stray Incidents Take Gajarat Toll to 544," *Times of India*, March 5, 2002. For a comprehensive account of the events in Gujarat in 2002, see Siddharth Varadarajan, ed., *Gujarat The Making of a Tragedy (New* Delhi: Penguin Books India, 2002), Dionne Bunsha, *Scarred: Experiments with Violence in Gujarat (New* Delhi: Penguin Books India, 2006), and the special March-April 2002 issue of *Communalism Combat* (available online at:.html (accessed March 29, 2009), and Rakesh Shurma's documentary *Final Solution (Mum*bai, 2004). Information on the film is available online at http://rakeshfilm.com.

3. Edna Fernandes, "India Pushes Through Anti-Terror Law," Financial *Times* (London), March 27, 2002, p. 11; "Terror Law Gets President's Nod," *Times of India*, April 3, 2002; Scott Baldauf, "As Spring Arrives, Kashmir Braces for Fresh Fighting," *Christian Science Monitor, April 9,2002, p. 7; Howard W. French and* Raymond Bonner, "At Tense Time, Pakistan Starts to Test Missiles," *New York Times*, May 25, 2002, p. A1; Edward Luce, "The Saffron Revolution," Financial Times (London), May 4, 2002, p. 1; Martin Regg Cohn, "India's saffron' Curriculum, "Toronto Star, April 6, 2002, p. B4; Pankj Mishra, "Holy Lies," Guardia (London), April 6, 2002, p. 24; and Edward Luce, "Battle Over Ayodhya Temple Looms, "Financial Times (London), February 2, 2002, p.7

4. "Gujarat's Tale of Sorrow: 846 Dead," *Economic Times of India, April 18*,2002. The figure was recently updated to 1,180. See Press Trust of India, "2002 Gujarat Riots: Missing Persons to Be Declared Dead," *Indian Express*, March 1, 2009. See also Celia W. Dugger, "Religious Riots Loom Over Indian Politics," *New York Times, July* 27, 2002, p. A1; Edna Fernandes, Gujarat Violence Backed by State, Says EU Report," *Financial Times (London)*, April 30, 2002, p. 12. See also Human Rights Watch, "'We Have No Orders To Save You': State Participation and Complicity in Communal Violence in Gujarat, "Vol. 14, no. 3 (C), April 2002 [hereafter: "HRW Report"]. Availabbe online at; and at: (accessed March 29, 2009). See also Human Rights Watch, "India: Gujarat Officials Took Part in Anti-Muslim Violence," press release, New York, April 30, 2002.

5. See "A Tainted Election" Indian *Express*, April 17, 2002; Meena Menon, "A Divided Gujarat Not Ready for Snap Poll," Inter Press Service, July 21,2002; HRW Report, pp. 7,15-16,27-31,45; Dugger, "Religious Riots

Loom Over Indian politics," p.A1; "Women Relive the Horrors of Gujarat," *Hindu, May*, 18, 2002; Harbaksh Singh Nanda, "Muslim Survivors Speak in India," United Press International, April 27, 2002; "Gujarat Carnage: The Aftermath: Impact of Violence on Women," OnlineVolunteers.org, 2002. Available online at: March 29, 2009);and Justice A. P. Ravani, Submission to the National Human Rights Commission, New Delhi, March 21, 2002, Appendix 4. Available online at: (accessed March 29, 2009). See also "Artists Protest Destruction of Cultural Landmarks," Press Trust of India, April 13, 2002, and Rama Lakshmi, "Sec tarian Violence Haunts Indian City: Hindu Militants Bar Muslims from Work," *Washington Post*, April 8, 2002, p. A12.

6. *Communalism Combat* (March-April 2002) recounted Jaffri's final moments: Ehsan Jaffri is pulled out of his house, brutally treated for 45 minutes, stripped, paraded naked, and asked to say, "Vande Maataram!" and "Jai Shri Ram!" He refuses. His fingers are chopped off, he is paraded around in the locality, badly injured. Next, his hands and feet are chopped off. He is then dragged, a fork-like instrument clutching his neck, down the road before being thrown into the fire. See also "50 Killed in Communal Violence in Gujarat, 30 of Them Burnt, Press Trust of India, February 28, 2002.
7. HRW Report, p. 5. See also Dagger, "Religious Riots Loom Over Indian Politics," p. A1.
8. "Gujarat Carnage," OnlineVolunteers.org, 2002. See also "Verdict on Gujarat Deaths: It's Premeditated Murder," *Straits Times* (Singapore), June 7, 2002.
9. "ML Launches Frontal Attack on Sangh Parivar," *Times of India*, May 8, 2002.
10. HRW Report, pp. 21-27. See also the remarks of Kamal Mitra Chenoy of Jawaharlal Nehru University, who led an independent fact-finding mission to Gujarat, "Can India End Religious Revenge?" *Q&A with Zain Verjee*, CNN International, April 4, 2002.
11. Tavleen Sigh, "Out of Tune," *India Today*, April 15, 2002, p. 21. See also Sharad Gupta, "BJP: His Excellency," India *Today*, January 28, 2002, p. 18.
12. Khozem Merchant, "Gujarat Vajpayee Visits Scene of Communal Clashes," Financial *Times* (London), April 5, 2002, p. 10. Pushpesh Pant, "Atal at the Helm, or Running on Auto: " *Times of India*, April 8, 2002.
13. Bharat Desai, "Will Vajpayee See Through All the Window Dressing'" *Economic Times*, April 5, 2002.
14. "Singapore, India *to* Explore Closer Economic Ties," Agency France-Press, April 8, 2002.
15. "Medha [Patkar] Files Charges Against BJP Leaders," *Economic Times*,

April 13, 2002.

16. HRW Report, p. 30. See also Burhan Wazir, "Militants Seek Muslim-Free India," *Observer* (London), July 21, 2002, p. 20.
17. Mishra, "Holy Lies," p. 24.
18. On the attacks on women, see "Seven More Held for Assaulting Women " *Express Buzz* (Chennai), January 25, 2009. On the attacks on Christians, see Chatterji, "Hindutva's Violent History," and Harsh Mender, "Cry, The Beloved Country: Reflections on the Gujarat Massacre," March 13, 2002. Available online at: (accessed March 29, 2009). See also Chatterji, *Violent Gods.*
19. *See Communalism Combat* "Godra" (November-December2002). Available online at: 02/godlyra.html (accessed March 29, 2009). See also Jyoti Punwani "The Carnage at Godhra, in Varadarajan, ed., *Gujarat.*
20. HRW Report, pp. 13-14; Siddharth Srivastava, "No Proot Yet on ISI Link with Sabarmati Attack: Officials," *Times of India,* March 6, 2002; ISI Behind Godhra Killings, Says BJN" *Times of India,* March 18, 2002; Uday Mahurkar, "Gujarat: Fuelling the Fire," *India Today,* July 22, 2002, p.28. "Bloodstained Memories," *Indian Express, April* 12, 2002; Celia W. Dugger, "After Deadly Firestorm, India Officials Ask Why," *New York Times,* March 6, 2002.
21. "Blame It on Newton's Law: Modi," *Times of India,* March 3, 2002. See also Fernandes, "Gujarat Violence Backed by State."
22. "RSS Cautions Muslims," Press Trust of India, March 17, 2002 and Sanghamitra Chakraborty, "Minority Guide to Good Behavior," *Times of India,* March 25, 2002.
23. "Modi Offers to Quit as Gujarat CM," *Economic Times,* April 13, 2002 and "Modi Asked to Seek Mandate," *Statesman* (India), April 13, 2002.
24. M. S. Golwalkar, *We, or, Our Nationhood Defined* (Nagpur: Bharat Publictions, 1939) and Vinayak Damodar Savarkar,*Hindutva* (New Delhi: Bharti Sedan, 1989). See also editorial, "Saffron Is Thicker Than ... ," *Hindu, October* 22, 2000 and David Gardner, "Hindu Revivalists Raise the Question. of Who Governs India," *Financial Times* (London), July 13, 2000, p. 12.,
25. See Arundhati Roy, "Power Politics," in *Power Politic,* 2nd ed. (Cambridge- MA: South End Press, 2002), p. 57.
26. Manoj Mitta and H. S. Phoolka, *When a Tree Shook Delhi. The 1984 Carnage,* (New Delhi: Lotus Books, 2008).
27. HRW Report, 39-44.
28. John Pilger, "Pakistan and India on Brink," *Mirror* (London), May 27, 2002. p. 4.
29. Alison Leigh Cowan, Kurt Eichenwald, and Michael Moss, "Bin Laden Family, with Deep Western Ties, Strives to Re-establish a Name," *New York Times,* October 28, 2001, p. 1: 9.

30. See Steven Mufson. "Pentagon Changing Color of Airdropped Meals: Yellow Food Packs, Cluster Bomb lets on Ground May Confuse Afghans," *Washington Post*. November 2, 2001, p. A21.
31. Sanjeev Miglani. "Opposition Keeps Up Heat on Government Over. Riots," Reuters, April 16, 2002.
32. "Either Govern or just Go," *Indian Express*, April 1. 2002.
33. "It's War in Drawing Rooms," *Indian Express*, May 19, 2002.
34. Ranjit Devraj. "Pro-Hindu Ruling Party Back to Hardline Politics," Inter, Press Service, July 1, 2002 and "An Unholy Alliance," *Indian Express*, *May* 6, 2002.
35. Nilanjana Bhaduri Jha, "Congress [party] Begins Oust-Moth Campaign," *Economic Times*, April 12, 2002.
36. On June 8, 2006, Zakiya Jaffri, widow of the late member of parliament _Ehsan Jaffri, sought to register a First Information Report against Chief Minister Narendra Modi and sixty-two others including cabinet ministers, senior bureaucrats, and policemen, under section 154 of the Code of Criminal Procedure. See *Communalism Combat*, "The Charge Sheet" (June 2007). Available online at: html (accessed March 29, 2009).
37. See Richard Benedetto, "Confidence in War on Terror Wanes," *USA Today*,
June 25, 2002, p. 19A, and David Lamb, "Israel's Invasions, 20 Years Apart,
Look Eerily Alike," *Los Angeles Times*, April 20, 2002, p. A5.
38. Roy, "The End of Imagination," in *The Cost of Living*.
39. "I would say it is a weapon of peace guarantee, a peace guarantor," said Abdul Qader Khan of Pakistan's nuclear bomb. Quoted in Imtiaz Gul, "Father of Pakistani Bomb Says Nuclear Weapons Guarantee Peace," Deutsche Presse- Agentur, May 29, 1998. See also Raj Chengappa, *Weapons of Peace: Secret Story of India's Quest to Be a Nuclear Power* (New Delhi: HarperCollins, 2000).
40. Edward Luce, "Fernandes Hit by India's Coffin Scandal," *Financial Times* (London), December 13, 2001, p. 12.
41. "Arrested Growth," *Times ofIndia*, February 2, 2000.
42. Edna Fernandes. "EU Tells India of Concern Over Violence in Gujrat," *Financial Times* (London), May 3, 2002, p. 12; and Alex Spillius, "'Please Don't Say This Was a Riot. It Was Genocide, Pure and Simple,'" *Daily Telegraph* (London), June 18, 2002, p. 13.
43. "Gujarat is an internal matter and the situation is under control," said Jaswant Singh, India's foreign affairs minister. See Shishir Gupta, "The Foreign Hand," *India Today*, May 6, 2002, p. 42, and sidebar.
44. Hina Kausar Alam and P Balu, "J&K [Jammu and Kashmir] Fudges DNA Samples to Cover Up Killings," *Times of India*, I March 7, 2002.
45. "Laloo Wants Use of POTO [Prevention of of Terrorism Act] Against

VHP., *RSS.*" *Times of India*, March 7, 2002.

Chapter Two

How Deep Shall We Dig?

1. Hina Kausar Alam and P. Balu, "J&K [Jammu and Kashmir] Fudges DNA Samples to Cover Up Killings," *Times of India*, March 7, 2002.
2. See *Communalism Combat*, "Godhra," and Jyoti Punwani "The Carnage at Godhra," in Varadarajan, ed., *Gujarat*.
3. Somit Sen, "Shooting Turns Spotlight on Encounter Cops," *Times of India*, August 23, 2003.
4. W. Chundrakanth, `Crackdown on Civil Liberties Activists in the Offing" *Hindu*, October 4, 2003, which notes: "Several activists have gone underground fearing police reprisals."
   Their fears are not unfounded, as the State police have been staging encounters at will. While the police frequently release the statistics on naxalite violence, *they* avoid mentioning the victims of their own violence. The Andhra Pradesh Civil Liberties Committee (APCLC), which is keeping track *of* the police killings, has listed more than 4,000 deaths, 2,000 *of* them in the last eight years alone.
   See also K. T. Sangameswaran, "Rights Activists Allege Gang lord-Cop Nexus," *Hindu*, October 22, 2003.
5. A study by the Jammu Kashmir Coalition for Civil Society, *State of Human Rights in Jammu and Kashmir 1990-2006* (Srinagar, 2006), estimates that the real death toll in Jammu and Kashmir between 1990 and 2004 was more than seventy thousand, while the Indian state reported a death toll of only forty-seven thousand from 1990 to 2005. See also Aijaz Hussain. "Muslim, Hindu protests in Indian Kashmir," Associated Press, July 1.
   2008; David Rohde, "India and Kashmir Separatists Begin Talks on Ending Strife," *New York Times*, January 23, 2004, p. A8; and Deutsche Presse Agentur, "Thousands Missing, Unmarked Graves Tell Kashmir Story," October 7, 2003.
6. Unpublished reports from the Association of Parents of Disappeared People (APDP), Srinagar.
7. See Edward Luce, "Kashmir's New Leader Promises `Healing Touch," Financial *Times* (London), October 28, 2002, p. 12.
8. Ray Marcelo, "Anti Terrorism Law Backed by India's Supreme Court," *Financial Times* (London), December 17, 2003, p. 2.
9. People's Union for Civil Liberties (PUCL), "A Preliminary Fact Finding on POTA Cases in Jharkhand, Delhi, India, May 2, 2003, Available online at: (accessed March 29, 2009).
10. "People's Tribunal Highlights Misuse of POTA," *Hindu*, March 18, 2004.
11. "Peoples Tribunal." See also "Human Rights Watch Ask Centre to Repeal

POTA," Press Trust of India, September 8, 2002.

12. See Leena Misra, "240 POTA Cases, All Against Minorities," *Times of India*, September 15, 2003, and "People's Tribunal Highlights Misuse of POTA," March 18, 2004. The Times *of India* misreported the testimony presented. As the Press Trust of India article notes, in Gujarat, "The only non-Muslim in the list is a Sikh, Liversingh "Tej Singh Sikligar, who figured in it for an attempt on the life of Surat lawyer Hasmukh Lalwala, and allegedly hung himself in a police lock-up in Surat in April,2003." On Gujarat, see Roy, "Democracy: Who's She When She's at Home?" (chapter 1 of this book).
13. See the People's Tribunal on POTA (Prevention of Terrorism Act) and Other Security Legislations, *The Terror of POTA* (New Delhi, India, March 13-14, 2004). Available online at: (accessed March 29, 2009).
14. "A Pro-Police Report," *Hindu*, March 20, 2004. See also Amnesty International, "India: Report of the Malimath Committee on Reforms of the Criminal Justice System: Some Comments," September 19, 2003 (ASA 20/025/2003).
15. "J&K [Jammu and Kashmir Panel Wants Draconian Lass Withdrawn," *Hindu*, March 23, 2003. See also South Asian Human Rights Documentation Center (SAHRDC), "Armed Forces Special Power, Act: : Study in National Security Tyranny," November 1995, armed forces.htm (accessed March 29, 2009).
16. "Growth of a Demon: Genesis of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958" and related documents, in *Manipur Updat* (December 1999). Available, online at: (accessed March 29, 2009).
17. On the lack of any convictions for the massacres in Gujarat, see Edward, Lace, "Master of Ambiguity," *Financial Times* (London), April 3-4, 2004, p. 16. On the March 31, 1997, murder of Chandrashekhar Prasad, see An drew Nash, "An Election at JNU," *Himal*, December 2003.
18. Sainath, "Neo-Liberal Terrorism in India."
19. N. A. Mujumdar, "Eliminate Hunger Now, Poverty Later," *Business Line*, January 8, 2003.
20. "Foodgrain Exports May Slow Down This Fiscal [Year]," *India Business Insight*, June 2, 2003; "India: Agriculture Sector: Paradox of Plenty," *Business Line*, June 26, 2001; and Ranjit Devraj, "Farmers Protest against Globalization," Inter Press Service, January 25, 2001.
21. Utsa Patnaik, "Theorizing Poverty and Food Security in the Era of Economic Reforms," in Gladys Lechini, ed., *Globalization and the Washington Consensus: It's Influence on Democracy and Development in the South*.

(Buenos Aires: CLACSO, 2008), p. 169 Available online at: - (last accessed March 29, 2009). See also Utsa Patnaik, "Falling Per Capita Availability of Foodgrain for I human Consumption in the Reform Period

in *I ndia, Akhbar* 2 (October 2001). Available online at: cle.php? article=44&category=3&issuc=12 (accessed March 29, 2009); P. Sainath, "Have Tornado, Will Travel," *Hindu Magazine*, August 18, 200: Sylvia Nasar, "Profile: The Conscience of the Dismal Science," *New York Times* January 9, 1994, p. 3: 8; Maria Misra, "Heart of Smugness: Unlike: Belgium, Britain Is Still Complacently Ignoring the Gory Cruelties of Its Empire," *Guardian* (London), July 23, 2002, p. 15; and Utsa Patnaik, "On: Measuring `Famine' Deaths: Different Criteria for Socialism and Capitalism?" Ak*hbar 6* (November-December 1999). Available online at: suc=9 (accessed March 29, 2009).

22. Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999).
23. "The Wasted India," *Statesman* (India), February 17, 2001, and "Child-Blain," *Statesman* (India), November 24, 2001.
24. Utsa Patnaik, *The Republic of Hunger and Other Essays* (Gurgaon: Three Essays Collective, 2007).
25. Praful Bidwai, "India Amidst Serious Agrarian Crisis," *Central Chronicle* (Bhopal), April 9, 2004.
26. Roy, *Power Politics, p. 13.*
27. See, for example, Randeep Ramesh, "Bangladeshi Writer Goes into Hiding," *Guardian* (London), November 27, 2007, p. 25, about the case of exiled Bangladeshi writer Taslima Nasrin, who had been living in Kolkata since 2004; Randeep Ramesh, "Banned Artist Misses Delhi's First Art Show," *Guardian* (London), August 23, 2008, p. 22, about the exiled artist Maqbool Fida Husain; and Somini Sengupta, "At a University in India, New Attacks on an Old Style: Erotic *Art," New York Times*, May 19, 2007,pB7, about an on a student art show at Maharaja Savujir.w University. See also Arunhati Roy, "Taslima Nasrin and `Free Speech,'" New Delhi, India, February 13, 2008. Available online at: cle/16646 (accessed March 29, 2009).
28. Shiv Sena chief Bal Thackeray "called for the burning of all copies of a book by James W. Laine, *Shivaji: Hindu King in Islamic India* (Oxford: Oxford University Press, 2003). See "Mockery of the Law," *Hindu, May 3*, 2007. See also Praful Bidwai, "'McCarthy, Where Are you?" *Frontline* (India), May 10-23, 2003, writing about the campaign against historian Romila Thapar, and Amipam Katakam, "Politics of Vandalism," *Frontline* (India), January 17-30, 2004, on the attack on the Bhandarkar Institute in Pune.
29. See Mike Davis, *Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World (New* York: Verso, 2002), "Table PI: Estimated Famine Mortality," p. 7.
30. Among other sources, see Edwin Black, *IBM and the Holocaust.' The Strategie Allianc Between Nazi Germany and America's Most Powerful*

Corporation (New York: Three Rivers Press, 2003).

31. "For India Inc., Silence Protects the Bottom Line," *Times of India*, February 17, 2003, and "CII Apologises to Modi," *Hindu, March* 7, 2003.
32. Advani made the journey starting in Somnath on September 25, 1990. In 2005, he said "his `historic' Ram rath t atra fifteen tears ago would be considered 'complete' only when the temple was constructed in _Ayodhca." See Special Correspondent, "Yatra Complete Only After Temple Is Built, Says Advani," *Hindu*, September 26, 2005.
33. See Roy, *Power Politics, pp. 35-86.*
34. See, among other accounts, Nirmalangshu Mukherji, "Trail of the Terror Cops," ZNet. November *17, 2008.* Available online at: (accessed March *29, 2009).*
35. India was the only country to abstain on December *22, 2003,* from UN General Assembly Resolution, "Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism," *A/RES/58/187* (April *2004).*
36. See Press Trust of India, "India's Naxalites Making Efforts to Spread to New Areas," BBC Worldwide Monitoring, May *4,2003,* and "Maoist Call Freezes Jharkhand, Neighbours," *Statesman* (India), June *15, 2006.*
37. The United Progressive Alliance government, led by the Congress Party, repealed the Prevention of Terrorism Act (POTA) in *2004* because it was found to be draconian, and said it had been misused and was counterproductive, but then enacted a tougher terror law in the form of amendments to the already draconian Unlawful Activities Prevention Act. The amendments were introduced in parliament on December *15, 2008,* and adopted the next day. There was virtually no debate. See Prashant Bhushan, "Terrorism: Are Stronger Laws the Answer?" *Hindu,* January *1, 2009.*
38. See Arundhati Roy, "Public Power in the Age of Empire," in *An Ordinary Person's Guide to Empire* (New Delhi: Penguin Books India, *2005). Also* published as Arundhati Roy, *Public Power in the Age of Empire* (New York: Seven Stories Press, *2004).*

Chapter Three
"And His Life Should Become Extinct"

1. The High Court claimed that "the fire power was awesome enough to engage a battalion and had the attack succeeded, the entire building with all inside would have perished." See the court's verdict of October *29, 2003.* For detail of the Parliament attack and the subsequent trial, see Nandita Haksar, *Framing Geelani, Hanging Afzal Patriotism in the Time of Terror* (New Dclh: Promilla, *2007);* Praful Bidwai et al., *13 December: A Reader: The Strange Case of the of Attack on the Indian Parliament,* revised and updated ed. (New Delh: Penguin Books India, *2007);* Syed Bismillah Geelani, *Manufacturing Terrorism Kashmiri Encounters with Media and the Law* (New Delhi: Promil: . *2006);* Nirmalangshu Mukherji, December *1.3: Terror over Democracy (New)*
Delhi: Promilla, 2005); People's Union for Democratic Rights, *Balancing Art: High Court Judgment on the 13th December 2001 Case* (New Delhi, December 19, 2003); and People's Union for Democratic Rights, *Trial of Errors: A Critique of the POTA Court Judgment on the 13 December Case* (New Delhi, February 15, 2003).
2. Judge S. N. Dhingra, Judgment of the Special Prevention of Terrorism Act Court, Mohammad Afzal vs. the State (NCT of Delhi), December 16, 2002.
3. Statement by Home Minister L. K. Advani, December 18, 2001. Text available online at the Embassy of India (Washington): http://www.indianembassy.org/new/parliament dec 13 Ol.htm (accessed March 29, 2009).
4. See Susan Milligan, "Despite Diplomacy, Kashmir Troops Brace," *Boston Globe,* January 20, 2002, p. Al; Push Stockman and Anthony Shadid, "Sanctions Fueling ire Between India, Pakistan," *Boston Globe,* December 28, 2001, p. A3; Jahid Hussain, "Tit-for-Tat Bans Raise Tension on Kashmir," *Times* (London), December 28, 2001; and Ghulam Hasnain and Nicholas Rufford, "Pakistan Raises Kashmir Nuclear Stakes," *Sunday Times* (London), December 30, 2001.
5. Dhingra, Judgment of the Special prevention of Terrorism Act Court.
6. See Somini Scngupta, "Indian Opinion Splits on Call for Execution," International *Herald Tribune,* October 9, 2006, and Somini Scngupta and Hari Kumar, "Death Sentence in Terror Attack Puts India on Trial," *New York Times,* October 10, 2006, p. A3.
7. "Advani Criticizes Delay in Afzal Execution," Hindu, November 13, 2006.
8. Maqbool Butt, a founder of the Jammu and Kashmir Liberation Front, was hanged in New Delhi on February 11, 1984. See "India Hangs Kashmiri for Slaying Banker," *New York Times,* February 12, 1984, sec. 1, p. 7. Details about Maqbool Butt are available online at: http://www.maqboolbutt.com and at: (accessed March 29, 2009).
9. Lakshmi Bulukrishnan, "Reliving a Nightmare," *Hindu,* December 12,

2002, p. 2. See also Shuddhabratu Scngupta, "Media Trials and Courtroom Tribulations," in Bidwai et al., *13 December, p.* 46.

10. Press Trust of India, "S[upreme] C [ourt] Allows Zee [TV] to Air Film on Parliament Attack," IndiaInfo.com, December 13, 2002.
11. "Five Bullets Hit Geelani, Says Forensic Report," *Hindustan Times,* February 25, 2005.
12. See "Police Force," *Indian Express, July 15,* 2002; "Editor's Guild Seeks Fair
Trial for Iftikhar," *Indian Express,* June 20, 2002; and "Kashmir Times Staffer's Detention Issue Raised in Lok Sabha," Business *Recorder,* August 4, 2002.
13. Iftikar Gilani, *My Days in Prison* (New Delhi: Penguin Books India, 2005). In 2008 the Urdu translation of this book received one of India's highest literary awards from the Sahitya Akademi, iftikhar-gilani-wins-sahitya-akademiaward/424871.
14. Doordarshan Television (New Delhi), "Court Releases Kashmir Times Journalist from Detention," BBC Monitoring South Asia, January 13, 2003.
15. Statement of Sayed Abdul Rahman Geelani, New Delhi, August 4,2005. Available online at. parl/geelanistate.htm (accessed March 29, 2009). See also Basharat Peer, "Victims of December 13," *Guardian* (London), July 5, 2003, p. 29.
16. "Special Cell, ACP Face Charges of Excesses, Torture," *Hindustan Times,* July 31, 2005. Singh was later murdered, in March 2008, in what is widely believed to be an underworld property dispute. See Press Trust of India, "Encounter Specialist Rajbir Singh Shot Dead," *Hindus tan Times,* March 25, 2008.
17. See the articles "Terrorists Were Close-Knit Religious Fanatics," and "Police Impress with Speed But Show Little Evidence," *Times of India,* December 21, 2001. Available online at: articlcshow/1600576183.cms and at: articleshow/1295243790.cms (accessed March 29, 2009).
18. Emily Wax and Rama Lakshmi, "Indian Official points to Pakistan," Washington *Post,* December 6, 2008, p. A8.
19. Mukherji, *December 13, p.* 43.
20. Statement of Mohanunad Afral to the Court under Section 313 Criminal Procedure Code in the Court of Shri S. N. Dhingra, ASJ, New Delhi S/V Afzal Guru and Others, FIR 417/01, September 2002. Available online at: name=nirmalangshu&sid=2 (accessed March 29, 2009).
21. Aijaz Hussain, "Killers in Khaki," *India Today,* June 11, 2007. See also "PUDR Picks Several Holes in Police Version on Pragati Maidan Encounter," *Hindu,* May 3, 2005; the People's Union for Democratic Rights, *An Unfair I Verdict: A Critique of the Red Fort Judgment* (New Delhi, December 22, 2006); and *Close Encounter. A Report on Police*

Shoot-Outs in Delhi
(New Delhi, October 21, 2004).

22. See "A New Kind of War," *Asia Week*, April 7, 2000, and Ranjit Dev Raj, "Tough Talk Continues Despite Peace Demands," Inter Press Service, April 19, 2000.
23. See "Five Killed After Chattisinghpora Massacre Were Civilians," Press Trust of India, July 16, 2002, and "Judicial Probe Ordered into Chattisinghpora Sikh Massacre," Press Trust of India, October 31, 2000.
24. Public Commission on Human Rights, Srinagar 2006, "State of Human Rights in Jammu and Kashmir 1990-2005," p. 21.
25. "Probe Into Alleged Fake Killings Ordered," *Daily Excelsior* (Janipura), August 30, 2005.
26. M. L. Kak, "Army Quiet on Fake Surrender by Ultras," *Tribune* (Chandigarh), December 14, 2006.
27. "Storm Over a Sentence," *Statesman* (India), February 12, 2003.
28. The analysis that follows is based on the judgments of the Supreme Court of India, the Delhi High Court, and the POTA Trial Court cited earlier.
29. Mukherji, *December 13*. People's Union for Democratic Rights, Trial *of Errors* and *Balancing Act*.
30. "As Mercy Petition Lies with Kalam, Tihar Buys Rope for Afzal. Hanging," *Indian Express*, October 16, 2006.

Chapter Four

Breaking the News

1. Statement of Mohammad Afzal to the Court under Section 313 Criminal Procedure Code, September 2002.
2. "Terrorists Were Close-Knit Religious Fanatics,"' and "Police Impress with Speed But Show Little Evidence," December 21, 2001.
3. Judgment of the Supreme Court of India on Mohammad Afzal v. the State (NCT of Delhi), August 4, 2005.
4. Press Trust of India, "Book on December 13 Parliament Attack," December 13, 2006.
5. Petitions asking for clemency and retrial as well as an inquiry into the case are available online at: and at:
(accessed March 29, 2009).
6. Speech made by Manmohan Singh on December 18,2001-the then leader of the opposition, and later prime minister-in the Rajya Sabha. See the full text in Rajya Sabha, Official Day's Proceedings, December 18, 2001, paragraph 4, p. 430.
7. Davinder Kumar, "The Ham Burger-Did Delhi Police Sleuths Jump the Gun with the Wrong One?" *Outlook* (India), January 21, 2002.
8. Priya Ranjan Dasmunshi, "Advaniji Too Was Confused,"' *Outlook*,

December 24, 2001.

9. For the full text of the parliament attack charge sheet, see Mukherji, December *13*, Annexure 1.
10. See "Scandal," *Economist*, August 28, 1999, and Sarah Delaney and Michael Evans, "Britain Joined Plot to Overthrow a Communist Italian Government," Times (London), January 14, 2008, p. 31. On the political context, see Noam Chomsky, *"Turning the Tide: US. Intervention in Central America and the Struggle for Peace*, 2nd ed. (Cambridge, MA: South End Press, 1987), pp. 67, 195.
11. "Show No Mercy, Hang Afzal: BJP," *Indian Express*, November 23, 2006.
12. Chandan Mitra, editor of the *Pioneer* newspaper reviewed the book *13 December: A Reader* in *India Today* (January 22, 2007, "Trapped in Half-Truths"). An edited version of my letter in response was published in the Letters section of *India "Today* (February 5, 2007). Here is the full text:

Sir- This is regarding Chandan Mitra's review of the book *13 December: A Reader.* An interesting choice of reviewer-someone who has brazenly falsified facts on the Parliament attack case and has been exposed for doing so in the book he reviews. He asks for a "source" for my statement: "On December 12, 2001, at an informal meeting, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee warned of an imminent attack on Parliament."

Please refer to the speech made by the Prime Minster Manmohan Singh, (then leader of the opposition) on December 18, 2001, in the Rajya Sabha. He said: "Yet, it is a fact that an attack on parliament was quite anticipated ... In fact, one day before this attack took place, i.e., on 12th December, while speaking at Mumbai, the Hon. Prime Minister himself had referred to the existence of this threat, such a threat to our Parliament."

In his own article, "Celebrating Treason" *(Pioneer,* October 7, 2006) cited in my Introduction, Chandan Mitra says, "Afzal Guru was one of the terrorists who stormed Parliament House on December 13th 2001, and it was he who first opened fire on security personnel, apparently killing three of the six who died protecting the majesty of democracy that morning."

None of the three court judgments sentencing Mohammad Afzal to death have accused him (leave alone found him guilty) of killing anybody, of being directly involved in the attack on Parliament, or indeed of being anywhere near the parliament building on December 13, 2001. Even the police chargesheet clearly states that at the time of the attack, Afzal was somewhere else. The Supreme Court judgment explicitly says there was no direct evidence against him, nor any evidence that he was a member *of a* terrorist organization. Can Chandan Mitre cite a source for his outlandish assertion Or tell us how he knows what the

police and the courts do nut? And why he has suppressed this "evidence" for all these years?
See Chandan Mitra, "Celebrating Treason," *Pioneer*, October 7, 2006.

13. Swapan Dasguprt, "You Can' Be Good to Evil," *Pioneer*, October 1, 2006
14. Siddhartha Gautam, "The Other Side of Afzal's Surrender," CNN-1BN, November 27, 2006.
    Text available online at: news/the-other-side-of-afzals-surrender/27157-3.html (accessed March 29, 2009). Video available online at: 27157/throther-sido-of-afcals-surrender.html (accessed March 29, 2009). See also Narendra Nag, "Afzal Gets Mixed Bag from Politcos," CNN-IBIV, November 28, 2006. Text available online at: afzal-gets-mixed-bag-from-politcos/27182-3.html (accessed March 29, 2009). Video available online at: of al-gets-mixed-bag-from-politcos.html (accessed March 29, 2009).
15. Siddharrha Gautam, "Tortured, But Kept Alive for a Deal," CNN-IBN, November 27, 2006. Text available online at: (accessed March 29, 2009). Video available online It: videos/27164/tortured- (accessed March 29, 2009).
16. Dravinder Singh, interview by Parvaiz Bukhari, October 2006, in Srinagar, unpublished manuscript, provided in personal correspondence to the author March 7, 2009.
17. Gautam, "Tortured, But Kept Alive."
18. Gautam, "Other Side of Afzal's Surrender."
19. "Adeam Criticize' Delay in Afzal Execution," *Hindu*, November 13, 2006.
20. See Judgment of the Supreme Court of India on: Mohammad Afzal vs. the State (NCT of Delhi),) August 4, 2005.

Chapter Five

Custodial Confessions, The Media, and the Law

1. Sengupta, "Indian Opinion Splits on Call for Execution."
2. Sec the letter of N. D. Pancholi to NDTV, December 26, 2006, Full tex of the letter available online at: . (accessed March 29, 2009).
3. Despite the court judgments, the media continues to publish custodial confessions. See Mihir Srivastava, "Inside the Mind *of* the Bombers," India *Today*, October 2, 2008.
4. Barkha Dutt, "Death of the Middle Ground," *Hindustan Times*, December 1 6, 2006.
5. Maloy Krishna Dhar, *Open Secrets: India's Intelligence Unveiled* (New Delhi: Manns Publications, 2005), pz *20*.,

Chapter Six

Baby Bush, Go Home

1. See to Address Indians from Ancient Fort," United Press International,

February 24, 2006, and "Veil of Secrecy over Bush Visit," *Hindustan Times*, February 22, 2006.

2. "*US* President Arrives on Maiden India Visit," *Hindustan Times*, March 1, 2006.
3. See Mukul Sharma, "Myanmar: Rhetoric and Reality of Indian Democracy " *Hindu*, August 9, 2007, commenting on Than Shwe's October 25, 2004, visit to Rajghat..

Chapter Seven

Animal Farm II, 9.

1. George W. Bush, "President Bush Delivers Remarks *to* the Asia Society; Washington, D.C., February 22, 2006.

Chapter Eight

Scandal in the Palace

1. See Hans Dcmbowski, *Taking the Stale to Court Public: Interest Litigation and the Public Sphere in Metropolitan India* (Oxford: Oxford University Press, 2001) and Videh Upadhyaya, *Public Interest Litigation in India: Concepts, Cases, Concerns* (New Delhi: LexisNexis Butterworths India, 2007).
2. Howard Zinn, *The Zinn Reader. Writings on Disobedience and Democracy* (New York: Seven Stories press, 2003), p. 373.
3. See Prashant Bhushan, "Judges in Their Own Cause: Contempt of Court," no date Available online at: hrtp://article_pb.pdf (accessed March 29, 2009). See also Prashant Bhushan, "The Judiciary: Cutting Edge *of* a Predator State," CounterCurrents.org, December 7, 2006. See also Arundhati Roy, "Defence *of* Dissent," Outloolindia.com, April 30, 2001, and "Contempt *of* Court?" Outlookindia.com,January 21, 2002.
4. See Sam Rajappa, "Crime and Punishment," *Statesman* (India), August 25, 2002.
5. "Shops Down Shutters Against Scaling," Press Trust of India, Mav 11, 2006, and Bhadra Sinha, "MCD [Municipal Corporation of Delhi] Gets Another SC Rap on Sealing," *Hindustan Times*, March 10, 2008.
6. See Shveta Sarda, "Nagla Maachi: Court Proceedings. Note. 9th May 2006," as well as other reports available online at: http://nangla.freeflux.net (accessed March 29, 2009).
7. Quoted *in Forest Cose Update*, Issue 29 (October 2006). Available online at: . See also "Decide on Vasant Kunj Malls in 2 months, SC tells forest Ministry," *Hindustan Times*, October 17, 2006.
8. Two years later one *of* the biggest accounting scams in corporate India broke. See "Ramalingu Raja Quits Satyam: Admits to Fraud," *Indian Express*, January 7, 2009, and Press Trust *of* India, "Satyam Collapse

Likely to Affect Investor Confidence: Experts," *Economic Times*, January 7, 2009.

9. See Committee for judicial Accountability, Wither Judicial Accountability? The Case of Justice Sabharwal: Disquieting Facts, Disturbing Impliications (New Delhi: August 3, 2007) Available online at: http:\\ forms.org\justice_yk_sabharwal.htm (accessed March 29, 2009) along with other reports and compilations of the *Mid Day* reports. See also the website for *Mid Day* ().
10. J.S. Verma, interview by Karan Thapar, *India Tonight*, CNBC India, August 16, 2007.
11. Y. K. Sabharwal, "A Former Chief Justice of India Defends His Honour," *Times of India*, September 2, 2007, p. 10.
12. High Court of Delhi at New Delhi, suo mout case vs. M. K. Tayal et al., September 11, 2007. See also "Court Holds *Mid-Day* Editor Guilty of Contempt of Court," *Hindu*, September 12, 2007.

Chapter Nine
Listening to Grasshoppers: Genocide, Denial, and Celebration

1. One and a half million is the number of Armenians who were systematically murdered by the Ottoman Empire in the genocide in Anatolia in the spring of 1915. The Armenians, the largest Christian minority living under Islamic Turkic rule in the area, had lived in Anatolia for more than two thousand five hundred years. Figures given by Peter Balakian, talk at the World Affairs Forum, San Francisco, California, November 2, 2003. Audio and transcript available from Alternative Radio, 002.shtrnl.
2. Araxie Barsamian, speaking at the University of Colorado at Deliver, Colorado, September 26, 1986. Audio and transcript available from Alternative Radio,
3. See Susanne Fowler, "Turkey, a Touchy-Critic, Plans to Put a Novel on Trial," *New York Times*, September 15, 2006, p. A4, and Nicholas Birch, "Speaking Out in the Shadow of Death," *Guardian* (London), April 7, 2007, p. 30.
4. See Bunsha, *Scarred*.
5. "Tata, Ambani Bag Gujarat Garima Awards," *Business Standard* (India), January 13, 2004.
6. Mishra, "A Mediocre Goddess," *New Statesman*, April 9, 2004.
7. United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, approved and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of December 9, 1948, and entered into force on January 12, 1951.

8. Frank Chalk and Kurt Jonassohn, *The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies* (New Haven: Yale University Press, 1990), p. 23.
9. Quoted in Howard *Zinn,A People's History of the United States-1492-Present*
(New York: Harper Perennial Classics, 2001), p. 15.
10. Babu Bajrangi, "After Killing Them, I Felt Like Maharana Pratap,"*Tehelka*, September 1, 2007.
11. Talk by Robert J. Lifton, Center for the Study of Violence and Human Survival, John Jay College, City University of New York, January 29, 1996. Transcript available from Alternative Radio, http://www.alternativeradio.org/programs/LIFR-SMIR001.shtrnl. See also Robert J. Lifton and Greg Mitchell, *Hiroshima in America: A Half Century of Denial (New* York: Harper Perennial, 1996).
12. See Mahmood Mamdani, "The Politics of Naming: Genocide, Civil War, Insurgency," *London Review of Books*, March 8, 2007.
13. See Anthony Arnove, ed., *Iraq Under* Siege: *The Deadly Impact of Sanctions and War*, Cambridge, MA: South End Press, 2002, pp. 63 and 145.
14. See Rachel L. Swarns, "Overshadowed, Slavery Debate Boils in Durban," *New York Times*, September 6, 2001, p. Al, and Chris McGreal Durban, "Africans Back Down at the UN Race Talks," *Observer* (London), September 9, 2001, p. 16.
15. See Sven Linguist, *A History of Bombing* (New York: The New Press, 2003); Marilyn B. Young and Yuki Tanaka, eds.*Bombing Civilians: A Twentieth Century History* (New York: The New Press, 2009); and Gabriel Kolko, *Century of War: Politics, Conflict, and Society Since 1914* (New York: The New Press, 1995).
16. See Marilyn B. Young, *The Vietnam Wars: 1945-1990* (New York: Harper Perennial, 1991); Stephen Kinzer, *Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii is Iraq* (New York: Times Books, 2007); and Chalmers Johnson's trilogy, *Blowback: The Costs and Consequences of American Empire*, 2nd ed., *The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic*, and *Nemesis: The Last Day's of the American Republic* (New York: Metropolitan Books, 2004, 2004, and 2008).
17. Robert McNamara, interview by Errol Morris, in *The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Rchert S. McNamara (Sony* Pictures, 2004), 95 minutes. Transcript available online at: s.com/fhlm/fow_ transcript.html (accessed March 29, 2009).
18. See Carl Hulse, "U.S. and Turkey Thwart Armenian Genocide Bill," *NewYork Tunes*, October 26, 2007, p. A12. Similar resolutions have also been consistently defeated in the Knesset in Israel. See, for example,

গণতন্ত্র নিয়ে যত উচ্ছ্বাস, এটি যেন-
আমাদের যেকোনো ক্ষুদ্র-তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার মহৎ আশ্রয়স্থল,
ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার শেষ রক্ষাকবচ
এবং আমাদের স্বপ্নময়-উচ্চাশায় সঞ্জীবনীসুধা।
যদি এমন হয় যে, এসব কিছুই সত্য নয়-আসলে গণতন্ত্র মেতেছে
মানব বিনাশের প্রলয় নাচনে, তা হলে?